বাংলা একাডেমীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

উত্তরাধিকার

আগস্ট ২০০৯ ভাদ্র ১৪১৬

সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

সহযোগী সম্পাদক
ড. সরকার আমিন

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশক
কাইয়ুম চৌধুরী
অলংকরণ
রাজিব রায়

প্রকাশক : মোহাম্মদ আবদুল হাই পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
সম্পাদনা সহযোগী : মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
মেহেলিকা ববিতা কাজী রেহানা বেগম
অক্ষর বিন্যাস : শামিমা শবনম মোহাম্মদ অলিউল্লাহ খান

মুদ্রক : মোবারক হোসেন ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস

মূল্য : ৪০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

উত্তরাধিকার মাসিক সাহিত্য পত্রের নবপর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হলো। প্রথম সংখ্যা নতুন আঙ্গিক, ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক-পাঠক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে যে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয় তাতে আমরা আনন্দিত। পত্রিকা বাজারে দেয়ার পর ঢাকা এবং জেলা শহরেও তা চটজলদি নিঃশেষিত হয়ে যায়। পাঠকদের এই আগ্রহ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের ধারণা হয়েছে বাংলাদেশে রুচিশীল ও উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকার চাহিদা রয়েছে। অথচ কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেল ১৯৮৩ সালে সামরিক আদেশে মাসিক উত্তরাধিকার ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। মাসিক উত্তরাধিকার এখন সে চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

প্রথম সংখ্যার মতো বর্তমান সংখ্যায়ও বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এ পত্রিকাকে আধুনিক ও বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তা-চেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে পরিণত করতে চাই। সে দিকে লক্ষ রেখেই আমরা প্রবীণ ও নবীনের নতুন চিন্তা ও তীক্ষ্ণ অনুধাবনমূলক দর্শন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমূলক লেখা অন্তর্ভুক্ত করেছি। তরুণদের সৃজনভুবনের আর এক অংশে আছে অনেকগুলো তরতাজা কবিতা। প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতাও হয়েছে বেশ সরস ও উপভোগ্য। বর্তমান সংখ্যার দুটি গল্প, ধারাবাহিক দুটি লেখা ও বিদেশি সাহিত্যের আলোচনা পাঠকদের আনন্দ দেবে বলে ধারণা করি।

এতসব লেখাপত্রের পরও বর্তমান সংখ্যার মূল আকর্ষণ বঙ্গবন্ধু বিষয়ক একগুচ্ছ রচনা। সেলিনা হোসেন ও মফিদুল হকের দু-খানা নতুন গদ্যরচনা আর আবুল ফজল এবং নির্মলেন্দু গুণের গল্প ও কবিতা দুটি বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লেখা প্রথম বিবেকী সাহিত্যসৃষ্টি। আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী লেখাদুটিকে নতুন প্রজন্মের নজরে আনার জন্যেই পুনর্মুদ্রণ করেছি।

বঙ্গবন্ধুর নামে বাঙালির ইতিহাসের দরজা খুলে যায়। দেশদ্রোহী বিদেশী চরেরা সেই দরজা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। সাহিত্যের মাধ্যমে সে দরজা প্রথমে খুলেছিলেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা আবুল ফজল ও নির্মলেন্দু গুণ। গুণ সে-কাজটি করেছিলেন বাংলা একাডেমীর একুশের কবিতা-পাঠের মঞ্চেই ১৯৭৭-এ, আর আবুল ফজল সমকালে ১৯৭৮-এ। বঙ্গবন্ধুর ৩৪তম শাহাদাত বার্ষিকীতে আমাদের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য তরুণদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে ও তাতে বঙ্গবন্ধুর মূল ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করলেই এ প্রয়াস সার্থক হবে।

আমরা আশা করি উত্তরাধিকার-এর বর্তমান সংখ্যাটি লেখায়, মুদ্রণ পরিপাট্যে আরো বেশি পাঠকপ্রিয় হবে।

প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য ও আমাদের সংস্কৃতি

যতীন সরকার

অভিধান খুললে 'প্রকৃতি' শব্দটির যে-সব অর্থ পাই, সে-সবের অনেকগুলোই আমাদের ভাবানুষঙ্গে উপস্থিত নেই। আমরা শব্দটিকে এখন খুবই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি।

আদিতে এ শব্দটি কী অর্থে কী ধরনের ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হতো এবং কী গভীর তাৎপর্য বহন করত, তা ভুলেই গেছি। আর সে কারণেই কীভাবে সে শব্দটি কালক্রমে নানা অর্থ ধারণ করেছে, কীভাবে কোনো অর্থের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং কোনো কোনো অর্থ এখনো কীভাবে টিকে আছে– সে-সব নিয়ে আমাদের চিন্তা উদ্দীপ্ত হয় না। অথচ, গতানুগতিক চিন্তার বৃত্ত পেরিয়ে 'প্রকৃতি' শব্দটির গভীরে প্রবেশ করলে আমাদের অনেক ধোঁয়াশাই দূর হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে আমাদের 'সংস্কৃতি'র ধারণাও স্পষ্ট হবে, প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কসূত্রটিকে চিনে নিতে পারলে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অস্পষ্টতাগুলোও কেটে যাবে, প্রকৃত প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত

হয়ে উঠবে।

প্রকৃতিজগৎ ও প্রকৃতিবিজ্ঞান বলতে আমরা এখন যে বস্তুজগৎ ও বস্তুবিজ্ঞানকে বুঝে থাকি, সেই 'বস্তু' শব্দটিতে যে 'প্রকৃতি' শব্দটির আদি অর্থই অনুস্যূত হয়ে আছে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই আদি অর্থটিকে মনে রাখলে অভিধানে উল্লিখিত 'প্রকৃতি' কথাটির অন্য সব প্রতিশব্দ ও ব্যাখ্যামূলক বাক্যাবলির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারব। তবে সেরকম অনুধাবনের জন্য অভিধান মোটেই যথেষ্ট নয়– দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে পুরাণ, ইতিহাস ও দর্শনের এলাকায়। বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশের প্রাচীন দর্শনকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে এবং সেক্ষেত্রেও বিশেষভাবে অনুধাবনীয় সাংখ্য,যোগ ও তন্ত্র। এসবের সম্মিলিত আলোর প্রক্ষেপণেই আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক অন্ধকার কোণও আলোকিত হয়ে উঠবে। সেই ইতিহাসের আলোতে আমাদের বর্তমানটাকে অনেক ভালোভাবে দেখে নেওয়া যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সম্ভব হবে ভবিষ্যতে চলার পথটাকেও অনেক সুগম করে তোলা।

॥ দুই ॥

সাংখ্য যে অত্যন্ত প্রাচীন দর্শন এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলেও এটি কত প্রাচীন, সে সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে কিছু বলা যায় না। আধুনিককালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক বিদ্বানের মতে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সাংখ্যই সর্বপ্রাচীন। গৌতম বুদ্ধের গুরুও সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। সাংখ্যকে আদি-দর্শন বিবেচনা করেই এই দর্শনের প্রবর্তক কপিলকে বলা হয়েছে 'আদি-বিদ্বান'। অনেকে তো এমনও মনে করেন যে, কপিলের নাম থেকেই গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থানের নাম হয়েছিল 'কপিলাবস্তু'।

'প্রকৃতি'ই উপমহাদেশের সুপ্রাচীন দর্শন– সাংখ্যের মূল উপজীব্য। প্রকৃতিই সে দর্শনে 'প্রধান' বলে গৃহীত। প্রকৃতিই চিহ্নিত হয়েছে বিশ্বের 'আদ্যাশক্তি' রূপে।

আদ্যাশক্তি মানে তো সেই শক্তি যার আগে আর কোনো শক্তি নেই বা ছিল না, যে শক্তি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। সাংখ্যদর্শনের মতে সেই শক্তি 'ঈশ্বর' নয় কোনোমতেই। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'– ঈশ্বর নেই, কারণ তার থাকার কোনো প্রমাণ নেই। থাকার প্রমাণ তো আছে কেবল প্রকৃতির। সেই প্রকৃতি থেকেই বিশ্বের সব কিছুর সৃষ্টি, প্রকৃতিই আদি– এ-রকমই সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছিল খুবই শক্তভিত্তির উপর। সেই শক্তভিত্তিটি হচ্ছে বস্তুজ্ঞানের। বস্তু আর প্রকৃতি যে অভিন্ন– এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনো সুযোগই নেই। 'বস্' ধাতুর সঙ্গে 'তুন' প্রত্যয়ের যোগে 'বস্তু' শব্দটি গঠিত। বস্ ধাতু দ্বারা বোঝায় 'বাস করা'। অর্থাৎ যা 'বাস করে' বা আছে, তা-ই বস্তু। যা ঘটে বা প্রত্যক্ষ হয়, তা-ই বস্তু। ঘটনাপ্রবাহেরই আরেক নাম বস্তু, এই ঘটনাপ্রবাহই প্রকৃতি। প্রকৃষ্ট রূপে সাধিত যে-কৃতির নাম প্রকৃতি (প্র-কৃ+ক্তি), সে-কৃতি অন্য কেউ সম্পন্ন করে না। অর্থাৎ প্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধ। সাংখ্যদর্শন সেই স্বয়ংসিদ্ধ প্রকৃতিরই কৃতির উন্মোচক ও বিশ্লেষক।

এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি যে প্রকৃতি থেকে, সাংখ্যমতে, সেই প্রকৃতির ভেতর তিনটি উপাদান বিদ্যমান– সত্ত্ব, রজঃ ও তম। এই ত্রিবিধ উপাদানকেই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় 'গুণ'। এই তিনটি গুণ যখন একই রকমভাবে (অর্থাৎ সাম্যাবস্থায়) থাকে, প্রকৃতির তখনকার সেই অবস্থাকে বলা হয় 'অব্যক্ত'। তিন গুণের সাম্যাবস্থা যখন ভেঙে যায়, তখন সেই অব্যক্ত প্রকৃতিই জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতির সেই অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের কথাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই 'প্রধান' হলেও 'পুরুষ'-এর অস্তিত্বও স্বীকৃত বটে। এই প্রকৃতি ও পুরুষকে আধুনিক কালের দর্শনের ভাষায় 'বস্তু' ও 'ভাব' বলে অভিহিত করা যায় অবশ্যই, তবু সাংখ্যদর্শনে 'পুরুষ' বা 'ভাব' যে গৌণ সে কথাও ভুলে গেলে চলবে না। অর্থাৎ, সাংখ্যকে কোনোমতেই ভাববাদী বলা যাবে না এবং এই সুপ্রাচীন দর্শনটি যে বস্তুবাদেরই মূলবীজের ধারক– সেকথাও বলতে হবে।

সাংখ্যদর্শনের এই প্রকৃতি প্রাধান্যের বিষয়টি এই উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলাতেই নানাভাবে, ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন– আয়ুর্বেদে। আয়ু বা জীবনকাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় যে শাস্ত্রে, প্রাচীন ভারতে সেই শাস্ত্রেরই নাম দেয়া হয়েছিল আয়ুর্বেদ। প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত যে জীব, সেই জীবের জীবন বা আয়ুও প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। প্রকৃতিরই আরেক নাম স্বভাব। প্রকৃতিজ বা স্বভাবজ জীব যখন প্রকৃতির নিয়মনীতির সঙ্গে পরিপূর্ণ রূপে যুক্ত থাকে, তখন তাকেই বলে 'প্রকৃতিস্থ' বা স্বভাবসংগত বা স্বাভাবিক । যখন কারও মধ্যে প্রকৃতির নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে, তখনই তাকে বলে অপ্রকৃতিস্থ বা অস্বাভাবিক। প্রকৃতিস্থ থাকা মানেই সুস্থ থাকা, আর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়াই মানে অসুস্থ হওয়া। আয়ুর্বেদ মানুষসহ সমস্ত জীবেরই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ার হেতু সন্ধান করেছে।

আবার সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাকে প্রকৃতিস্থ করে তোলার উপায়েরও সন্ধান দিয়েছে। সাংখ্য যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তম– এই তিনটি 'গুণ'-এর সাম্যাবস্থার বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির 'অব্যক্ত' অবস্থা থেকে ব্যক্ত হওয়ার বা সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সূত্র উপস্থাপন করেছে, আয়ুর্বেদও তেমনই জীবের অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার কারণ সন্ধান করেছে বায়ু, পিত্ত ও কফ– এই তিনটি 'দোষ'-এর সাম্যাবস্থার বিপর্যয়ের মধ্যে। আয়ুর্বেদের মতে, বায়ু, পিত্ত, কফ– মানুষের দেহেরই তিনটি ধাতু বা উপাদান, এই তিন ধাতুর সাম্যই মানুষকে সুস্থ রাখে, এই তিন ধাতুর সাম্য বিপর্যস্ত হলে বা এদের হ্রাসবৃদ্ধি

সাংখ্য শুধু বস্তুবাদী নয়, আধুনিক কালের ভাষা প্রয়োগ করলে বলতে হবে যে– এ-দর্শন নারীবাদীও। এবং একালের নারীবাদের চেয়েও অনেক বেশি দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন, সাংখ্যের এই নারীবাদ। কারণ সাংখ্যমতে, 'প্রকৃতি'র অর্থ শুধু 'বস্তু' নয়, 'প্রকৃতি' মানে নারী। জড়জগতে যেমন বস্তুই প্রধান, জীবজগৎ তেমনই নারীপ্রধান। 'পুরুষ'ও আছে অবশ্যই, তবে তার ভূমিকা একান্ত গৌণ। নারী থেকেই সব জীবের সৃষ্টি, তাই নারীই প্রকৃতি

ঘটলেই মানুষ রুগ্‌ণ বা অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে এবং এই তিন ধাতুর সাম্য ফিরিয়ে আনতে পারলেই মানুষ আবার সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। সাংখ্যের মতোই আয়ুর্বেদেও প্রকৃতিই প্রধান বলে স্বীকৃত, প্রকৃতিই বিশ্বের আদ্যাশক্তি, প্রকৃতি বা বস্তুর বাইরে অন্য কিছু থেকে বিশ্বের সৃষ্টি হয় নি।

যেকোনো বিজ্ঞানই প্রকৃতি-প্রাধান্য না মেনে বিজ্ঞান হতে পারে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের আশ্রয় বস্তুবাদেই, ভাববাদে নয়। হ্যাঁ, কোনো বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত বিশ্বাসেও ভাববাদী হতে পারেন অবশ্যই। সেকালের ও একালের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের অনেকেই ভাববাদী ছিলেন ও আছেন। কিন্তু ভাববাদী বিজ্ঞানীও যে বিজ্ঞানের সাধনা করেন, সেই বিজ্ঞানটির উপজীব্য বস্তুই অথবা বস্তুজাত কোনো প্রপঞ্চ। বস্তুবাদের মূলসূত্রকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞানী তাঁর সাধনায় এক পা-ও এগোতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও তাই, আয়ুর্বেদের মতো প্রকৃত বিজ্ঞানকে প্রকৃতি-প্রাধান্য তথা বস্তুবাদের মূলসূত্রকে মেনে নিয়েই সত্যসন্ধানে ব্রতী হতে হয়েছে।

আয়ুর্বেদের মতোই অন্য যে বিজ্ঞানটি প্রাচীন ভারতে উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করেছিল, সেটি ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ব্যাকরণেও সাংখ্যের পরিভাষা 'প্রকৃতি'কে শব্দের মূল বলে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দকে বৈদিক সাহিত্য বলেছে 'ব্রহ্ম'। সেই ব্রহ্মকে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বলে গণ্য করা হলেও শব্দকে তো কোনোমতেই অপ্রাকৃত বা প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত বলা যায় না। শব্দও প্রকৃতি থেকেই জাত। তাই ব্যাকরণে উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তিহীন মূল শব্দ ও ধাতুর নাম দেয়া হয়েছে প্রকৃতি।

আয়ুর্বেদ ও ব্যাকরণ ছেড়ে সোজাসুজি যখন সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই, তখন দেখি যে 'প্রকৃতি' হয়ে গেছে 'প্রজা'। প্রকৃতিপুঞ্জ মানে প্রজাপুঞ্জ। এই 'প্রজা' শব্দটিরও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ– (প্র-জন্ (জন্মানো)+ড) 'যা জন্মায়'। এই অর্থে সন্তান-সন্ততি যেমন প্রজা, তেমনই মানুষসহ সমস্ত প্রাণীও প্রজা বা প্রকৃতি। সমাজ এই প্রজাদের সমবায়েই সৃষ্ট। তাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে, জড়জগতের মতো মানবসমাজেও প্রকৃতিই প্রধান বা মূল বা আদি তথা আদ্যাশক্তি।

প্রাচীন যোগ এবং তন্ত্রও সাংখ্যের মতোই প্রকৃতি-প্রধান। অর্থাৎ এগুলো সবই প্রকৃতিজাত প্রাকৃত জগতে প্রাকৃতজনের দর্শন ও জীবনপদ্ধতির ধারক। প্রাকৃত জগৎ ও প্রাকৃতজনেরই অন্য নাম 'লোক'। যা 'লোকেষু আয়ত'– ইহলোক সম্পর্কীয় ও লোকসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যা– তা-ই 'লোকায়ত'। উপমহাদেশের আদি সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগ এই লোকায়তেরই অন্তর্গত।

'তন্ত্র' পুরো প্রকৃতিকে অবলোকন করেছে দেহের মধ্যে। প্রাকৃত দেহের বাইরে তন্ত্র কোনো অপ্রাকৃত চেতনার খোঁজ করে নি। বরং বলেছে : পুরো ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে তার সবই আছে দেহের মধ্যে– 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা : সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে'– 'যা নাই ভাণ্ডে (অর্থাৎ দেহে) তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে '। তন্ত্র সাধনা আসলে দেহ-সাধনার মধ্য দিয়েই প্রকৃতির পরিচর্যা। যোগও সেই একই রকম পরিচর্যার ধারক।

একটু আগেই সাংখ্যদর্শনকে 'বস্তুবাদী' বলে চিহ্নিত করেছি এবং সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে আধুনিক কালের দর্শনের ভাষায় যে 'বস্তু' ও 'ভাব' বলে অভিহিত করা যায়, সেকথাও বলেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সাংখ্য শুধু বস্তুবাদী নয়, আধুনিক কালের ভাষা প্রয়োগ করলে বলতে হবে যে– এ দর্শন নারীবাদীও। এবং একালের নারীবাদের চেয়েও অনেক বেশি দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন, সাংখ্যের এই নারীবাদ। কারণ সাংখ্যমতে, 'প্রকৃতি'র অর্থ শুধু 'বস্তু' নয়, 'প্রকৃতি' মানে নারী। জড়জগতে যেমন বস্তুই প্রধান, জীবজগৎ তেমনই নারীপ্রধান। 'পুরুষ'ও আছে অবশ্যই, তবে তার ভূমিকা একান্ত গৌণ। নারী থেকেই সব জীবের সৃষ্টি, তাই নারীই প্রকৃতি।

না, অনির্দিষ্টভাবে নারী নয় শুধু।

আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নারীর জননাঙ্গ বা যোনিকেও বলা হয়েছে প্রকৃতি। অর্থাৎ জন্মপ্রক্রিয়ায় নারীর জননাঙ্গেরই যে মূল ভূমিকা– আদি সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তাদের চেতনায় এ বিষয়টিরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযুক্তিও আবশ্যক বটে, কিন্তু সে আবশ্যকতা কেবল ওই সংযুক্তিটুকু পর্যন্তই– এর বেশি নয় মোটেই। গর্ভধারণ, প্রসব ও স্তন্যদান– সন্তানের জন্ম তথা প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাবৃদ্ধির পুরো প্রক্রিয়াটির ধারক নারীরূপা প্রকৃতিই। তাই সাংখ্যের প্রকৃতি-প্রাধান্যের মানে যুগপৎ বস্তুপ্রাধান্য ও নারী প্রাধান্য। তন্ত্র এবং যোগও, এক্ষেত্রেও সাংখ্যেরই অনুবর্তী।

তবু এরপরও কথা থেকে যায়। আমরা সাংখ্য,যোগ ও তন্ত্রকে বস্তুবাদী ও নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করছি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ধারকদের বক্তব্য তো আমাদের অভিমতের সঙ্গে মেলে না। আমরা যাকে বস্তুবাদ বলি, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকাররা তাকে নাস্তিকতা বলে নিন্দা করেন। প্রাচীন ভারতের আপসহীন বস্তুবাদী চার্বাক বা লোকায়তিকদের প্রতি তাঁরা বিরামহীন নিন্দাবর্ষণ করে চলেন। আবার তাঁদের শাস্ত্রে পুরুষেরই জয় জয়কার, নারীপ্রাধান্যকে হটিয়ে দিয়ে সে শাস্ত্র পুরুষতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অথচ এই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রই বস্তুবাদী সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগকে আস্তিকতার শিরোপা পরিয়ে দেয়; এই নারীপ্রধান তত্ত্বপ্রস্থানগুলোকে পুরুষতন্ত্রের পরিপোষক বানিয়ে ফেলে।

কী করে এমনটি হয় ?

॥ তিন ॥

যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদেরকেই এখন নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসকারী মাত্রই নাস্তিক বলে চিহ্নিত হতো না। সেকালের ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীদের দৃষ্টিতে বেদ-অমান্যকারীরাই ছিল নাস্তিক। এই 'বেদ' আসলে কোনো বিশেষ গ্রন্থের নাম নয়। বেদের অন্য নাম 'শ্রুতি'। লিখনশৈলী আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের শ্রুতিপরম্পরায় প্রবাহিত জ্ঞান বা বিদ্যা 'বেদ'। ('বেদ' শব্দটির মূলে আছে 'বিদ' ধাতু। 'বিদ' এর অর্থ 'জানা'। 'বেদ' ও 'বিদ্যা' দুটো শব্দই 'বিদ' ধাতু থেকে জাত।) ক্রমে সেই বেদকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হতে থাকে, যেমন– সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। স্বাভাবিকভাবেই এসব বিভাগেরও দেখা দেয় নানা উপ-বিভাগ। যেমন, সংহিতাই বিন্যস্ত হয়ে যায় চার ভাগে– ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। এভাবে সকল শ্রুতি বহু বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ধারণ করে এক অতিকায় রূপ। শ্রুতির ধারক-বাহক ব্রাহ্মণরাই তৈরি করেন স্মৃতিশাস্ত্র। এই স্মৃতিশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করা হয় পালনীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ। শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রচলিত শ্রুতি ও স্মৃতির সম্মিলিত ভাব-ভাবনা ও বিধিবিধানই 'বৈদিক' (বেদ+ষ্ণিক)– এই সাধারণ অভিধায় অভিহিত ও পরিচিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের সকল ব্যাখ্যা-ভাষ্য যাঁরা মান্য করেন তাঁরাই হন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত। 'হিন্দুধর্ম' নামে যা পরিচিত তা আসলে এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মই। শাস্ত্রকারদের অনুশাসন অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাঁরা অন্তর্গত, তাঁরাই বেদমান্যকারী বলে স্বীকৃত হন। আর এরকম বেদমান্যকারী সকলেই ব্রাহ্মণ্য বিধানে 'আস্তিক' বলেও স্বীকৃতি পেয়ে যান। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত শাস্ত্রের মতে বেদ তথা ব্রাহ্মণ্য বিধান মেনে চলাই আস্তিকতা, আর সে-বিধান অমান্য করাই নাস্তিকতা। এই আস্তিকতা-নাস্তিকতার সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনো আত্যন্তিক সম্পর্ক নেই। নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকাররা ঈশ্বরবিশ্বাস-বিবর্জিত অনেক তত্ত্বকেও বেদানুগত তত্ত্বে পরিণত করে ফেলেন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এভাবেই নিরীশ্বর সাংখ্যও তাঁদের হাতে আস্তিক দর্শন হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যোগ ও তন্ত্রও।

তবে, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কৌশল হিসেবে সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদকে মেনে নিলেও তাঁদের জানা ছিল যে, লোকসাধারণের ভেতর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে রাখতে পারলেই পুরো সমাজের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা অনেক সহজ হয়। সেই লক্ষ্যেই তাঁরা সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদকে আস্তে আস্তে অনেকখানি ভোঁতা করে ফেলেন। সেরকম ভোঁতা করে তোলার কাজে তাঁরা প্রথমেই ব্যবহার করেন যোগদর্শনকে। নিরীশ্বর (নিঃঈশ্বর) সাংখ্যের বিপরীতে যোগদর্শনকে তাঁরা বলেন সেশ্বর (স+ঈশ্বর) সাংখ্য। যোগদর্শনের আদিরূপের অনেক কিছুকে বিকৃত, লুক্কায়িত ও বিলুপ্ত করে ফেলেই এমনটি তাঁরা করলেন। এমনই করলেন তন্ত্রকে নিয়েও। আদিতে তন্ত্র ছিল দেহাত্মবাদী এবং সাংখ্যের মতোই তন্ত্র অনুসারেও বিশ্বের আদি কারণ পুরুষ নয়– নারী বা প্রকৃতি। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীদের হাতে সেই তন্ত্রও আধ্যাত্মবাদী ও পুরুষপ্রাধান্যমান্যকারী তত্ত্বে পরিণত হয়ে গেল।

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র– এই তিনটি অবৈদিক তত্ত্বপ্রস্থানকেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকাররা একান্ত ধূর্ততার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। অথচ এই তিনটিরই সৃষ্টি অবৈদিক লোকসাধারণের হাতে। শুধু অবৈদিক নয়, এগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল প্রাক-বৈদিক লোকসমাজে। সেই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রাধান্যমূলক। আদিম কৃষিই ছিল সেই সমাজের মানুষের জীবিকার অবলম্বন তথা অর্থনৈতিক ভিত্তি। কৃষি যে নারীদের আবিষ্কার, সে-কথা তো আজকের সমাজবিজ্ঞানে অবিতর্কিত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। কৃষি-আবিষ্কারের সেই আদিম পর্বের সমাজটির প্যাটার্ন স্বাভাবিকভাবেই ছিল নারীপ্রাধান্যমূলক। প্রাক-বৈদিক ভারতের কৃষিনির্ভর সেই সমাজেই আদি সাংখ্যের ভাবনা-ধারণার বীজ

উপ্ত হয়েছিল। সেই সমাজে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষেরা যে ভূমিকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করত, সেই ভূমিক্ষেত্রকেই তারা প্রকৃত বলে জানত। আর নারীকে তারা জানত সন্তান তথা প্রজা-উৎপাদনের ক্ষেত্ররূপে। তাই সেই নারীও তাদের কাজে ছিল প্রকৃত। ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের জন্য বীজ লাগে বটে, কিন্তু সেই বীজের ভূমিকা তাদের কাছে যেমন গৌণ বলে মনে হয়েছিল, প্রজা-উৎপাদনে পুরুষের ভূমিকাকেও তারা তেমনই অপ্রধান বলে ধরে নিয়েছিল। সে-কারণেই আদিম কৃষিকেন্দ্রিক গোষ্ঠিবদ্ধ মাতৃপ্রধান সমাজের দার্শনিক ভাবনাও ছিল বীজের বদলে ক্ষেত্রপ্রধান, পুরুষের বদলে নারী বা

যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে, দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ— যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহারই সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতিপ্রধান।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এ-সবই উল্টে যায় তখন, যখন আদিম কৃষিপ্রধান মাতৃকেন্দ্রিক গোষ্ঠিসমাজটি ভেঙে পড়ে, যখন পশুপালক আর্যদের হাতে পুরুষকেন্দ্রিক শ্রেণিসমাজের পত্তন ঘটে। ব্রাহ্মণরা তো সেই সমাজেরই বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠি। সেই ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি বেদ ও বেদানুগত দর্শন। সে দর্শন সে-সময়কার নব-উন্মেষিত পুরুষতন্ত্রী সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত ও প্রচারিত। সে দর্শনে প্রকৃতির (বস্তু ও নারী) বদলে পুরুষই (ভাব ও নর) প্রধান। সে দর্শন একই সঙ্গে ভাববাদী ও পুরুষতন্ত্রী। ভাববাদী বলেই দৃশ্যমান ও বাস্তব ইহলোকের উপরে অদৃশ্য ও কল্পিত পরলোক এবং অলৌকিকের প্রাধান্য; আর পুরুষতন্ত্রী বলেই নারী গৌণ, পুরুষ মুখ্য।

বেদানুসারী ব্রাহ্মণ্যধর্মেও তাই পুরুষ দেবতাদেরই প্রাধান্য, সংখ্যায় ও প্রতিপত্তিতে স্ত্রী দেবতারা একেবারেই নগণ্য। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে এই পুরুষতন্ত্রী আর্যরাই সামাজিক কর্তৃত্বের বিস্তার করে বসে। এর ফলে অবৈদিক ও প্রাক-বৈদিক মাতৃতন্ত্রের স্থলে বেদানুসারী পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে এবং পুরুষ-প্রাধান্যমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মই প্রকৃতিপ্রধান ধর্ম-দর্শনকে নিতান্ত প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়।

তবু, সমাজে পুরুষপ্রধান ব্রাহ্মণ্যবাদ কর্তৃত্বশীল হয়ে যাওয়ার পরও প্রান্তজনেরা কিন্তু সহজে প্রকৃতি-প্রাধান্যমূলক ভাবনা-ধারণা তথা দর্শনকে পরিত্যাগ করে নি। এখনও করছে না। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের লোকসাধারণ যে গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে চলেছে, এখানকার হাজার বছরের সংস্কৃতির ইতিহাসেই তার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে।

॥ চার ॥

বেদানুসারী ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং কর্তৃত্বও বিস্তার করেছে বটে। কিন্তু লোকসাধারণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বৈদিক বিশুদ্ধতাকে পরিত্যাগ করতে ও বাংলার প্রাকৃতজনের প্রকৃতিভাবনার সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলার লোকসাধারণের চিন্তাচেতনায় ও জীবনাচরণে প্রাক-বৈদিক মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠিসমাজের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারই প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই, শ্রেণিসমাজের কর্তৃত্ব যখন তাদের ওপর চেপে বসেছে, তখনও সেই কর্তৃত্বকে বহুল পরিমাণে প্রতিহত করে আপন স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সেই সক্ষমতারই প্রমাণ আমরা পাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনায়, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া থেকে শুরু করে আউল-বাউল সহ বাংলার সকল লৌকিক ধর্মের বিশ্বাসে ও আচরণে। মঙ্গলকাব্য সহ বিভিন্ন কাজে আমরা দেখি বৈদিক বা অবৈদিক পুরুষ দেবতার উপরে লৌকিক স্ত্রী-দেবতাদেরই প্রতাপ ও প্রাধান্য। এসবের মধ্য দিয়ে বাংলার সংস্কৃতিতে অবৈদিক ও প্রাক-বৈদিক আদি সাংখ্য-যোগতন্ত্রের প্রবল প্রভাবের পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীরা বৈদিক আধ্যাত্মিকতার

সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সাংখ্য-যোগতন্ত্রের যেসব ভাষ্য রচনা করেন, বাংলার প্রাকৃতজনের কাছে সেসব ভাষ্য গৃহীত হয় না। প্রাকৃতজন প্রকৃতিপ্রাধান্যের প্রতিই আস্থাশীল থাকে। নারীদের হাতে কৃষি আবিষ্কারের প্রায় প্রাথমিক যুগে সৃষ্ট সাংখ্যদর্শনে জীবসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পুরুষের ভূমিকাটি অস্পষ্ট থেকে গেলেও পরবর্তীকালে তাতে অনেক পরিমাণে স্পষ্টতার সঞ্চার ঘটে। প্রকৃতিপ্রাধান্যের প্রতি আস্থাকে অটুট রেখেও যোগ ও তন্ত্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে। প্রাকৃত বাঙালির তন্ত্রসাধনার মধ্যে অভিব্যক্ত এই বিষয়টি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলিতে অনুপুঙ্খ সমেত উঠে এসেছে। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন–

> "যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে, দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ– যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করেন যে, মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ প্রভৃতি পিতৃবীর্যে সৃষ্টি হয়; মাতৃরজে শোণিত, মাংস, চর্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্বসংসারে পুরুষপ্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলাপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের-কম্পনের-ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দন-জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন; আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। এই বিন্দুতে বিলাস করিয়া মহামায়া সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বিন্দুবি-লাসিনী। ... মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নরনারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা। ...কাম ও মদনজন্য যেমন নূতন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনি পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দনজন্য বিশ্বব্যাপী নাম এবং রূপের বিকাশ হইয়াছে। ইহাই হইল বিশ্বসৃষ্টি তথা জীবসৃষ্টির মধ্যে সমতাবিষয়ক গোটাকয়েক মোটা কথা। তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে।"

(পাঁচকড়ি-রচনাবলী (২) থেকে দেবীপ্রসাদের 'লোকায়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত - (পৃষ্ঠা ৪৮৪-৮৫)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন, মণীন্দ্র মোহন বসু, শশীভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিদ্বানের গবেষণা ও অভিমতের পর্যালোচনা করে বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ-কোলকাতা-ভাদ্র, ১৩৬৩) বাংলার প্রাকৃতজনের দর্শনচিন্তা ও সংস্কৃতি-সাধনায় প্রকৃতি-প্রাধান্যের বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। দেবীপ্রসাদের পর ডক্টর আহমদ শরীফ, সুধীর চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝা, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবুল আহসান চৌধুরী এবং এরকম আরও অনেক গবেষকের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে আউলবাউল সহ বাংলার বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব-তথ্যই আমরা জানতে পেরেছি। ফলে প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের ও আমাদের সংস্কৃতিতে সেই প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পথ অনেক সুগম হয়ে গেছে।

যে মাতৃপ্রধান কৃষিভিত্তিক সমাজে সাংখ্য ও তন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল, পরবর্তী কালের সমাজ-বাস্তবে সেই মাতৃপ্রাধান্য অবসিত হয়ে গেলেও কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রাকৃতজনের স্মৃতি থেকে তা মুছে যায় নি। তাই বাংলা অঞ্চলে পুরুষতন্ত্রী ব্রাহ্মণ্য অধিকারের বিস্তৃতি ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও এখানকার ধর্মে ও সংস্কৃতিতে নারী প্রাধান্যমূলক সাংখ্য ও তন্ত্রের প্রভাব অক্ষুণ্ন থেকে যায়। এ-বিষয়টি লক্ষ্য করেই উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন–

> "... সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে।... সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি– আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।"

(বঙ্কিম রচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, পৃষ্ঠা-২২২)

বলা যেতে পারে : সাংখ্য ও তন্ত্রের প্রকৃতি-প্রাধান্যের প্রভাবেই চর্যাসংগীতে চণ্ডালিনী, ডোম্বী, শর্বরী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী প্রভৃতি নারীশক্তি প্রাধান্য পেয়েছে; বাংলার মঙ্গলকাব্যে পুরুষদেবতাদের পরাভব ও স্ত্রী দেবতাদের জয় ঘোষিত হয়েছে; শক্তিসাধনার বিস্তৃতি ও শাক্ত পদাবলীর প্রসার ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও পুরুষ কৃষ্ণকে ছাপিয়ে প্রকৃতি রাধাই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং বৈষ্ণব সহজিয়ারাও বিধান দিয়েছেন–

পুরুষের দেহ ত্যাগ করিয়া
প্রকৃতি স্বরূপ হবে।
তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ
হৃদয়ে দেখিতে পাবে ॥
প্রকৃতি হইলে প্রকৃতি মিলয়ে
পুরুষ দেহতে নাই।
আছয়ে পরেশ শোধন করিলে
তুরিতে পারিবে ভাই ॥
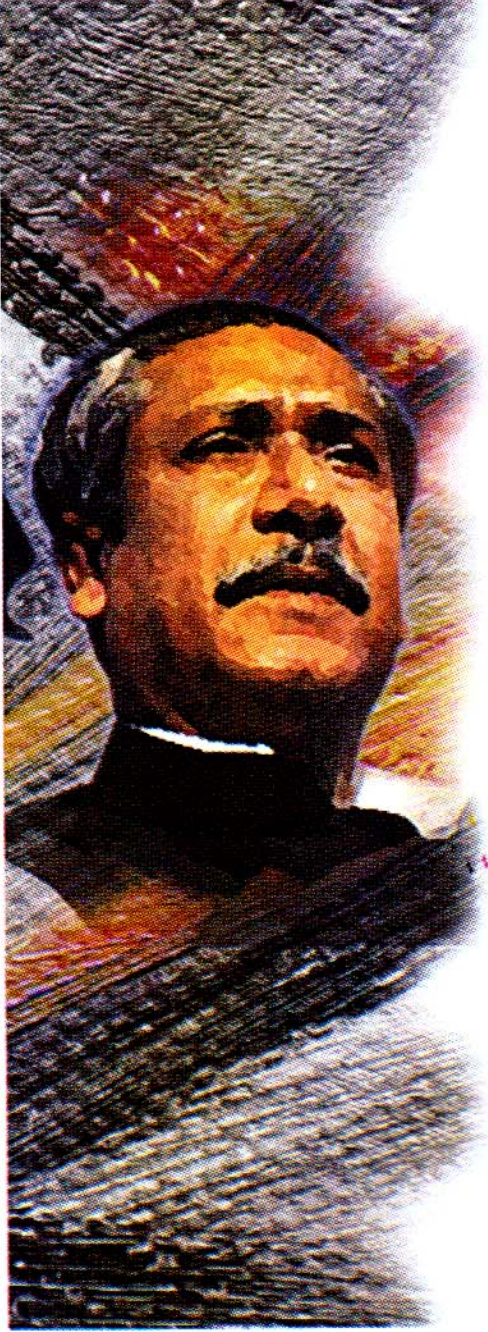
বঙ্গবন্ধু
'এল মহাজনমের লগ্ন'

মফিদুল হক

বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশ যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের পক্ষে সেই দিনগুলোর তামসিক চরিত্র অনুধাবন করা কঠিন। জাতির জনককে তাঁর জীবনের মধ্যগগনে যারা হত্যা করেছিল নৃশংসভাবে, তারা কেবল ব্যক্তি মুজিবকে সবংশে নিধন করতে চায় নি, একই আক্রোশ ও ঘৃণা নিয়ে চেয়েছিল রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে মুজিবের জীবনাদর্শের সব নিশানা মুছে ফেলতে। রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে এই কাজে তারা নেমেছিল বেশ আটঘাট বেঁধে। বঙ্গবন্ধুর নাম তখন কোথাও কোনোভাবে উচ্চারিত হতো না, বা করা যেত না। পত্রপত্রিকা গণমাধ্যম ছিল সরকারের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত, সরকারি হুকুম অমান্য করবার সুযোগ গণমাধ্যমের ছিল না। সাহস করে কেউ কিছু করলে তার ফল মিলতো হাতেনাতে, কেননা

সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকার জন্য সরকারের ওপর ছিল বিশেষ নির্ভরতা। তাই স্বাধীন মতপ্রকাশের পথ মাড়াবার কথা কেউ ভাবেন নি, অনেক আড়াল-আবডাল করে প্রতীকীভাবে কেউ কেউ কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন, তবে তা এতোটাই সংগুপ্ত এবং এমনই কিঞ্চিৎকর ছিল যে জনচিত্তে বিশেষ দাগ কাটতে পারে নি। তারপরও ছিলেন কিছু ঘোরলাগা মানুষ, অন্তত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা বিবেকের তাড়নায় যেমন তাড়িত হয়েছেন তেমনি এর প্রকাশ ঘটাতেও পিছপা হন নি। তেমনি এক গল্প লিখেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল, ছাপা হয়েছিল '*সমকাল*' সাহিত্য পত্রিকায়। 'মৃতের আত্মহত্যা' শীর্ষক এই গল্প অবশ্য একান্ত প্রতীকী রূপ নিয়েছিল, উন্মোচন করেছিল ঘাতকের মানস। এক্ষেত্রে তাৎপর্যময় রচনা আমরা পাই কবি নির্মলেন্দু গুণের কাছ থেকে, 'আজ আমি কারো রক্ত চাইতে আসিনি', বাংলা কবিতার ইতিহাসে যা অনন্য হয়ে থাকবে। কেবল কবিতা বিচারে নয়, রাষ্ট্রের সকল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে কবিতা কীভাবে জনচিত্তে গভীর ছাপ ফেলে ইতিহাসকে সত্যমূল্যে চিনে নিতে সাহায্য করতে পারে গুণের কবিতা হয়ে আছে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই কবিতা নির্মলেন্দু গুণ পড়েছিলেন বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানের সভামঞ্চে, ১৯৭৭ সালে। সেঙ্গরপীড়িত দেশে কবিতা পাঠের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছিল দুঃসাধ্য, বিশেষত ফেব্রুয়ারির দিনগুলোতে বাংলা একাডেমী যেন হয়ে ওঠে মরুর ঊষরতায় এক খণ্ড সবুজ দ্বীপ। কিন্তু কবি তো সবসময় দ্বীপবাসী হয়ে থাকতে পারেন না, তাঁকে জীবনস্রোতে মিশতেই হয়, আর তাই রাষ্ট্রশক্তির পীড়নের শঙ্কামুক্ত হওয়ার অবকাশ থাকে না। ঝুঁকি নিয়েই নির্মলেন্দু গুণ পড়েছিলেন সেই কবিতা এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো জাতিচেতনায় তা তরঙ্গায়িত হয়েছিল। শিল্পের অমোঘ শক্তির পরিচয় আরও অনেক কিছুর জানান দিয়েছিল, ইতিহাসের নির্মাতা নেতা যে কীভাবে কবিতা হয়ে উঠতে পারেন সেটা যেমন এখানে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পরিচয় পাওয়া গেছে বঙ্গবন্ধুর মহিমার, বোঝা গেছে রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক ও পীড়নমূলক সমস্ত আয়োজন উপেক্ষা করে সত্য কীভাবে জেগে উঠতে পারে। শিল্পশক্তি ও জনশক্তিই বঙ্গবন্ধুকে আবার ফিরিয়ে এনেছে জনসমাজের কাতারে, জনগণের নেতাকে জনতাই নিয়েছে খুঁজে এবং এই প্রক্রিয়া নানাভাবে সমাজে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল বলেই জাতি শেষাবধি সকল অমানিশার অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন যথাযথভাবে করতে সক্ষম হয়েছে।

সময় পাল্টেছে, যুগবদল হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলবার প্রচেষ্টা হতোদ্যম হয়েছে, প্রতিক্রিয়ার বাধার বিরুদ্ধে জাতি ঐক্যবদ্ধ রায় দিতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিবর্তিত সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত পুস্তকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এর মধ্যে বেশ কিছু পরিশ্রমী ও গবেষণামূলক গ্রন্থও রয়েছে, প্রামাণ্য জীবনী লেখার প্রয়াস অনেকে নিয়েছেন, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন আরও অনেক বেশি মানুষ। নতুন পরিস্থিতিতে বিদ্বৎসমাজের ওপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। বিশেষণের প্রাবল্য অথবা স্তাবকতা কোনো নতুন মাত্রা যোগ করবে না। সে জন্য চাই তথ্যানুসন্ধানে গভীরতা ও বিস্তার, সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে হতে পারে নবতর মূল্যায়ন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা যতই হোক তারপরও তাঁর জীবনের অনেক দিক এখনও অনালোকিত রয়ে গেছে এবং সেসব বিষয়ে তথ্যমূলক গবেষণা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে এমনি গবেষণার দায় সুষ্ঠুভাবে মেটানো সম্ভব নয় এবং এ জন্য চাই বিদ্বৎমণ্ডলীর ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তথ্যভিত্তিক যেসব জীবনী বা মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েও বলতে হয় বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক দিক এখনও অনালোচিত ও অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। প্রশান্ত কুমার পাল রবীন্দ্রনাথের জীবন বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন, নবম খণ্ড তথা কবির জীবনতথ্য ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এসে যা অসমাপ্ত থেকে গেছে, বঙ্গবন্ধু বিষয়ে সেই মাপের কাজের জন্য আমাদের হয়তো আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। কেননা তার আগে প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলা। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপকরণ বটে, তবে প্রামাণ্য জীবনীর তা বিকল্প নয়, চাই তথ্যমূলক আরও নানা সংযোজন।

বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থের একটি টীকাভাষ্য সংবলিত পঞ্জি প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, যে তালিকায় প্রতি বছর নতুন সংযোজন ঘটতে পারে। আরও প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণের সংকলন প্রকাশ করা। ভাষণের একটি সংকলন মুক্তিযুদ্ধকালে রামেন্দু মজুমদার প্রকাশ করেছিলেন, তবে সেটা ছিল মূলত তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াস, সেই গ্রন্থে সত্তরের নির্বাচনী ভাষণ থেকে শুরু করে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্থান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে শাহরিয়ার ইকবালের সম্পাদনায় পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভার যেসব কার্যবিবরণী প্রকাশ পেয়েছে সেখানে বঙ্গবন্ধুর সংসদীয় ভাষণের কিছু পরিচয় আমরা পাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রেও ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণীর কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ স্থান পেয়েছে। তবে এসব কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সংকলন বিভিন্ন খণ্ডে ইতিহাসের অনেক অনালোকিত অধ্যায় আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হতে পারে। যেমন বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ২৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি আহূত কনভেনশন বা সম্মেলনের কথা। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা ও প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি বার লাইব্রেরি হলে আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগ দেন। কমিটির

আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর ভাষণের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই বদরুদ্দীন উমর প্রণীত '*পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে । বদরুদ্দীন উমর প্রদত্ত সভার বিবরণী থেকে আমরা আরও জানতে পারি, '২৭ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান করা হয়। তিনিও ২৭ এপ্রিলের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।' এর বাইরে আর কোনো তথ্য বদরুদ্দীন উমর হাজির করেন নি। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে উমরের এই বিশাল কাজ অদ্যাবধি সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে অদ্বিতীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত রয়েছে, বলা যেতে পারে গবেষণার এক অনুপম নিদর্শন হিসেবে কীর্তিত হয়েছে।

শেখ মুজিব বয়সে তরুণ হলেও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন অনেক দিন থেকে, তবে সে রাজনীতি ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকে যে র‍্যাডিক্যাল তরুণ সমাজ আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দীকে ঘিরে বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছিল শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা ছিল রাজনীতির কেন্দ্র এবং ফরিদপুর তথা গোপালগঞ্জ থেকে কলকাতা যাতায়াত করা যেত সুলভে ও সহজে। শেখ মুজিব কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের আগস্টে দেশভাগের পর তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরিতে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস থেকেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শেখ মুজিবের নামের দেখা আমরা পাই, ঢাকায় নবাগত হলেও তিনি অচিরে ছাত্র রাজনীতি ও মূলধারার রাজনীতির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে যখন নবগঠিত পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয় তখন শেখ মুজিব নির্বাচিত হন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক পদে। অথচ এপ্রিল মাস থেকে তিনি ছিলেন কারাগারে এবং মুক্তি পান জুলাইতে। এই মুক্তিও ছিল সাময়িক, তবে মুক্তি পেয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন আরমানিটোলা ময়দানে, আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রথম জনসভায়। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই জনসভায় শেখ মুজিব ভাষণও দিয়েছিলেন, যদিও সেই ভাষণের বিবরণ এখনও রয়ে গেছে অনুদ্‌ঘাটিত। এরপর শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং মুক্তি পেলেন দুই বছরেরও পর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শক্তিময়তার কারণে সে বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি। এই দীর্ঘ কারাবাসকালে শেখ মুজিব যে রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, জেলখানায় থেকে যতটা সম্ভব রেখে চলেছিলেন সেটা নানাভাবে জানা যায়। রাজনীতিবিদরা এমনটা সব দেশে সবসময়ে করে থাকেন, যথাসম্ভব আইনের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেন, আর কারা নিয়ন্ত্রণ ফাঁকি দেয়ার পন্থাও তাঁরা বের করে নেন। শেখ মুজিব তো এই কাজে বিশেষভাবে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, এক্ষেত্রে জেলের কর্মকর্তা, প্রহরী থেকে ডাক্তার অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা তিনি আদায় করে নিতে পারতেন। ফলে তিনি গরাদের আড়ালে মাথা কুটে মরা বিস্মৃত রাজনীতিক কখনো হয়ে ওঠেন নি, পূর্ব বাংলার জায়মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে কাটছিল তাঁর কারাজীবন।

১৯৫২ সালের গোড়াতে তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির আন্দোলন বিস্তার পেয়ে চলছে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সমতালে বিনাবিচারে আটক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কারাগারে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদও অনশন শুরু করবার ঘোষণা দেন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা অনশন শুরু করেন। এমতাবস্থায় সরকার তাঁদেরকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর কারাগারে প্রেরণ করে। ফেব্রুয়ারির শেষে সেখান থেকে মুক্তিলাভের পর অনশনক্লিষ্ট শেখ মুজিব তাঁর পিত্রালয় টুঙ্গিবাড়ীতে চলে যান এবং স্বাস্থ্য কিছুটা পুনরুদ্ধারের পর ঢাকায় আসেন এপ্রিল মাসে, আর যোগ দেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির কনভেনশনে, যে কথা বদরুদ্দীন উমর তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে সেই সভায় শেখ মুজিবের ভূমিকা কি উমর-কথিত নিছক যোগদানেই সীমিত ছিল, নাকি দুই বছরেরও বেশি কারাবাস শেষে মুক্ত তরুণ রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতি প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছুটা বাড়তি আলোড়ন তুলেছিল? তিনি কি ঐ সভায় কোনো বক্তৃতা দিয়েছিলেন, দিয়ে থাকলে কী বলেছিলেন? তিনি কি সভায় কোনো বিশিষ্টতা যোগ করতে পেরেছিলেন, নাকি বিস্মৃত রাজনীতিকের পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ হিসেবে তা গণ্য হয়েছিল। এইসব জিজ্ঞাসার জবাব বদরুদ্দীন উমরের বিবরণীতে আমরা পাই না; কিন্তু সেই সভার প্রতিক্রিয়ার ধরন থেকে তৎকালীন রাজনীতিতে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি আমরা পেতে পারি। এর এক বিবরণ আমরা পাই তৎকালীন সাপ্তাহিক '*ইত্তেফাক*' পত্রিকার রিপোর্ট থেকে, যেখানে কিছুটা সবিস্তার ভাষ্য মেলে :

'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে জনগণ শেষ রক্তবিন্দু দিবে', এই শিরোনামে ৫ মে ১৯৫২ ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয়, 'যারা মনে করিয়াছিলেন যে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাইয়া, জেলজুলুমের ভয় দেখাইয়া রাষ্ট্রভাষা তথা জনতার বাঁচিবার অধিকারকে দমাইয়া রাখিতে পারিবেন, তাদের দিবাস্বপ্নকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জিলা, মহকুমা, ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি, সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, ইকবাল হল, মেডিকেল স্কুল, মিটফোর্ড স্কুল, জগন্নাথ কলেজ, আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিশ, ইসলামিক ভ্রাতৃসংঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বহুসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ঢাকা বার

লাইব্রেরির প্রশস্ত হলেও তাদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বাহিরে, রাস্তায় অনেককে স্থান নিতে হয়।'

ভাষা আন্দোলনের পর অনুষ্ঠিত এই অসাধারণ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি প্রান্তিক হিসেবে বিবেচিত হওয়াই বুঝি ছিল স্বাভাবিক, কেননা দুই বছরের অধিককাল তিনি রাজনীতির মাঠে উপস্থিত নেই, ছিলেন কারাবন্দি। অথচ সংবাদ-ভাষ্য থেকে আমরা পাই সম্পূর্ণ বিপরীত এক বাস্তবতার ছবি। ইত্তেফাকের বিবরণীতে লেখা হয় : 'সদ্য জেলমুক্ত ত্যাগী তরুণ বিপ্লবী নেতা শেখ মজিবর রহমান বক্তৃতা করিবেন ঘোষণা করা হইলে উপস্থিত জনতার মধ্যে এরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হয় যে, সভাপতি সাহেব বলেন যে, মজিবর সাহেব পরেই বক্তৃতা করিবেন, নতুবা তার বক্তৃতার পর আপনাদের হয়তো অন্যদের বক্তৃতার প্রতি উৎসাহ কমিয়া যাইবে।'

সভায় প্রদত্ত তরুণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের যে যৎসামান্য বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বঙ্গবন্ধুর মানস ও চেতনার দৃঢ়তার পরিচয় আমরা পেতে পারি। তিনি বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, দীর্ঘ আড়াই বছর কারাবাসের পর আপনাদের সামনে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য। আমি অসুস্থ– বিশেষ বক্তৃতা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি যখন জেলে অনশন করিতেছিলাম তখন আমার ছাত্রবন্ধুদের উপর গুলি চালনার খবর পাই, ছাত্রদের এ-ত্যাগ কিছুতেই বৃথা যাবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকার যত ইচ্ছা গ্রেপ্তার করিতে পারেন কিন্তু বাংলা ভাষা আমাদিগকে দিতে হইবে।'

পত্রিকার ভাষায়, 'জনাব মজিবর বর্তমান সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিয়া বলেন, সাহস থাকে তো গণভোট অনুষ্ঠান করিয়া ভাষা তথা অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান করুন। আমি জানি গণভোট হইলে দেখা যাইবে যে, মন্ত্রীরা ও মর্নিং নিউজ ছাড়া সবাই বাংলা চায়। ... এই অত্যাচার জুলুমের গোড়ায় কি?– মুসলিম লীগ। সঙ্ঘবদ্ধ হউন, মুসলিম লীগ কবরে যাবে। আমরা বিশৃংখলা চাই না, আমরা বাঁচতে চাই, ভাষা চাই।'

১৯৫২ সালে তরুণ মুজিবের জনস্বীকৃতি ও জনসম্পৃক্তির পরিচয় আমরা এখানে পাই, তেমনি বুঝতে পারি তাঁর চেতনার দৃঢ়তা ও দেশবাসীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি ও অনুভবের অনন্যতা, যখন তিনি বলেন 'আমার ছাত্রবন্ধুদের' উপর গুলি চালনার কথা, আমাদের তুলনীয় মনে হবে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ, যেখানে তিনি বলেছিলেন 'আমার জনগণের ওপর' গুলি চালনার কথা। এই 'আমার' উক্তি যে বিশাল মানসের পরিচয় বহন করে তা বুঝি ছিল শেখ মুজিবের সহজাত অন্তরধ্বনি।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শেখ মুজিবের ভাষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আমাদের অনেক উপাদান যোগাতে পারে যা তাঁর জীবনপরিচয় পেতে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট আমলে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নতুন দিন' বিশেষ সহায়ক হতে পারে। আরও খোঁজ করা যেতে পারে সরকারি স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও গোয়েন্দা দফতরের প্রতিবেদনে। সেকালে রাজনৈতিক জনসভায় সাংবাদিকদের টেবিলে এস-বির লোকেদেরও জায়গা করে দেয়া হতো, গণতান্ত্রিক রীতি মান্য করে। ফলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে শেখ মুজিবের ভাষণের অনেক বিবরণ নিশ্চয় মিলবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের আরেক অধ্যায় সম্পর্কেও তথ্যের বড় উৎস সরকার এবং সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত দু' খণ্ডের যে প্রামাণ্য জীবনী ২০০৮ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা পুরোপুরি প্রামাণ্য না হয়ে উঠতে পারলেও কারাজীবন সম্পর্কে আগ্রহোদ্দীপক তথ্য উপস্থাপন করতে পেরেছে। সরকারের সহায়তায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ সূত্রে প্রাপ্ত ১৬টি নথি থেকে কারাজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পাদনা পরিষদ উদ্ধার করেছেন। যৎসামান্য এই কয়েকটি নথি জানান দেয় সরকারিভাবে আরও কতকিছু উদ্ধারের রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ সরকারি দলিলপত্রের মহাফেজখানা হিসেবে এই কাজে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর জীবন জানার ক্ষেত্রে সরকারি দলিলপত্রের ভাণ্ডার এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অব্যবহৃত হয়ে রয়েছে এবং এখানে গবেষকদের প্রবেশাধিকার করে দেয়া বিশেষ জরুরি।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরেক অনালোকিত অধ্যায় তাঁর কৈশোর ও যৌবনে রাজনীতিতে অভিষিক্ত হওয়ার কাল। তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন ১৯৪২ সালে, এরপরে তাঁর কলকাতা-জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। স্কুলজীবনে চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে তাঁর পড়াশোনায় ছেদ পড়ে এবং পিতা তাঁকে কলকাতায় প্রখ্যাত ডাক্তার আর. আহমদের কাছে নিয়ে আসেন বলে জানা যায়। এছাড়া আরও নানাভাবে যে কলকাতায় তাঁর পদপাত ঘটছিল সেটা অনুমান করা যায়। ফরিদপুরবাসীর জন্য কলকাতা খুব দূরের শহর ছিল না এবং মুজিবও কলকাতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এখানে তিনি আসছিলেন বিভিন্ন গুণীজনের সান্নিধ্যে, যারা তাঁর জীবনচেতনা নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের কলকাতা-জীবন অথবা তাঁর মানসগঠনে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাব সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানতে পারি। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত অমন যে দু' খণ্ডের হাজার পৃষ্ঠার জীবনী, সেখানে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের তথ্য একত্র করলে তা গুটিকয় পৃষ্ঠার বেশি হবে না। সাইদুর রহমান, ভবতোষ দত্ত এই দুই গুণী শিক্ষকের স্মৃতিকথায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান নামক দীপ্ত তরুণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাই, সমসাময়িককালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নাজমুদ্দীন হাশেমের স্মৃতিভাষ্যে কিছু উল্লেখ মেলে। এস.এ করিম-এর পরিশ্রমী গ্রন্থ '*শেখ মুজিব : ট্রায়াম্প অ্যান্ড ট্রাজেডি*'-তেও বাল্য ও কলকাতা-জীবনের পরিচয় রয়েছে

যৎসামান্য। এর বাইরে যাঁরা সবিস্তার বলতে পারতেন সেই নূরুদ্দিন আহমদ কিংবা মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী কিছু লিখে গেছেন কিনা তা জানা যায় না।

নবীন যুবা শেখ মুজিব ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় পড়তে এলেন কলেজে তখন গৃহবন্দি সুভাষ বসু ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি এড়িয়ে আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে হাজির হয়েছেন জার্মানিতে। শেখ মুজিবের সঙ্গে সুভাষ বসুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অবকাশ ছিল না, তবে আজীবন মুজিব ছিলেন সুভাষ-অনুরাগী। এর এক অনুদ্ঘাটিত অধ্যায় মেলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ পুলিশ কর্মকর্তা অজয়কুমার দে ২০০০ সালে প্রকাশিত তাঁর '*ডাউন ফেডিং মেমোরি লেন*' গ্রন্থে। সন-তারিখ সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারেন নি অজয়কুমার দে, এসব তাঁর যৌবনের কথা যখন কনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি হাসপাতালে অসুস্থ রাজবন্দি সুভাষ বসুর প্রহরার তদারকি করছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সেটা হয়তো ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা, কিন্তু ঘটনার বিবরণে মনে হয় তা সম্ভবত ১৯৪০ সালের দ্বিতীয়ার্ধের কথা। কেননা সে-বছরের জুলাইতে সুভাষ বসু গ্রেপ্তার হন এবং অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে কিছুদিন থাকার পর তাঁকে এলগিন রোডের বাসায় অন্তরীণ করা হয়। অজয়কুমার দে লিখেছেন :

'আমার বিশেষ দায়িত্ব ছিল শ্রীবসুর সঙ্গে বহিরাগত কারও সাক্ষাৎ করতে না দেয়া। তাঁর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকার খবর স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রতিদিনই আমাকে এ-ধরনের সাক্ষাৎপ্রার্থীকে থামাতে হতো। একদিন সকাল দশটার দিকে একজন উঠতি বয়সের তরুণ শ্রীবসুর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদনপত্র পাঠায়। আমি হাসপাতালের বড় সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে তার সঙ্গে দেখা করি। তখন স্যার জন এন্ডারসন জরুরি ভবন নির্মিত হয় নি। আমি এসে দেখলাম সেই যুবকের বয়স ১৬/১৭ বছর হতে পারে। সে সাধারণ পাজামা ও শার্ট পরিহিত ছিল। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো তার নাম মুজিবর রহমান, একটি স্কুলে ক্লাস-II কিংবা I-এ পড়ে। তখনকার দিনে ক্লাস-I বলতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শেষ বছর ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে শ্রীবসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। সে বলল, শ্রী সুভাষ বসুর বীরত্বের সে একজন ভক্ত, অনুরাগী। যেহেতু এই মহান ভারতীয় নেতা মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করেন না, তাই সে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। কোনো গোপন সংগঠনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কিনা সেটা জানার জন্য মিনিট দশেক আমি তার সঙ্গে কথা বললাম। সন্তোষজনকভাবে আমি দেখলাম যে, সে উচ্চ আদর্শ পোষণকারী একজন উদীয়মান যুবক, যা সে-যুগের তরুণদের মধ্যে বিরল। লেখাপড়ায় আরো মনোযোগ দেয়ার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে আমি তাকে ফিরে যেতে বললাম, আমার শুভেচ্ছা নিয়ে সে চলে গেল।'

এই যুবকের কথা পুলিশ কর্মকর্তার মনে রয়েছে, কেননা এর কয়েক মাস পরে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের ঝাউতলা রোডের বাসায় প্রটেকশন ডিউটি করার সময় আবার তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার যুবকটি এসেছে নিজ এলাকার এক দরিদ্র হিন্দু বিধবা ও তাঁর পুত্রকে নিয়ে। তরুণের বন্ধু এই যুবাটির জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে। ফজলুল হকের সুপারিশে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে যুবকের কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। এরপরেও ঘটে আরেক সাক্ষাৎ, সুভাষ বসু তখন গৃহবন্দি, নজরদারি কিছুটা শিথিল। অজয়কুমার দে লিখেছেন : 'কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র বসুর ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িতে দর্শনার্থীদের শনাক্ত ও নজর রাখার কাজে আমাকে ডিউটি দেয়া হয়। সুভাষ বসু তখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখানেও শেখ মুজিবুর রহমান নামে যুবকের দেখা পেয়ে অবাক হলাম। যখন সে ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করে এলগিন রোড পোস্ট অফিস পর্যন্ত যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এবার শ্রীবসুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের কারণ কি? সে সহজভাবে বলল, সুভাষ বসুর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা।'

সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক, '*বিষাদবৃক্ষ*' ও '*সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম*' গ্রন্থের রচয়িতা মিহির সেনগুপ্ত আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কলকাতায় উদ্বাস্তু ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং জেনেছিলেন শেখ মুজিব এই মানুষটির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আমি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নাম কখনো শুনিনি মিহির সেনগুপ্ত জানিয়েছিলেন, তিনি গোপালগঞ্জের মানুষ, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন। পরে সন্ধান নিয়ে অল্প কিছু তথ্য জেনেছি– ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ছিলেন বাংলার রাজনীতিতে যাঁদের বলা হতো, 'স্বদেশী'। তিনি ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য এবং ১৯৪৯ সালে মূলনীতি নির্ধারণ বিষয়ক বিতর্কে ধর্ম ও রাজনীতির মিলন ও পৃথকীকরণের তাৎপর্য বিষয়ে যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা তাঁর পাণ্ডিত্য, যুক্তিবোধ ও মানবতাবাদী আদর্শের বড় পরিচয় মেলে ধরে। ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত তাঁর সুললিত ভাষণের পাঠ থেকে মানুষটি সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। পাকিস্তানে উদার যুক্তিবাদী আরও অনেক রাজনীতিবিদের মতো তিনিও বারবার কারারুদ্ধ হয়েছেন, ১৯৫৯ সালে এবডো জারি করে আইয়ুব খান যাঁদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তিনি দেশত্যাগ করেন এবং পরে কলকাতায় প্রয়াত হন। মিহির সেনগুপ্তের সূত্র অবলম্বন করে এখানেও আরও অনুসন্ধান দরকার।

বঙ্গবন্ধুর জীবনকে নিবিড়ভাবে জানা, নানা তথ্যের আহরণ ও যোগান দ্বারা তাঁর সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ছাড়া তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান আমরা জানাতে পারবো না। সেই কাজ এখনও আরব্ধ রয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমী

সেলিনা হোসেন

১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল বাঙালির জীবনে এক অসাধারণ উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী সময়। কারণ পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এই বছরের নভেম্বর মাসে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ। প্রাণ হারিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। নির্বাচন শেষ হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয় লাভ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালি কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় যাবে। বাঙালির উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। আত্মমর্যাদার বোধেও প্রদীপ্ত ছিল পূর্ববঙ্গের গণমানুষ।

সে সময়ে বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তিনি বিশেষভাবে অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা সাজিয়েছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই প্রথম তিনি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে বাংলা একাডেমীতে আসেন।

বঙ্গবন্ধুকে বাংলা একাডেমীতে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লেখেন : 'আমরা যখন এ

বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৯৭৪। উদ্বোধন-ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপবিষ্ট (ডান থেকে) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও প্রফেসর মযহারুল ইসলাম

অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করার অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যাই তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর মৃদু হাসি হেসে আমাকে বলেছিলেন, আমি কেন? আমি তো মাঠের মানুষ, পড়ালেখা জানি না, আপনারা কোনো পণ্ডিত বা সাহিত্যিককে দিয়ে উদ্বোধন করান, তাই যথার্থ হবে। কিন্তু আমরা যখন কেন তিনি সে সম্পর্কে আমাদের যুক্তির কথা বললাম তখন তিনি আবারও একই রকম মৃদু হাসি হাসলেন, তবে এবারে আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তার স্বভাবজ প্রেরণাদায়ক ভঙ্গিতে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ মানুষের পাশে এসে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি পর্ব ছিল একাডেমী পরিচালিত বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ অবাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রধান অতিথি ও ২১ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সনদপত্র বিতরণ।[১]

মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন : 'আজ বিকেল ৪টায় বাংলা একাডেমীর শহীদ স্মরণ সপ্তাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। শেখ মুজিবর রহমান প্রধান অতিথি। উনি বাঙালি সংস্কৃতির কথা বললেন।'[২]

বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সাধক লেখকদের তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি সংস্কৃতির যে নিজস্ব শেকড় সেটা অনুধাবনের তাৎপর্যও তিনি বলতে ভোলেন নি। এখানেই তাঁর বাংলা একাডেমীর গৌরবের জায়গা দেখিয়ে দেয়ার প্রজ্ঞা। তিনি জানতেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান দিক।

খ

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতন স্বচ্ছতা ছিল নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ষাটের দশকে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। সে সময় দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন । পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ আদেশ প্রত্যাহার করতে। যখন দেশে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ার। ধ্বসে পড়েছে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পরিচালিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। জেলখানা থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দেয়া বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপীয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না– আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হবেই'। এভাবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিসত্তার মননে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির অনিবার্য দিকটিকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির যোগসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এই সত্যের মধ্যেই বাংলা একাডেমীর যথার্থতা নিহিত। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী। জাতির সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত হয় এই প্রতিষ্ঠানে। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশে এমন আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, যেখানে জাতির মগ্ন-চৈতন্যে তার সাংস্কৃতিক বোধ প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানে এসে এই সত্যকে আরও দৃঢ় করেছিলেন। তাই পাকিস্তান সরকারের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল বাংলা একাডেমীর বর্ধমান ভবন। এর দ্বারা বোঝা যায় একটি ভবন কীভাবে জাতিসত্তার প্রতীকে উত্তীর্ণ হয়। বাংলা একাডেমী শুধু ইটকাঠের দালান হয়ে থাকে না। তাই পঁচিশের কালো রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কামান দেগে ভেঙে দেয় বর্ধমান ভবনের দেয়াল। ওই রাতেই শুরু হয় বাঙালির মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভাষা-শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী যেকোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় এটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণে অনুষ্ঠানের বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

গ

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সে সময়ে বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন গবেষক, ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকসহ তাঁরা কয়েকজন '৭৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন : বঙ্গবন্ধু বসলেন, প্রফেসর ইসলাম এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, 'বলুন প্রফেসর কি মনে করে এসেছেন'। ড. ইসলাম বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, আমরা বাংলা একাডেমী থেকে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি, বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা আসবেন। আপনাকে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে পেতে চাই।' তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর প্রত্যুত্তর : 'আমি সাহিত্যের কি বুঝি? আমি কি বলবো! একজন প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বা পণ্ডিতকে দিয়ে এ কাজ করান– সম্মেলনের মর্যাদা বাড়বে। আগে তো তাই হতো। ছাত্রজীবনে দু'একবার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কই, রাজনৈতিক নেতারা তাঁর উদ্বোধন করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।'এই বলে তিনি হাসলেন। পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য বললেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, ভালোবাসি

তাঁকে– সাহিত্যে আমার পুঁজি তো ওইটুকুই। এই পুঁজি নিয়ে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যেতে আমি সংকোচ বোধ করছি।' তাঁকে বলা হলো, এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সম্মেলন। এর একটা ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। আপনি সম্মেলন উদ্বোধন করলে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে আপনার ও আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটবে। তিনি একটু ভাবলেন, বললেন, ঠিক আছে, যাবো। আমার বন্ধু জসীমউদদীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেও বিশেষ মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাবেন। [৩]

আবারও দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গকে কতখানি সম্মানের সঙ্গে দেখতেন। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করলে মানসম্পন্ন হবে সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন গভীর বিবেচনার মানুষ।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন : 'মযহারুল ইসলামের সময়ে বাংলা একাডেমীর উদ্‌যোগে বড় রকমের এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এটি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিখ্যাত লেখক এতে যোগ দেন। আমি একটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি।[৪] কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন লিখেছেন : 'চুয়াত্তরের প্রথম দিন দর্শকের সংখ্যা উপচে পড়ছিল মাঠে। মঞ্চ তৈরি হয়েছে নতুন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসেছেন। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন পশ্চিম বাংলার লেখক ও পণ্ডিতরা।' [৫]

সাহিত্য সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ার আলিমঝানভ ও মরিয়ম সালগানিক এবং আরও কয়েকজন। পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছিলেন সাহিত্যিক হ্যাসো গ্রাবনার। মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক মি.পি. হাসবাতার। ভারত থেকে এসেছিলেন হিন্দি লেখক মূলকরাজ আনন্দ, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়, লোকসাহিত্যবিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়সহ অনেক লেখক।

বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে দেশের লেখকদের বিদেশি লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা থেকেই বঙ্গবন্ধু শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক প্রমুখদের সামনে এনেছিলেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনাকেও তিনি গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন সভাপতি হিসেবে কবি জসীমউদ্‌দীন, ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ লেখকরা মুখর করে তুলেছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ।

ঘ

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভাষা-শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী যেকোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় এটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণে অনুষ্ঠানের বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

তিনি মাত্র দু'টো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। একটি স্বাধীনতার বছরের সময় একুশের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির পরিচয়টিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন জনজীবনের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে এক করে। লেখকদের সেই জীবনের রূপকার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি এলেন একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে। সাহিত্য জাতির জীবন-পরিচর্যার সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত করে। সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করলে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র্য-পীড়িত ছোট দেশকে দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-খেলাধুলা ইত্যাদি। এসব মাধ্যমই দেশের সৃজনশীলতার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। বাংলা একাডেমী দেশের সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

এভাবে সুদূরপ্রসারী জ্ঞানচিন্তায় বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমীর ভূমিকা কি হবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। সামগ্রিক অর্থে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা একাডেমী কীভাবে জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক হবে।

তথ্যনির্দেশ

১.নাই বা হলো পারে যাওয়া : কবীর চৌধুরী, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃ: ১৫১।

২.একাত্তরের ডায়েরী– মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রকাশক : আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫, পৃ : ১৭।

৩.বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ– শামসুজ্জামান খান এবং প্রাসঙ্গিক কথকতা; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ: ৫২।

৪.'বাংলা একাডেমী : আমার সংশ্রব'– আনিসুজ্জামান
বাংলা একাডেমী স্মারক গ্রন্থ : চল্লিশ বর্ষপূর্তি– নির্বাহী সম্পাদক সুব্রত বড়ুয়া, সহযোগী সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ: ১০২।

৫.স্মৃতির বাংলা একাডেমী– রাবেয়া খাতুন, বাংলা একাডেমী স্মারক গ্রন্থ : চল্লিশ বর্ষপূর্তি
নির্বাহী সম্পাদক সুব্রত বড়ুয়া, সহযোগী সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ: ১২১।

পুনর্মুদ্রণ

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে লেখা প্রথম গল্প

মৃতের আত্মহত্যা

আবুল ফজল

সোহেলি কি স্বপ্ন দেখছে?

সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হয় তার কাছে। যদিও সে দাঁড়িয়ে আছে স্বল্প পরিসর এক জানালার কাছে, তার দুই আয়ত চক্ষু তাকিয়ে আছে দিগন্তের পানে। শুধু তাকিয়েই আছে, দেখছে না কিছুই।

ধূ ধূ বালি ছাড়া কীই বা আছে দেখার এখানে– না একটা গাছপালা, না সবুজের

কোনো নিশান!

জানালায় মুখ রেখে নিঃশ্বাস নিতে গেলেই নাকে ঢোকে তপ্ত হাওয়া। সে সঙ্গে কিছু তপ্ততর বালিও। এরি নাম কি মরুভূমি? কেন সে এখানে? এ প্রশ্ন তাকে অহরহ ক্ষত-বিক্ষত করে। ভেতরের এক আবছা অন্ধকার কক্ষে কম্বলের এক শক্ত বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে বকুল, তার তিন বছরের শিশু। তার প্রথম সন্তান। ফুলের মধ্যে বকুল তার সবচাইতে প্রিয়, কিশোরী বয়স থেকে, যখন থেকে খোঁপা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন থেকে খোঁপায় এক আধটা বকুল গুঁজে দেয়া তার প্রায় অভ্যাসে পরিণত। স্কুলে যেতে, স্কুল পেরিয়ে কলেজে যেতেও সে তাই করত।

স্বামী চেয়েছিল গালভরা জবরজং একটা নাম দিতে– সিকান্দার কি আলমগীর এমনি। দিগ্বিজয়ীদের কারো নামে নাম। সালাহুদ্দীন বাবর এ নামের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেছিল। সোহেলি রাজি হয় নি– আমার ছেলে ফুলের মতো ফুটে উঠবে, চারদিকে ছড়াবে খোশবু এ আমার আরজু। বলতে বলতে ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, মাতৃত্বের পুলকে ও গর্বে।

: বকুল নামটা বড্ড মেয়েলি, মেয়ে হলে মানাতো।– স্বামীর মন্তব্য।

: না, আমি ওকে বকুল বলেই ডাকব। পরে আরও তো আসবে, সেগুলোর নাম তুমি তোমার পছন্দ মতো রেখ। এখানেই তো শেষ নয়। মুখটা তার লাল হয়ে উঠল, লজ্জায় ঘাড় ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সেই থেকে ওর নাম বকুল হয়ে গেছে। বকুল ঘুমুচ্ছে অঘোরে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার সুকোমল বুক, পেট ওঠানামা করছে। সোহেলি জানালা থেকে ফিরে এসে ঘুমন্ত শিশুর পুষ্পকোমল মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। ছেলে হলেও যেন মায়ের মুখের আদল পেয়েছে। কোথায় যেন ওর ছোট ভাই খোকনের সঙ্গেও খানিকটা মিল রয়েছে। ঘুমন্ত ছেলের একটা হাত তুলে নিয়ে আলতোভাবে তাতে চুমো খেল সোহেলি। ভেতরের অস্থিরতা কিছুটা যেন শান্ত হয়ে এল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে, যে মুখ দেখে তার কখনো তৃপ্তি হয় না।

এখানে আসার পর যে ভাবনা তাকে প্রতি মুহূর্তে অস্থির করে তোলে, সে ভাবনাটাই ফের এল : বড়ো হলে বকুল কি সেপাই হবে? খুদে হাতটার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে : এ হাত কি বন্দুক ধরবে, মানুষ মারবে? সোহেলির ভেতরটা কেঁপে ওঠে, ডুকরে ওঠে– না, না, না। চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরতে থাকে সোহেলির। শিশুর হাতটা তুলে নিয়ে তাতে আর একবার চুমো খেল, তারপর একটা পাতলা চাদর বকুলের গায়ের ওপর বিছিয়ে দিল।

দরজায় একটা শব্দ যেন হলো। আঁতকে উঠল সোহেলি। সামান্য শব্দেও আজকাল আঁতকে ওঠে, এক অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা কেঁপে ওঠে। দরজায় ধাক্কা পড়ল কয়েকবার। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল রগড়ে রগড়ে। মাপা পানি দিয়ে কাজ চালাতে হয় এখানে। পানির দেশের মেয়ে সে। ওদের দেশের বাড়িতে ভেতরে-বাইরে পুকুর, বিয়ের আগে সাঁতার কেটে গোসল না করলে ওর তো গোসলই হতো না। ছোট ভাবি তো কোনোদিনই পারে নি সাঁতারে ওকে হারাতে। এমনকি খোকনকেও কতদিন হারিয়ে দিয়েছে সে। খোকনের পৌরুষে লাগত, বার বার চ্যালেঞ্জ করে বসতো, ছোট বু আর একবার... । সোহেলির চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছায়াঘেরা শান্ত শীতল তাদের অন্দর বাড়ির পুকুর, তার চারপাড়ের গাছপালা, ঘাট– যে ঘাটের সবচেয়ে নিচের ধাপে বসে শুভ্র পা দুখানি ডুবিয়ে সে আঁচলের মাথায় সাবান লাগিয়ে গা ডলত।

এ তার এক সুখ-স্বপ্ন, যে স্বপ্নে বাধা পেয়ে সে একটু বিরক্ত হলো বই কি। তবুও যেতে হলো দরজার দিকে। দরজা খুলতেই ঢুকলো আফরোজা, তার স্বামীর সহকর্মী মেজর রকিবের স্ত্রী। সেও বাংলাদেশের মেয়ে, তবে সোহেলির মতো অত ভেঙে পড়ে নি। এ মরুদেশে এক রকম করে সে মানিয়ে নিয়েছে। সবই আল্লার মর্জি– এতে সান্ত্বনা খোঁজে, হয়ত সান্ত্বনা পায়ও আফরোজা, এ বাক্য সময়ে-অসময়ে উচ্চারণ করে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আফরোজা বলে উঠল : সোহেলি, তুমি আজও কাঁদছিলে? কেন কেঁদে কেঁদে জীবনটা শেষ করে দিচ্ছ ভাই? ডান হাত ওপরের দিকে তুলে বলল : সবই ওপরওয়ালার মর্জি। তা না হলে আমরা কেন আজ এখানে।

: আফরোজা আপা, কান্না ছাড়া আমার জীবনে আর কি আছে, আমি তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ একা থাকি, কান্নার সুযোগ পাই, তখনই শুধু মনে হয় বেঁচে আছি। তারপর মনে হয় আমি যেন মরা। দেহটা নড়াচড়া করে বটে কিন্তু আমি তো মৃত। আপা, মরা মানুষ কি খাওয়া-দাওয়া করে? আমি যা হোক কিছু না কিছু পেটে দিচ্ছি। এর মানে কি বেঁচে থাকা?

মুহূর্তে আনমনা হয়ে যায় সোহেলি।

: আমার এতসব আবেগ-অনুভূতি কোথায় গেল আজ! তুমি তো জানো না আপা, কলেজে থাকতে আমি কবিতাও লিখতাম। একটা খাতা প্রায় ভরে উঠেছিল। বিয়ের পর বকুল তখন পেটে এসেছে। নতুন অনুভূতি আমাকে যেন আবার নতুন করে নাড়া দিল, মনে মনে গুনগুন করে উঠল কবিতার দু'একটা কলি। খাতাটা বের করে চাইলাম কিছু লিখতে, নতুন মাতৃত্বের একটা অনুভূতি চাইল ভাষা পেতে। অজানা আনন্দের এক ফলগুস্রোত, অপূর্ব এক পুলক, যা অনির্বচনীয়, অথচ প্রতি মুহূর্তে শিরায় শিরায় আলোচিত। কবিতা ছাড়া যা প্রকাশ করা যায় না।

হঠাৎ মচ মচ করে তিনি এসে ঢুকলেন। সৈনিকের বুটের মচ

মচ বুঝতে পারো। মুহূর্তেই কবিতার অপমৃত্যু। তাঁর হাতে এলএমজি আর আমার হাতে তখনো কলম। আমার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে সে কঠোর কণ্ঠে বলল : কি হচ্ছে? প্রেমপত্র লেখা হচ্ছে বুঝি? আমার হাতের কলম পড়ে গেল। সামলাতে পারলাম না, বললাম : বিয়ের পর প্রেম থাকে নাকি শুনি? না নতুন করে আসে? সন্তান পেটে মেয়েরা প্রেম করে না। তোমার মনে এতই যখন সন্দেহ, বিয়ে করতে গেলে কেন? আমার মা-বাবা সেধে তো বিয়ে দেন নি।
আমার কণ্ঠস্বর হয়ত ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছিল সেদিন। কথাগুলোও হয়ে উঠেছিল ধারালো। ভেতরের উত্তেজনা সামলাতে না পেরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়ে ওর চোখের ওপর চোখ রাখলাম। চোখ দুটো আমার হয়ত লাল হয়ে উঠেছিল, হয়ত উঠেছিল জ্বলে।

: কী, এত বড়ো সাহস ?– বলে হাতের এলএমজিটা সজোরে দোলালো একবার। তারপর টেবিলের ওপর থেকে খাতাটা তুলে নিয়ে ফাৎ ফাৎ করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। আমার কবিতার মৃত্যু ঘটলো, এভাবে সেই থেকে সীতা আমার চিরনির্বাসিতা। আপা, সেদিন থেকে আর কোনোদিন খাতা-কলম নিয়ে বসি নি। অলক্ষ্যে মনে মনে কি যে এক বেদনা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি তা আর কেউ বুঝবে না। তারপর এসব ঘটনা। একটু সময়ের জন্যে কেমন আনমনা হয়ে যায় সোহেলি। তারপর বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে–

: আফরোজা আপা, এ কি সৈনিক জীবনের লক্ষ্য ? এরি নাম কি বীরত্ব ? কেন আমাদের আজ এ দশা? কেন আজ আমরা এখানে ? ধূ ধূ মরুভূমির সঙ্গে আমাদের কীই বা সম্পর্ক ? সোহেলি ফের আনমনা হয়ে পড়ল বুঝি। স্বগতই যেন বলতে লাগল–

: কোথায় সবুজ গাছপালা, ছায়াঘেরা আমাদের পুকুরে যেখানে সাঁতার কেটে গোসল করতাম প্রতিদিন? সেসব কেড়ে নিল আমার জীবন থেকে ?

আফরোজার চোখের সামনেও কি ভেসে উঠল বাংলাদেশ, কিশোরগঞ্জের এক অখ্যাত পাড়াগাঁ, মাথা পেরিয়ে ওঠা ঘন পাটের সবুজ-খেলা? সবুজের অপরূপ নয়ন জুড়ানো সমারোহ দেখতে দেখতে ছুটি শেষে ভরা নদীপথে নৌকায় চড়ে শহরের হোস্টেলের পথে পাড়ি জমানো। ছায়াছবির মতো এ রকম কত ছবি তার মনে ভেসে ওঠে। আফরোজাকেও কি স্বপ্নে পেয়ে বসল? সেও হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে সোহেলিকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই বলে চলল : সোহেলি, বোন, কে কেড়ে নিলে আমাদের জগৎ, আমাদের জীবনের সবুজ শ্যামলিমা, আমাদের নদ-নদী, পাল-তোলা নৌকা, খেয়া পারাপারের আনন্দমুখর সকাল-সাঁঝ? আর কি ফিরে পাব সে দুনিয়া? কেন হলাম না এক গরিব স্কুল মাস্টারের বৌ? তা হলে তো প্রতিদিন শুনতে পেতাম বাংলাভাষার কলকণ্ঠ, দেখতে পেতাম চিরচেনা সবুজের মেরা। সোহেলি, যখন পাড়ার স্কুলে পড়তাম, বাড়ি থেকে আল বেয়ে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় পাটগাছ আর সবুজ পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলা আমার এক অভ্যাস ছিল। শুকে দেখলে এখনও যেন আমি আমার হাতে পাটের গন্ধ পাই। কতদিন কচি পাটপাতার শাক খাই নি। জিভে যেন এখনো লেগে আছে।– স্বপ্ন দেখতে দেখতে আফরোজাও যেন আনমনা হয়ে যায়।

দুজনের বুকে বুক লাগিয়ে কান্না যেন কিছুতেই থামতে চায় না। উভয়ের সশব্দ ফোঁপানিতে বকুলের ঘুম গেল ভেঙে। ডেকে উঠল 'মা' বলে।

আফরোজার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোহেলি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ছুটে এল বকুলের কাছে। অশ্রুভেজা মুখে হেসে ওকে তুলে নিয়ে বলল : দুধ খাবে?

বকুল কিছুটা হতভম্ব। বললো : না।

: কেন, ক্ষিধে পায় নি, এখন তো তোমার দুধ খাওয়ার সময় বাবা।

বকুল ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল মা আর আফরোজা খালার দিকে। আফরোজার নিজেকেও স্বাভাবিক করার প্রয়োজন রয়েছে। বলল : এখন যাই, ওবেলা না হয় আর একবার আসব।

য়ূনুস, মেজর য়ূনুস, সে নাকি কোনো এক যুদ্ধে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তাই সুজাতে হিম্মত বা ঐ ধরনের কি একটা উপাধি বা পদকও সে পেয়েছে, তার ইউনিফর্মে ঐ পদকচিহ্ন আঁটা। য়ূনুস সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, না হয় ঘরে বসে ভাবতে থাকে। কাজ-কর্ম নেই, যে সরকারকে তারা গদিতে বসিয়েছে, সে সরকারই তাদের মাসোয়ারা দেয়, তাতেই চলে খাওয়া-পরা।

মুশকিল হলো সোহেলির। স্বামী যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সে যেন মরা, মুহূর্তে নিষ্প্রাণ এক মৃতদেহ। স্বামীর কথার উত্তরে হ্যাঁ, না বা এক শব্দে যেটুকু উত্তর দেয়া সম্ভব সেটুকুই শুধু দেয়। য়ূনুস বিরক্ত হয়ে কোনো কোনো দিন বলে : এমন বেজার হয়ে থাকলে চলে কি করে, তোমার মুখে এখানে আসার পর একবারও হাসি দেখলাম না। কেন, কি হয়েছে। দেশে থাকতে বন্ধুরা ঈর্ষা করে বলত তোমার মুখের হাসি নাকি তুলনাহীন। একবার হাসো না লক্ষ্মী তোমার হাসিমুখ দেখি নি কতদিন।

দীর্ঘদিন এ মিনতির সুর য়ূনুসের কণ্ঠে শোনা যায় নি।

: তুমি ভালো করেই জানো আমার মুখের হাসিই শুধু নয় আমার সারা দেহের হাসি আজ নিহত। আর সে হাসিকে চিরদিনের জন্য হত্যা করেছে তা তোমার অজানা নয়। আমাকে আর যাই বলো হাসতে বলো না।

: কেন? কেন? কে আবার তোমার হাসিকে হত্যা করল? বলো কে সে?

য়ূনুস এক কোণে রাখা এল এমজির দিকে একবার ফিরে তাকাল।

: বলতে হবে কেন? তুমি ভালো করেই জানো। তোমার কি মন বলে কিছু নেই? নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না– উত্তর সেখানেই লুকিয়ে আছে। সে উত্তরকে বেশি দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। যাবেও না।

ইঙ্গিতটা না বুঝতে পারার কথা নয়।

: দেখ দেশ, রাষ্ট্র জাতি অনেক বড়ো। তোমরা মেয়েরা হয়ত এসব কথা বুঝবে না, তার জন্য বহু রক্তপাত করতে হয়, মহৎ উদ্দেশ্যে এ রক্তপাত প্রয়োজন, প্রয়োজন ছিল, হয়ত আরও প্রয়োজন হবে।

আরও! বলো কি! দেশমাতার রক্ত পিপাসা এখনো মেটেনি? দশ বছরের বাচ্চার রক্ত পান করেও ?

আনমনা হয়ে যায় সোহেলি। মুহূর্তকাল পর আবার বলে,

: দেখ আমি মা হয়েছি, প্রাণের মূল্য আমি বুঝি, আমাদের দেহ বিদীর্ণ করেই শিশুর জন্ম হয়, সে শিশুই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে মানুষ।

সোহেলি যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কেটে যায় আনমনা ভাব।

: য়ূনুস, তুমি কাটখোট্টা সেপাই, তবু মানুষ তো। একদিন বর সেজে আমাদের বাড়ি এসেছিলে, অন্তত সেদিন তো মানুষ ছিলে। সেদিন যখন আমার আব্বা-আম্মা আমার মেহেদি-রাঙা হাত দুখানা তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তখন তোমার কেমন লেগেছিল, বলতে পারব না, কিন্তু আমার সারা শরীর এক অনির্বচনীয় আনন্দে, আবেশে, পুলকে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আমার চোখে পুলকাশ্রু আর সারা মুখে আনন্দের রক্তিমাভা দেখে আম্মা কী খুশিই না হয়েছিলেন।

: সোহেলি, তোমার মতো কবিত্ব করে আমি হয়ত বলতে পারব না, তোমার মেহেদি রাঙা হাত দুখানা নিয়ে আমারও আনন্দের সীমা ছিল না। আম্মা-আব্বা আর সবাই যদি চারদিকে ঘিরে না থাকত চুমোয় চুমোয় আমি তোমার হাত দুখানা ভরে দিতাম সেদিন।

: য়ূনুস সাহেব, এসবের কি কোন তুলনা আছে?

: তুমি আজ হঠাৎ আমাকে সাহেব বলছ যে?

: সবাই তো বলে তুমি আমার সাহেব। চাকর-বাকরেরা তো বলেই।

এমন কি বান্ধবীরাও মাঝে মাঝে বলে থাকে তুমি আমার সাহেব। সাহেব মানে তো মালিক, তুমি আমার দেহটার মালিক তো বটেই। বকুল না থাকলে এ দেহ বহন করার যন্ত্রণা থেকে আমি রেহাই পেতে চাইতাম। তোমার এলএমজি'র সামনে বুক পেতে দিয়ে বলতাম– তোমার কলেমা পড়ে পাওয়া দেহটার সবটাই তুমি নাও– আমার প্রাণ উড়ে যাক আমার শ্যামল মায়ের কোমল বুকে, আমাদের ছায়া ঢাকা পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে, যেখানে আমি ঘন্টার পর ঘুঘুরে ঘন্টা বসে হাঁসের ডুব-সাঁতার দেখতাম, শুনতাম কোকিলের ডাক। কতদিন পাশের বাড়ির সখিনা চুপিচুপি এসে পেছন থেকে দুহাতে আমার চোখ দুটো চেপে ধরত। বলতাম, সখি, ছাড়ো... হাত ছেড়ে ও খিলখিল করে হেসে বলত? তুমি ধ্যান করলে কি হবে মেজর সাহেব হয়ত বন্দুক সাফ করতেই মশগুল। তখন তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল মাত্র।

সোহেলির বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

: আমার প্রাণটা আমার সেই ফেলে আসা ভূস্বর্গে ফিরে যাওয়ার জন্যে অহরহ নীরবে কাঁদছে, তুমি কি তা বুঝতে পারো না?

: তুমি বুঝতে পারছ না আমরা দেশের কত বড়ো উপকার করেছি। একদিনেই চালের দাম আট টাকা থেকে চার টাকায় নেমে এসেছে, জানো?

: চালের দাম কমাবার কি আর কোনো উপায় ছিল না? – সোহেলির ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি। তার জন্য বালক আর নববধূর রক্তের দরকার ছিল বুঝি? বাংলাদেশ রক্তঝরা লকলকে জিভওয়ালী ক্ষুধিতা কালী হয়ে উঠেছিল বুঝি সেদিন? দুখানা, না চারখানা মেহেদি- রাঙা হাত কি তোমাদের পথে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারত? সেই ভয়াবহ রাতে তারা কি তাদের নবীন স্বামীদের বুকে নিশ্চিত নির্ভাবনায় মাথা রেখে ঘুমায় নি মেহেদি রাঙা হাত দুখানা দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে?

: এসব চিন্তা করে তুমি কেন খামাখা মন খারাপ করছ? –সজোরে সিগারেটে একটা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মেজর য়ূনুস বিরক্তির সাথে বলল।

: আমি মানুষ আমার মন আছে বলেই আমার মন খারাপ হয়।

: তোমরা মেয়েরা বুঝতে পারবে না দেশ কত বড়ো।

: দেশ, জাতি, রাষ্ট্র অনেক বড়ো মানি, কিন্তু প্রাণ, মানুষের প্রাণ এসবের চেয়ে অনেক বড়ো, প্রাণের মূল্য অনেক বেশি, অনেক ওপরে।

ইসলামেই তো বলেছে যে, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র এ সবই তো মানুষের বানানো জিনিস।

থেমে একটু কি যেন চিন্তা করে বলল : আচ্ছা, বকুলের গালে কেউ যদি অকারণে একটা চড় মারে তুমি কি তা সহ্য করবে?

বকুলেরও তো একদিন দশ বছর বয়স হবে। তোমার কোনো বন্ধু, বা অধঃস্তনদের কারো মাথায় যদি ঢোকে তোমাকে এবং সে সঙ্গে আমাকে আর বকুলকেও হত্যা করা হলে দেশ বিপদমুক্ত হবে, দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, চালের দাম দুটাকায় নেমে আসবে, তখন কি দশা হবে, তুমি দেশের খাতিরে এ যুক্তি মেনে নেবে?

য়ূনুস চুপ।

সোহেলি বলল : আমি বীরাঙ্গনা হতে চাই না, চাই না বকুলকেও বীর কিম্বা সিপাই বানাতে। –কথার জের ধরেই বলে চলে সোহেলি : আচ্ছা তুমি যেখানে ইচ্ছে থাক বা যাও আমাদের আপত্তি নেই, আমাকে আর বকুলকে কি কোনো প্রকারে দেশে পাঠিয়ে দিতে পার না? তোমার পায়ে পড়ে বলছি এটুকু অনুগ্রহ আমাদের করো।

সত্য সত্যই এই প্রথমবারের মতো সোহেলি য়ূনুসের পা দুখানি জড়িয়ে ধরল।

য়ূনুস ওকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর দুই গালে আর ঠোঁটে অজস্র চুমো খেল। কিন্তু সোহেলির দেহ অসাড়, যেন প্রাণহীন এক কাষ্ঠপুত্তলিকা, তাতে না আছে কোনো সাড়া, না আছে এতটুকুন উত্তাপ কি উত্তেজনা, কি একটুখানি আবেগের ছোঁয়া। এ যেন এক মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে, মৃতের মুখে চুমো খাওয়া।

য়ূনুসের বাহু আলগা হলে সোহেলি আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুমে ঢুকে রগড়ে রগড়ে মুখ হাত-ঠোঁট ধুয়ে নিল। ফিরে এসে বলল : হলো তো, এখন পাঠিয়ে দেবে তো আমাদের?

: দেখি। –উদাস ও নিরুত্তাপ গলায় একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে য়ূনুস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে তার সহকর্মীরা থাকে, ওখানে গিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবে।

বিকেলে আবার আফরোজা এল ।

সোহেলি নিজেই মনে করে সে এখন মৃত। লজ্জা-শরমের কোনো অনুভূতিই যেন আর নেই তার মনে। তাই আফরোজাকে সব খুলে বলল : ও আজ আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব চুমো খেয়েছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। জানো, একদিন চুমো নিয়েও আমি কবিতা লিখেছিলাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। প্রিয়জনের চুম্বনের সেই অনির্বচনীয় পুলক, সর্বদেহে যা একদিন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করত, তা আজ কোথায় হারিয়ে গেল। কি এক অসম্ভব পরিবর্তন, এখন ওর স্পর্শে আমার সারা শরীর রি রি করে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়ার পর মনে হলো আমি আবার পাক-সাফ হলাম।

আফরোজা বলল : আমাকে যখন ও ধরতে আসে আমি বলে ফেলি, দেখি তোমার হাতটা। ও বাড়িয়ে দিয়ে বলে : দেখ। মনে হয় তার হাতে এখনো রক্ত লেগে আছে। শুকলেই যেন রক্তের গন্ধ পাই। হয়ত আমার মনের ভুল। এতদিন তো রক্তের গন্ধ থাকার কথা নয়।

সামলে নিয়ে আফরোজা আবার বলল : কিন্তু উপায় নেই বোন, আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছি। ঘৃণায় মন রি রি করে উঠলেও ওর হাতে ধরা দিতে হয়। দেশে হলে কবেই আমি পালিয়ে যেতাম, নয়ত গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ডুবে মরতাম। এ পোড়া দেশে একটা পুকুরও যদি থাকত। এমন জীবন নিয়ে কদিন বাঁচা যায়।

আফরোজাও ফিরে যায় পেছনের দিকে। নির্বাসিত জীবনে এ হয়ত হয়েই থাকে।

: মামাতো ভাই সেলিম আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। উভয়ের মধ্যে পূর্ব রাগের প্রকাশ ঘটেছিল, তেমন কিছু চিঠি চালাচালিও হয়েছিল! মা-বাবা রাজি হলেন না– সেলিম তখনো বেকার। চিঠির খবর পেয়ে, তাড়াতাড়ি ভাইদের পরিচিত এক লেফটেনেন্টের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। এভাবে আমাদের মেয়েদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় জীবনে। আল্লার মর্জি ভাই, কি করব, মেনে নিতে হয় নিজের অদৃষ্টকে।

ওর কণ্ঠে এবার হতাশা।

: আপা, খুনির বৌ বলে চিহ্নিত হয়ে রইলাম, থাকব চিরকাল। এ অবস্থা কি করে মেনে নিই? তোমার অদৃষ্ট আমাদের প্রতি এমন বেরহম হওয়ার কোনো মানে হয়? বিয়ের আগে মা-বাবা তো একবেলাও নামাজ বাদ দিতে দেন নি আমাকে। তার কি এ নতিজা?

উদাস কণ্ঠেই সে বলে চলে : খুনির বৌ, বকুল খুনির সন্তান। এ পরিচয় কি করে আমি বহন করব? বড়ো হলে সেও বা কি করে বইবে এ বোঝা? আফরোজা আপা, আত্মহত্যা করে আমি এ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই।

: আত্মহত্যা আরও বড়ো গুনাহ, ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ।

: এ দুই গুনাহর মাঝখানে আমরা কি চিরকাল নিষ্পেষিত হতে থাকব? তা হয় না আপা।

: না, না, সোহেলি, এমন কাজটি করো না বোন।

একটু থেমে বিষণ্ণ কণ্ঠে আবার বলে আফরোজা : এখন যাই, গিয়ে আবার রান্না চড়াতে হবে। রুটি বেলতে হবে। এখানে সবই তো নিজেকে করতে হচ্ছে। রাতেই অবস্থা সবচেয়ে অসহ্য হয়। য়ূনুসের স্পর্শে সোহেলির সর্ব শরীর কুকড়ে যায়। কোনো সাড়াই যেন থাকে না দেহে। তবুও মরার মতো পড়ে থেকে সয়ে যেতে হয় সব অত্যাচার।

: আগের মত আমাকে জড়িয়ে ধরো না কেন?– য়ূনুস উষ্মার সঙ্গে বলে।

সোহেলি কোনো উত্তর দেয় না। অস্থির য়ূনুস নিজেই ওর হাত দুখানা টেনে নিয়ে ওর পিঠের ওপর রাখে, নিঃসাড় হাত দুখানা ঢলে পড়ে যায় দু'পাশে যেন মরা মানুষের হাত। সোহেলির শরীরে এতটুকু সাড়া জাগে না। বাধা দেওয়ার উপায় নেই, এ দূর দেশে সে যেন এক অসহায় বন্দি।

কোনো কোনো দিন সোহেলি বকুলকে মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু য়ূনুসের যখন ঝোঁক চাপে তখন বকুলকে তুলে সে তার ওপাশে শুইয়ে দেয়। ঘুমন্ত শিশু কিছুই বুঝতে পারে না।

সোহেলির ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেহমনের সাড়ার কোনো তোয়াক্কা নেই ওর, চড়াও হয়ে পড়ে, অসাড় সোহেলি কলাগাছের মতো শীতল দেহে পড়ে থাকে, তার ওপর চলে বীরের অত্যাচার।

এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বছর দুই কেটে যায়।

একদিন সোহেলি মুখে হাসি টেনে এনে বলল : বকুলকে তো এখন কোনো নার্সারি বা শিশুদের স্কুলে দেওয়া দরকার। তাই ওকে দেশে পাঠাবার প্রয়োজন। এখানে এভাবে থেকে গেলে ও একটা অকাট মূর্খই থেকে যাবে।

: সে তো অনেক খরচের মামলা।

বড়ো ভাই তো রিয়াদে চাকরি নিয়ে এসেছেন। ওকে বললে খরচ আর পাঠাবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। আব্বা নাকি এবার হজে আসছেন, তার সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

: তখন আমাদের জীবনটা তো একদম ফাঁকা হয়ে যাবে।

: কেন, আর একটা যে আসছে! তখন ওকে নিয়েই তো আমাকে বিব্রত থাকতে হবে সবসময়।

প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি আপন নিয়মে করে যায়। সেখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই।

সোহেলি যেদিন টের পেয়েছে সেদিন থেকে তার নিজের প্রতি ঘৃণা আরও বেড়ে গেছে। বকুল যখন এসেছিল তখন য়ূনুস অন্য মানুষ– খুনের দাগ লাগে নি তার হাতে। তখন সে একটা খুনির সন্তানকে কি করে পেটে ধরবে, কি করে বহন করবে, কি করে করবে প্রসব ? এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে তার কাছে অসহ্য, দুর্বহ হয়ে উঠেছে জীবন। দেশে ফেরার সুযোগ এলেও সে দেশে ফিরবে কোন মুখে? আঙুল উঁচিয়ে কেউ যদি বলে খুনির বৌ, খুনির ছেলের মা!

বকুলকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা সহজেই হয়ে গেল। সোহেলির বড়ো ভাই আদিল হজের কয়েকদিন আগে এসে বকুলকে নিয়ে গেল সেখান থেকে, হজ শেষে নানা নাতিকে সঙ্গে বকুল দেশে ফিরবে।

হজ শেষে মোশারফ সাহেব নাতিকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

ছেলের নিরাপদে দেশে ফেরার খবর পাওয়ার পর, সোহেলি মনে মনে যা ভাবছিল, সেটাই এখন সংকল্প হয়ে দেখা দিল– দোজখে যেতে হলেও ওকে তা করতেই হবে। এখন যে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে তার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে তার চেয়ে দোজখ যন্ত্রণা কি বেশি অসহনীয় হবে?

ডাকে বাবার নামে একখানা চিঠি লিখল সোহেলি। সংক্ষেপে তাতে অনুরোধ জানাল : বাবা-মা, সোহেলি নামে আপনাদের একটি মেয়ে ছিল সে কথা ভুলে যান। বকুলকে মানুষ করবেন, ভালো ফল করলে সে যেন অধ্যাপক হয়, অন্তত শিক্ষক অথবা সাধারণ অন্য যে কোন চাকরি, হোক তা কেরানির। সে যেন তার বাবার পেশা গ্রহণ না করে। তার জন্যে এ আমার শেষ অছিয়ত।

সে সঙ্গে য়ূনুসকেও একখানা চিঠি লিখল : য়ূনুস, মেজর য়ূনুস, তুমি আমার সাহেব, আমার দেহের তুমি মালিক। এ দেহকে তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে ব্যবহার করেছ, ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহার কথাটা প্রয়োগ করলাম, আসলে নির্যাতন কথাটাই ঠিক প্রয়োগ হতো। বাঞ্ছিত পুরুষের সঙ্গে যখন মিলন ঘটে তখন নারীর সর্বদেহ কথা বলে ওঠে, গত দু'বছর ধরে তুমি আমার বোবা দেহের ওপরই চালিয়েছ নির্যাতন। আজ আমার সে দেহটা সম্পূর্ণভাবে তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ দেহ আর কোনোদিন কথা বলবে না। যে হাসিকে তোমার বন্ধুরা অতুলনীয় বলে ঈর্ষা করত সে হাসি আর কোনোদিন আমার মুখে ফুটবে না। হ্যাঁ প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত রমণী মুখের-হাসিকে একমাত্র ফুল ফোটার সঙ্গেই দেওয়া যায় তুলনা। একদিন যে হাসি আমি হাসতে পারতাম আর তা ছিল আমার এক পরম সম্পদ, আমার সে হাসিকে তুমি চিরকালের জন্যে নিভিয়ে দিয়েছ। তা আর ফুটবে না, জ্বলবে না কোনোদিন। এখানে এ দূর বিদেশ বিভূঁইয়ে বিষ, বিষের আরবি কী তাও আমি জানি না, সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। তাই অত্যন্ত অশ্লীলভাবে আমার প্রাণটা আমি নিজের হাতে শেষ করে দেহটা তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম। বকুল আমার মা-বাবার কাছে মানুষ হবে এ আমার শেষ বাসনা। যদি পার আমার এ শেষ আরজুটা রক্ষা কর।

বকুলকে নিয়ে বাবার নিরাপদে দেশে পৌছার খবর পাওয়ার সপ্তাহখানেক পর একদিন ঘুম থেকে উঠে য়ূনুস সোহেলিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে, এ ঘর ও-ঘর বাথরুম ইত্যাদি ঘুরে, রান্নাঘরের পাশের ফালতু কুঠুরিটায় হঠাৎ দেখতে পেল ছাদের রিমের সঙ্গে সোহেলির দেহটা ঝুলছে, গলায় গিট দিয়ে জড়ানো তার বিয়ের বেনারশি শাড়ির আঁচল।

নির্মলেন্দু গুণ

বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে
লেখা প্রথম কবিতা

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি নি

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি।
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহীদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলে
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি।
সমকাল পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শাহাবাগ এ্যভিন্যুর ঘুর্ণায়িত জলের ঝর্ণাটি আর্তস্বরে আমাকে বলেছে
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমারও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে
ভালোবাসা আছে– শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমারও স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,
ভালোবাসা আছে– শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক,
না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্কভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন
রঞ্জরীগুলো কান পেতে শুনুক

আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো-কোকিলটি জেনে যাক–
আমার পায়ের তলার পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম
আজ সেই পলাশের কথা রাখলাম
আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম।
আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসি নি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।
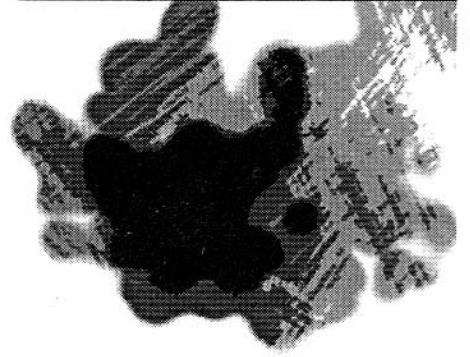
উত্তরাধুনিকতাবাদ বাজার, পুঁজি ও বোদরিলার্দ

শাহিনুর রহমান
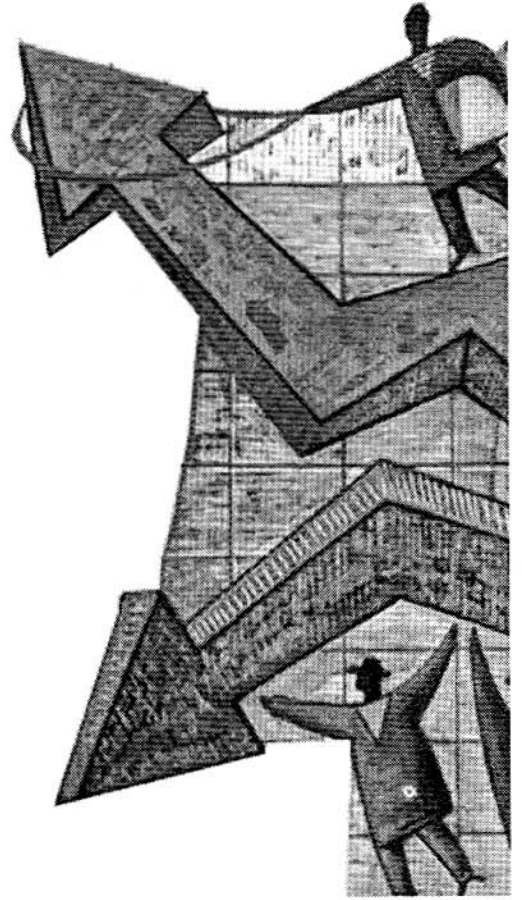
সালাহউদ্দীন আইয়ুবের বইয়ে ইহাব হাসান-উদ্ধৃত মডার্নিজম ও পোস্টমডার্নিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা তালিকা দেওয়া আছে। তালিকা দিয়ে এই দুই অনুষঙ্গের তফাত বোঝা যাবে কিনা, সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু এই তালিকা ইহাব হাসানের এবং তালিকাটি প্রণীত হয়েছে 'সাহিত্যিক মানসিকতা' থেকে। 'সাহিত্যিক' শব্দটি ব্যবহার করছি অন্য কারণে। ইহাব হাসান একটু বেশি সাহিত্য-ঘেঁষা সমালোচক; আধুনিক সাহিত্যের তিনি অনুরাগী, এবং সাহিত্যের মাপকাঠি ও সংস্কার থেকে তিনি আধুনিকতা–উত্তরাধুনিকতার স্বভাবগুলো পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। এইখানেই অসুবিধে। কেননা 'পোস্টমডার্নিজম' বা

উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রয়োগ– সাহিত্যের চেয়ে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতিতে হয়েছে বেশি। পোস্টমডার্নিজম সাহিত্যের চেয়ে সমাজ, কবিতা-গল্প-উপন্যাসের চেয়ে সংস্কৃতির ডিসকোর্স ব্যাখ্যা করেছে বেশি। আইয়ুবও তা জানেন; সেজন্যেই পোস্টমডার্নিজমকে তিনি 'প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক বিতর্ক' বলে চিহ্নিত করেছেন। আইয়ুব সেজন্যেই, তাঁর প্রথম[১]ও দ্বিতীয়[২]বইয়ে সাহিত্যের আলোচনার চেয়ে সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি।

যে-কোনো তত্ত্বই তার সমাজ, সমকাল ও ডিসকোর্স থেকে তৈরি হয়। শুরুতে সেটা খুব বোঝা যায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে তার স্বরূপ ধরা পড়ে। পোস্টমডার্নিজমও পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ একটা পরিবেশ ও আবহলোক থেকে উদ্ভূত। পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তন, সাম্যবাদের বিলোপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে রুশ ফেডারেশনের জন্ম, পুঁজিবাদের বিপুল বিচিত্র বিস্ময়কর বিকাশ– এসব কার্যকারণসূত্র 'পোস্টমডার্নিজম' নামক তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছে। গ্লোবাল রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নরকম শক্তিবৃদ্ধি, ক্ষমতা-কাঠামোর নতুন বিন্যাস ও রূপান্তর, পোস্টমডার্নিজমকে এগোনোর পথ করে দেয়। মডার্নিজম এবং পোস্টমডার্নিজমের পার্থক্য নিয়ে তাই এখন আর আলোচনার দরকার নেই, কেননা আমরা একটা পরিবর্তিত পরিবেশে বাস করছি। সেই পরিবেশ বিভিন্ন কারণে পূর্ববর্তী পরিবেশের বিপরীত। এ পরিবর্তিত পরিবেশে সাহিত্য-শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে নতুন নতুন ব্যাপার-স্যাপার দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। নতুন পরিবেশকে তাত্ত্বিক ফ্রেমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে যে তত্ত্ব, তার নামই পোস্টমডার্নিজম। পোস্টমডার্নিজমের একজন খ্যাতিমান তাত্ত্বিক জাঁ বোদরিলার্দ[৩] যিনি পোস্টমডার্নিজমকে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। এ প্রবন্ধে বোদরিলার্দের চিন্তার একটা সমালোচনা উপস্থাপিত হবে।

জাঁ বোদরিলার্দের তত্ত্বের প্রেরণা এসেছে পরিবর্তিত ও পরিণত পুঁজিবাদ থেকে। বোদরিলার্দ পুঁজিবাদের বিরাট বিস্ময়কর পরিবর্তনকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত করেন। বোদরিলার্দের সমসাময়িক আরেক তাত্ত্বিক জ্যাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার *'দি পোস্টমডার্ন কনডিশন'* (১৯৮৪) নামে একখানা বই লিখে বেশ সাড়া-হুল্লোড় তোলেন। লিওতারের লেখা পড়ে বোঝা যায়, পোস্টমডার্নিজমকে এঁরা মডার্নিজমের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহারটা শিল্পসাহিত্য ছাপিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। পোস্টমডার্নিজম বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত[৪] হয়েছে :

এক. কখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অ-বাস্তব ও অ-প্রথাগত শিল্প-সাহিত্য নির্দেশের জন্যে;

দুই. কখনো এমন সব সাহিত্য-শিল্প চিহ্নিত করার জন্যে, যা আধুনিকতাবাদী শিল্পসাহিত্যের বিশেষত্বনিচয়কে চরমপন্থী প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে;

তিন. কখনো, এবং প্রধানত, পঞ্চাশোত্তর পরিণত পুঁজিবাদপর্বের সাধারণ মানবিক পরিস্থিতি নির্দেশ করবার জন্যে– যার প্রভাব ও অভিঘাত জীবনধারা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ ও শিল্পকলায় বিস্তৃত ও বিবর্ধমান। পরিণত পুঁজিবাদপর্বের এই মানবিক পরিস্থিতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি একটা ইতিবাচক মনোভাব থেকে 'পোস্টমডার্নিজমের' তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে।

উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি বিষয়ে হরেক রকমের বই নিত্য ছাপা হচ্ছে। কেউ কেউ খুব নেতিবাচক মনোভঙ্গি থেকে 'উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি' বিষয়ে বই লিখছেন। তাঁরা একে বলছেন postmodern crisis। এ ধরনের বই ইউরোপে লেখা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো হচ্ছেই। এ বিষয়ে নেতিবাচক বইগুলোকে একজন সমালোচক চমৎকারভাবে শ্রেণিকরণ করেছেন। তাঁর মতে, এগুলো হচ্ছে *B-effect* এর শস্য। অর্থাৎ এ হলো B-effect ক্যাটেগরির postmodernism। B-effect কোনো ধাঁধা নয়; পোস্টমডার্নিজমের কয়েকজন তাত্ত্বিকের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে এই ক্যাটেগরি প্রস্তাব করেছেন নিকোলাস যারব্রাগ[৫]। তাত্ত্বিকরা হলেন : Benjamin, Barthes, Burger, Baudrillard, Bonito-LOLiva ও Bourdieu। এঁরা যেহেতু late capitalism-এর লক্ষণ হিসেবে 'সিজোফ্রেনিয়া' ও 'superficiality' প্রভৃতির কথা বলেছেন, সেজন্যে পোস্টমডার্নিজমের ভাষ্যকারেরাও ওসব প্রসঙ্গকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলত, এসব ভাষ্যকারদের চোখে উত্তরাধুনিকতাবাদ প্রচণ্ড না-বাচক হয়ে উঠেছে। আসলে বোদরিলার্দ, বার্থ, বার্জার, বেনজামিন, বোর্দো প্রমুখের কাজে অনেক fiction ও contradiction আছে এবং তাঁদের বক্তব্যের অন্তর্বিরোধ পোস্টমডার্নিজমকে অধিকাংশ সময়ে ইতিবাচক প্রপঞ্চ হতে দেয় নি। এঁরা একই সঙ্গে শৈল্পিক উদ্ভাবনার মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং চিরস্থায়ী বাস্তবতার অভাবের কথা বলেছেন। বোদরিলার্দ বলেন, 'এই জগতে প্রমূল্য তো কিছু নেই, আছে কেবল অতিকায় কালোগর্ত' : এ-উচ্চারণকে কি প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক মনে হয় না। মনে হয় না যে প্রমূল্যের অনুপস্থিতিকেই (lack of value) তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন? বোদরিলার্দ যখন 'কনজ্যুমার সোসাইটি'কে আমাদের নিয়তি বলে নির্দেশ করেন এবং অত্যুৎসাহে স্বাগত জানান, তখন তাঁকেই সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত মনে হয়। বোদরিলার্দ সিজোফ্রেনিয়ার পক্ষের লোক, এধরনের বিশেষণে তাঁর ক্রুদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই। মনে রাখা দরকার, বোদরিলার্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভীষণ ভক্ত এবং পৃথিবীতে আমেরিকারই যে কেবল ভবিষ্যৎ আছে, এ কথাটাই তিনি *'America'* নামক (১৯৮৮) আস্ত একখানা বই লিখেছে

ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা এখনো 'concept' নামক বৃহৎ একটা ছাতার নিচে 'অর্থের' অন্বেষণে ঘুরছে। কিন্তু 'আমেরিকা' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; তাঁরা object-কে concept থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইনট্রোভার্ট ইউরোপের চেয়ে এক্সট্রোভার্ট আমেরিকা বোদরিলার্দের অধিক প্রিয়। বোদরিলার্দ ইউরোপের তুলনায় আমেরিকাকে মনে করেন অনেক বেশি আধুনিক, হয়তো উত্তর-আধুনিক; ইউরোপকে তিনি 'এক অভিজাত তৃতীয় বিশ্বের' চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন নি। বোদরিলার্দ জানেন, ইউরোপের সংস্কৃতি এখনো একটা প্রধান ব্যাপার, ইউরোপ এখনো হয়তো সংস্কৃতির কেন্দ্র; কিন্তু সেই কেন্দ্র, পুরোনো পৃথিবীর কেন্দ্র। নতুন পৃথিবী রচিত হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায়, এই-ই তাঁর বলবার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা 'সক্রিয় স্বাধীনতা' (active freedom) তিনি দেখেন[৭], যা ইউরোপে বহুদিন থেকে দুর্লভ। তাঁর ভাষায়, এই সক্রিয় স্বাধীনতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সমস্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে বিদ্যমান।

পরিণত পুঁজিবাদী সমাজের তাত্ত্বিক জাঁ বোদরিলার্দ মতে– বিশ্বব্যাপী একটা পণ্যভোগী-সমাজ তৈরি হয়েছে এবং বর্তমান পৃথিবীতে consumerism-এর জয়জয়কার। এই সমাজ বোদরিলার্দকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং consumerism-কে তিনি শিল্প-সাহিত্যনন্দনতত্ত্বের সঙ্গে একাকার করে ভাবতে চান। রয় পোর্টার[৮] জ্যাঁ বোদরিলার্দের তত্ত্বকে consumerism-এর পরিপ্রেক্ষিতে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রয় পোর্টারের সূত্র অনুসরণ করে আমরা কিছু কথা বলব।

পণ্যভোগবাদ (consumerism) পাশ্চাত্য জগতে নতুন কিছু নয়; এমন তো নয়ই যে, এই প্রথম পশ্চিমে consumerism প্রবল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মোটেও তা নয়। তবে বাজার অর্থনীতির যুগে কনজ্যুমার সোসাইটি ও কনজ্যুমারিজম যে বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠবে, সে তো খুব স্বাভাবিক। ইংল্যান্ডে উনিশ শতকেই লেখা হয় '*The Ethics of Shopping*'।[৯] সেই লেখায় লেখিকা পুরোনো দিনের দোকানপাটের কথা লিখেছেন; তার সাজসজ্জা, ডিসপ্লে, বেচাকেনার ধরন, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, জিনিসপত্রের দাম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আলোচনা চমৎকার। পুরোনো দিনের শপিংয়ের শুধু বর্ণনাই তিনি দেন নি, তার সঙ্গে বর্তমানের (১৮৯৫) তুলনাও করেছেন। বলেছেন, আগে জিনিসপত্রের দাম ছিল বেশি, দোকানিরা ছিল রক্ষণশীল, দোকানগুলো ছিল শ্রীহীন এবং কোনো ডিসপ্লেও ছিল না; দোকানের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। আর বর্তমানে (১৮৯৫) দোকানপাট অনেক, ডিসপ্লে অপূর্ব, কিনবার মতো জিনিসপত্রও বিচিত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের চেহারা ও ক্রেতার স্বভাব, চাহিদা ও অভিরুচি কীভাবে বদলে গেছে, লেখিকা তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেইসঙ্গে লেখিকা অতীতের দিনগুলোকে স্মরণ করে হাহাকার করেছেন। বলেছেন, এখনকার শপিং-এর চরিত্রই অন্যরকম। এখন শুধু প্রয়োজনের শপিং করলে চলে না; দোকানে এমনসব জিনিসপত্র দেখি, যা 'অপ্রয়োজনীয়' কিন্তু কিনতে ইচ্ছে করে। একে তিনি Seductions of shopping বলেছেন। বলেছেন, দরকারি জিনিসটা কেনার জন্যে আমরা দোকানে যাই, কিন্তু দেখা যায়, দোকানগুলো আরও অনেক অনেক 'দরকারি' সুন্দর জিনিসে ভরে আছে। মনে হয়, ওসব জিনিস না কিনলে জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে উঠবে। উনিশ শতকেই ইংল্যান্ডে কনজ্যুমারিজম বিস্ফোরিত!

দোকানঘরগুলোতে তখনই বিপ্লব ঘটে যায় : বিশেষত শতাব্দীর শেষদিকে। দেখা যায়, এক দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্য দোকান উঠছে। পণ্যবাজারের প্রতিযোগিতা তখন থেকেই দ্রষ্টব্য। ১৮৭২ সালে ব্যবসা করতেন টমাস লিপটন : লিপটনের বাণিজ্যের শাখা ছিল প্রায় ২৪৫টি। লিপটনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে 'হোম এন্ড কলোনিয়াল স্টোরস লিমিটেড' এবং এদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ৪০০'র মতো। এরকম আরও অনেক অনেক কোম্পানি গড়ে ওঠে, যাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা ইংল্যান্ডে বিস্তার লাভ করে। অক্সফোর্ডে এক মহিলা ব্যবসা করতেন ফার্নিচারের; তাঁর নাম ফ্লোরা থম্পসন; তিনি ইংল্যান্ডের পাড়াগাঁর গৃহবধূদেরকেও একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে,দামি আসবাবপত্র ছাড়া বেঁচে থাকার আদৌ কোনো মানে হয় না। ইংল্যান্ডের গ্রামগঞ্জে তখন টাকাকড়ি কিছুই নেই, ফি সপ্তাহে দশ শিলিং আয়ের ওপর বেঁচে থাকতে হয়, কৃষির অবস্থা ভয়াবহ, তবু মানুষজনকে দোকানীরা আকৃষ্ট করেছে। ইউরোপ-জুড়ে এসময় 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' গড়ে উঠতে থাকে এবং স্টোরগুলো হয়ে ওঠে প্রবল আকর্ষণের বস্তু। এভাবে গণ পণ্যভোগের এক বর্ণাঢ্য পরিবেশ তৈরি হয়।[১০]

অর্থনীতির ইতিহাসকারেরা ইংল্যান্ডের বিবর্ধমান পুঁজিবাদ ও বাণিজ্যস্ফীতির সুন্দর সব গল্প বলেছেন। ইংল্যান্ড কিভাবে শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দিল, কিভাবে তার প্রবৃদ্ধির হার বাড়ল এবং একসময় আর সব প্রতিবেশী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেল– এসব ইতিহাস পড়লে ওসব কথা জানা যায়। ইংল্যান্ড যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিনায়ক এবং পৃথিবীর মস্ত এক কারখানা, সেকথা ওদেশের কারো অবিদিত ছিল না। বিজ্ঞানী-রা যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন– তার ইতিহাসও গল্পে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হতো। তবে, 'আবিষ্কার' কিভাবে কেবল বিজ্ঞানের বিষয় থাকে না, হয়ে ওঠে 'পণ্য'– তার বিশ্লেষণ খুব বেশিদিন পূর্বে হয় নি। ইংল্যান্ড তো হয়ে উঠেছিল 'দোকানদারদের জাতি'[১১], কিন্তু তা সম্ভবপর হয় বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে 'পণ্যে' পরিণত করার কারণে। পণ্যবাজারের সম্প্রসারণ এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নব নব

উদ্ভাবনা ইংল্যান্ডে প্রায় সমকালীন ঘটনা। জর্জীয় ও ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ হয়ে উঠল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। তবে পণ্যের বাজার ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি অজ্ঞাত কারণে উচ্চ রূপ নেয় নি। এর সঙ্গে যোগ আছে– গভীর গভীরতর যোগ আছে– উপনিবেশের দেশগুলোর সম্পদ-লুণ্ঠন ও কাঁচামাল আত্মসাতের। উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশের সম্পদ-আহরণ ছাড়া ব্রিটিশ বাণিজ্য, শিল্পায়ন, বাজারের বিস্তার সম্ভবপর ছিল না। যে-কারণেই ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসুক না কেন, consumption- ই ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন, কলকারখানা ও পণ্যবাজারকে সচল রেখেছে। এভাবেই পুঁজিবাদের সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে কনজ্যুমারিজমের বিস্তৃতি ঘটে এবং একটা ব্যাপক পণ্যভোগী সমাজ তৈরি হয়। consumption-ই সকল অর্থনৈতিক সচলতার মূল। অর্থনীতির ইতিহাসকারেরা লিখেছেন, মধ্য-জর্জীয় ইংল্যান্ডে প্রতি চল্লিশজন ব্যক্তির জন্যে একটি করে দোকান গড়ে উঠেছিল। আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের সঙ্গে বিশেষত উনিশ শতকের শেষার্ধের ইংল্যান্ডের কোনো মিল নেই। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে উপনিবেশের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, উনিশ শতকের consumerism এবং দোকানের পর দোকান তৈরির ঘটনাকে অর্থশাস্ত্রী পণ্ডিতেরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। পনের বছর পূর্বে রচিত কোনো বইতে কনজ্যুমারিজম নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ তাই দেখা যায় না। অর্থশাস্ত্রীরা ধরতে পারেন নি বটে, কিন্তু জেন অস্টেনের উপন্যাস পড়লেও উনিশ শতকের ইংল্যান্ড ও তার বিবর্ধমান কনজ্যুমার সোসাইটির কথা জানা যায়। জেন অস্টেনের Emma উপন্যাসে দেখব, জেইন ফেয়ারফ্যাক্স কাঠের তৈরি সুন্দর একটা পিয়ানো উপহার হিসেবে পেলে, সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। সমস্ত গ্রাম জুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই 'পিয়ানো'। অস্টেনের উপন্যাসে ঘরবাড়ির সাজসজ্জা থেকেও তখনকার সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন চিহ্ন উদ্ধার করা যায় : 'নতুন ডাইনিং রুম, নতুন পিয়ানো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম খরচপাতির নমুনা'[১২]। ঘরবাড়ির সাজসজ্জা নিয়ে জেন অস্টেনের এসব বিবরণে শুধু উনিশ শতকের ইংল্যান্ড নয়, তাঁর নিজের জীবনের এবং জীবনযাপনেরও ছায়াপাত ঘটেছে। অস্টেনের উপন্যাসের আত্মজৈবনিকতা কোনো কোনো সমালোচক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, আমাদের তা দরকার নেই। শুধু এটুকু জানলেই চলবে যে, জেন অস্টেন নিজে শপিং করতে খুব পছন্দ করতেন এবং শপিং করার জন্যে তিনি লন্ডনে আসতেন প্রায়ই। নিউ বন্ড স্ট্রীটের 'গ্রাফটন হাউস' থেকে জেন অস্টেন শখ করে মসলিনও কিনেছিলেন। এই গ্রাফটন হাউসেই তিনি মা ও বোনের জন্যে জামা বানানোর অর্ডার দিতেন। জেন অস্টেনের ভাইয়ের বাসা ছিল হেনরিয়েটা স্ট্রীটে; তারই কাছাকাছি ছিল 'বেডফোর্ট হাউজ', যেখান থেকে অস্টেন পোশাক-আশাক বানিয়েছেন বলে জানা যায়। লেইচেস্টার স্কয়ারের 'নিওটন'স থেকেও তিনি জামাকাপড় বানান। মোটকথা 'শপিং' জেন অস্টেনের খুব প্রিয় ছিল; এবং উনিশ শতকে 'শপিং' যে কতটা জীবনযাপনের আনন্দজনক অংশ হয়ে উঠেছিল, তার উদাহরণ দেওয়ার জন্যেই আমরা জেন অস্টেনের উল্লেখ করলাম। শপিং, পণ্য ব্যবহার, বাজারের বেচাকেনার সঙ্গে 'আনন্দ'-কে যুক্ত করতে সক্ষম হয় উনিশ শতকের পুঁজিবাদ। 'শপিং' শুধু জিনিস কেনা নয়, 'শপিং' আনন্দও। শুধু 'আনন্দ' নয়, একপ্রকার 'খেলা'ও। যে খেলা অন্যকে অর্থাৎ যে শপিং করছে না, তাকে হতাশ করে দেয়। 'এভেলিনা' উপন্যাসের একটি চরিত্র তাই বলে– 'The shops are really very entertaining'। পণ্যবাজারের এইসব পরিবর্তনকে কেবল ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা প্রযুক্তির ফল মনে করলে উনিশ শতকের ইংল্যান্ডকে বোঝা যাবে না। কনজ্যুমারিজম আসলে একটা বিপ্লবই ছিল, সেই বিপ্লব কেবল পণ্যোৎপাদন ও বাজারের বেচাকেনায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিপ্লবটা এসেছিল মনোজগতে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক মতাদর্শে। এ ছিল মূলত 'শপিং'কে একটা 'স্টাইলে' বদলে দেওয়ার বাসনা। এ ছিল হাইস্ট্রিটগুলোর নান্দনিকায়ন। পণ্ডিতদের কথা বাদ দেই, ইংল্যান্ডের সেকালের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী জোসিয়াহ ওয়েগউডের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন সিরামিক্‌সের একজন ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি। আঠারো শতকের শেষদিকে লন্ডনের গ্রসভেনর স্কয়ারে তিনি একটা 'শোরুম' খোলেন। এই শোরুম ছিল বিখ্যাত এবং অপূর্ব। বেচাকেনাকে অভিজাত, সুমার্জিত, উদ্ভাবনশীল এবং নেশাগ্রস্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। জোসিয়াহ ওয়েগউড বলতেন, 'মেধা'র চেয়ে 'ফ্যাশন' অন্তহীনভাবে ও বিভিন্ন কারণে অনেক বেশি উচ্চমার্গীয়। ওয়েগউড 'শপিং সিক্রেট' কী তা ভালোভাবে জানতেন; জানতেন তাঁর খরিদ্দারেরা সিরামিক্‌সের খোঁজে অন্যত্র যাবে না। 'ব্যবসা' কেবল ব্যবসা নয়, তার মধ্যে আনন্দ আছে; শপিং তাই শুধু পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নয়, 'শপিং' হলো একইসঙ্গে কৌতূহলের, আকর্ষণের, বিস্ময়ের, বৈচিত্র্যের– Shopping is seduction, and business is amusement।

এত কথা বলার কারণ হলো, ইউরোপে কনজ্যুমারিজমের বিস্তার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বর্তমান পৃথিবীতে কনজ্যুমার সোসাইটি ও পণ্যবাজার হলো পুঁজিবাদের বিস্ময়কর স্ফুরণের চিহ্নবাহী। আমাদের বলবার কথা হলো, 'কনজ্যুমারিজম' কেবল অর্থশাস্ত্রের বিষয় নয়, এটি হলো পুঁজিবাদের একটা বিজয়ী মতাদর্শ এবং দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমান পৃথিবীর পণ্যবাজারের বিস্তার দেখে বিস্মিত হবার কিছুই নেই; কেননা পুঁজিবাদী বাজারের ধারাবাহিক ইতিহাস

রয়েছে। বর্তমান সময়ের রাজা হলো *consumer capitalism*। কনজ্যুমার ক্যাপিটালিজম থেকেই জন্ম নিয়েছে culture of consumption বা পণ্যব্যবহার/ভোগের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বর্তমান পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক সংস্কৃতি। 'বাজার' এভাবে সংস্কৃতি উৎপাদন করেছে। বাজার যত বিস্তৃত হয়েছে, সেই সংস্কৃতির কর্তৃত্বও তত সম্প্রসারিত হয়েছে।

জাঁ বোদরিলার্দ মনে করেন, পণ্যভোগবাদী পুঁজিবাদ যথেষ্ট ইতিবাচক। কেননা এর মধ্যে, অর্থাৎ পণ্যভোগবাদী পুঁজিবাদ ও তার সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট একটা শক্তি আছে– যে শক্তি থেকে আমরা *exploitation of signs*-এর প্রেরণা পাই। 'চিহ্ন'কে যেভাবে খুশি ব্যবহার করা, যেভাবে খুশি তার অর্থ নির্দেশ করা, পোস্টমডার্নিজমের একটা দিক। বোদরিলার্দের মতে, 'চিহ্নে'র এই ব্যবহার এবং নানারকম ব্যবহার পণ্যবাদী সংস্কৃতির দান। অতঃপর বোদরিলার্দ সেই স্মরণীয় বাক্যটি বলেন যে, এভাবে পরিণত পুঁজিবাদী সমাজে 'চিহ্ন' এবং 'পণ্য' (sign and commodity) একত্রিত হয়েছে এবং তৈরি করেছে 'পণ্য-চিহ্ন' বা 'commodity-sign'।[১৩]

আমরা জানি, বর্তমানকালে গণমাধ্যমগুলোর বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোদরিলার্দ 'চিহ্নে'র যে স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের কথা বলছেন, তা সম্ভবপর হয়েছে গণমাধ্যমের কারণে। মিডিয়া 'চিহ্ন'কে 'বিষয়' থেকে মুক্ত করে দেয়, ফলে 'কনটেক্স্ট'কে অগ্রাহ্য করে 'চিহ্নে'র যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভবপর। মিডিয়ার এই ভূমিকাকে খুব প্রশংসা করেন জাঁ বোদরিলার্দ।

মনে রাখা দরকার, আজকের ফরাশি উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিক জাঁ বোদরিলার্দ অতীতে একজন মার্কসবাদী ছিলেন। আজ তিনি বলছেন, উৎপাদনের ওপর মার্কসিস্টরা যে পরিমাণ জোর দেন, তা খুব ভুল। তাঁর মতে production নয়, জোর দেওয়া উচিত consumption-এর ওপর। 'উৎপাদন' খারিজ করে বোদরিলার্দ সেখানে 'পণ্যভোগের' জয়ধ্বনি করেন। এভাবেই, তাঁর মতে, 'চিহ্ন'কে স্বাধীন করা যাবে; এভাবেই 'ইমেজ' আর 'রিয়ালিটি'তে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কনজ্যুমার সোসাইটি অর্থনৈতিক যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক ব্যাপার। অতঃপর বোদরিলার্দ যদি consuming dreams-এর কথা বলেন, অবাক হবার কিছু নেই। এসব কথাকে পোস্টমডার্নিজম খুব 'নতুন' বলতে চায়, কিন্তু আসলে কি তাই?[১৪] ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রত্যেকটা পর্বে এসব আমরা শুনেছি। তবে জয়ধ্বনিটা নতুন, বিশেষ করে বোদরিলার্দের। পোস্টমডার্নিজম যে লাইফস্টাইলের কথা বলে, তাকে খুব বেশি নতুন মনে করার কারণ নেই। বোদরিলার্দের অনেক আগে, বার্নার্ড ম্যান্ডেভিল পুঁজিবাদের অনন্ত সম্ভাবনার কথা বলেছেন। বলেছেন, পুঁজিবাদ হলো সেই স্বর্গ যেখানে সম্ভাবনার দরজা পুরোটাই খোলা: ইচ্ছে করলেই এখানে প্রবেশ করা যায় এবং ধনী হওয়া যায়। বলেছেন, কেবল মরালিটির হস্তক্ষেপ না থাকলেই হলো, পণ্যবাজারের বিস্তার আর কিছু রোধ করতে পারবে না।

জ্যাঁ বোদরিলার্দের পৃথিবীতে নৈতিকতা বলে কিছু নেই। সাম্যবাদও নেই। আছে কেবল পণ্য ও বাজার। আছে প্রতিযোগিতা আর অসম অট্টহাসি। এর পরিণতি কী, সেটা বোদরিলার্দকে ভাবিত করে না। পরিণত পুঁজিবাদের সংস্কৃতি, বাজার এবং চিহ্ন-ব্যবহারের অফুরন্ত সম্ভাবনাই তাঁর আনন্দের সর্বস্ব। বোদরিলার্দ কনজ্যুমারিজম বা কনজ্যুমার ক্যাপিটালিজমের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন 'হিস্টিরিয়া'। এই 'হিস্টিরিয়া' কি তাঁর অপছন্দ? মনে হয় না। বর্তমান পৃথিবী বাজার অর্থনীতির নির্দেশে চলছে এবং বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। এ থেকে বেরুবার কোনো পথ আছে কিনা জানি না। তার চেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর কথা হলো বেরুবার দরকার আছে বলেও মনে করেন না জ্যাঁ বোদরিলার্দ। এ হলো গণমাধ্যমের বিস্ফোরণের মধ্যে self-referential উত্তর-আধুনিক এক পৃথিবী বা বাজার, যার মানুষজনেরা নিয়তির নির্দেশ বহুপূর্বে অমান্য করে এসেছে।

উত্তরাধুনিক পৃথিবীর প্রতি পক্ষপাত ব্যক্ত করতে গিয়ে বোদরিলার্দ আসলে 'আধুনিকতার'ই জয়ধ্বনি করেন। বোদরিলার্দের ভাষ্যে 'আধুনিকতা' হয়ে ওঠে অনন্য অসামান্য। বোদরিলার্দের এই মনোভঙ্গিটাই তো বিপজ্জনক। কুয়ান সিংশেন [১৫]বলেন:

> উত্তরাধুনিকতাবাদের মধ্যে আমাদের জগৎ বিষয়ক ধারণা, বাস্তব বিষয়ে বোধ– সবকিছু গণমাধ্যমের হস্ত ক্ষেপে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত ও বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। মিডিয়া প্রাকটিস সময় ও পরিসর সম্পর্কে আমাদের তাবৎ ধারণা পুনর্বিন্যস্ত করে। ফলে বাস্তব কী– তা আমরা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বুঝি না; টিভি স্ক্রীনে যা কিছু যেভাবে দেখানো হয়, তাই আমাদের বাস্তব। টিভি আমাদের পৃথিবী। ইতিহাস এভাবেই ক্রমশ referent-হীন হয়ে উঠছে। এভাবে আমরা ঢুকে পড়ছি ভান, মুখোশ, আর ছদ্মমুখোশের জগতে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঁজিবাদ একই কাজ করছে। তা হলো, বাসনা এবং দাবিকে গুলিয়ে দেওয়া। বহুদিন আগে আর্থার মিলারের *The Price* প্রকাশিত হয়। সেখানে একটা বর্ণনা এরকম : বহু বছর পূর্বে একটা লোক ছিল অসুখী, সে জানত না নিজেকে নিয়ে সে কী করবে? সে চার্চে যাবে, না কোনো বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে, না অন্য কিছু। কিন্তু আজ? আজকে কি তুমি অসুখী? বুঝতে পারছ না কি করবে? এ

সমস্যার সমাধান চাও? Go shopping।' পুঁজিবাদে বাসনা ও চাহিদা এভাবে মিলেমিশে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের অসুখী মানুষ জর্জীয়-ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডেও যে প্রচুর ছিল, তা আমরা দেখেছি। আজকে এদের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে, এই হলো তফাৎ।

হ্যাঁ, জ্যাঁ বোদরিলার্দ পড়ে আমরা বিব্রত হই; কেননা তিনি বিদ্যমানের জয়ধ্বনি করেন এবং কোনো বিকল্পের কথা বলেন না।

তথ্যসূত্র :

১.সালাহউদ্দীন আইয়ুব, আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪)

২. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, অরিয়েন্টালিজম, ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক (ঢাকা : দেশ প্রকাশন, ১৯৯৫)

৩ বোদরিলার্দের বইগুলো : *The Mirror of Production* (St Louis : Telos Press, 1975); Simulations (New York : Semiotext (e)1983); *In the Shadow of the Silent Majorities* (New York : Semiotext(e), (1983), The Ecstasy of Communication (New York : Semiotext (e), 1988), *The Evil Demon of Images* (Sydney : Power Institute Publications, 1988);*America* (London : Verso, 1988); *Seduction* (New York : St Martins Press), 1990

৪ Jeremy Hawthorn, *Modernism* and *Postmodernism*. In *A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory* (London : Edward Arnold, 1992) p. 110

৫ Nicholas Zurbrugg, *The Parameters of Postmodernism* (London : Routledge, 1993) p. xi

৬ Ibid, p. 141

৭ Jean Baudrillard, *America* (London : Verso, 1988) p. 81

৮ Roy Porter, *Pre-modernism and the Art of Shopping*. In Critical Quaterly (Vol. 34, no.4) Winter 1992: 3

৯ Ibid

১০ Ibid p. 5-6

১১ Pat Hudson, The Industrial Revolution (Dunton Green : Edward Arnold, 1992)

১২ Edward Copeland. Jane Austen and the Consumer Revolution. In The Jane Austen Handbook : With a Dictionary of Jane Austen's Life and Works (London : Athlone Press, 1986) p. 77-92

১৩ Roy Porter, Ibid. p. 11

১৪ Roy Porter, Baudrillard : History, Hysteria and consumption : In C. Rojek (ed.), Forget Baudrillard ? (London : Routledge, 1993)

১৫ K.H. Chen, 'Baudrillard's Implosive Postmodernism', In Theory, Culture & Society, 3 (1987), 71-88, p. 11.
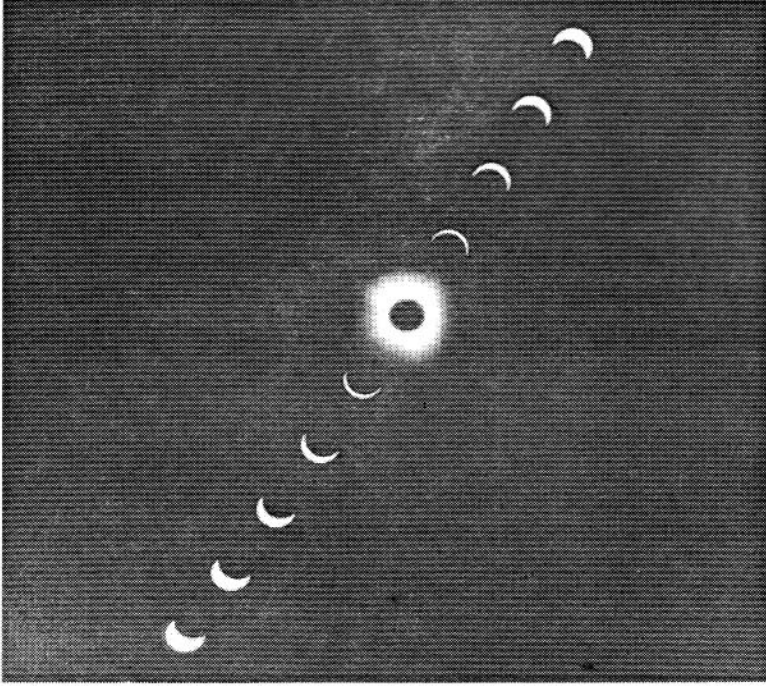
শতাব্দীর দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ
মহাজাগতিক সংস্কৃতির পথে

আসিফ

পূর্ণগ্রাসের আগ মুহূর্ত থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, বেইলি বিডস, দিনের বেলায় গ্রহ-নক্ষত্র, করোনা ও অপরূপ ডায়মন্ড রিঙের দৃশ্যগুলো ধরা দিচ্ছিল। আর হাজার হাজার মানুষ সমস্বরে চিৎকার করে সেগুলোকে যেন স্বাগত জানাচ্ছিল। একের পর এক এইসব অভূতপূর্ব সব দৃশ্যাবলি অবতারণার মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছিল শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এ যেন জাগতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মানুষের মহাজাগতিক নাটকের অবলোকন- সূর্যের ওপর দিয়ে চাঁদের চলে যাওয়ার এক নাটক। পঞ্চগড়ের হাড়িভাষা ইউনিয়নের মানুষই শুধু মাধুপাড়া গ্রামে এসেছিল তা নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের ঢল নেমেছিল এই হাড়িভাষা ইউনিয়নে। পঞ্চগড় স্টেডিয়ামেও ছিল একই অবস্থা। সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, তেঁতুলিয়া থেকেও এর অসাধারণ দৃশ্যগুলো অবলোকনের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এছাড়াও ঢাকা শহর থেকে

আংশিক দেখা গেলেও সেখানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল সংসদ ভবনসহ বিভিন্ন জায়গায়।
আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবী থেকে চাঁদের আয়তন সূর্যের আয়তনের প্রায় অনুরূপ। কারণ, সূর্য চাঁদের চেয়ে ৪০০ গুণ বড় এবং ৪০০ গুণ দূরে অবস্থিত। তাই তারা একই সরলরেখায় মিলিত হলে চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে অন্ধকার এবং সাধারণত সূর্যের অদৃশ্যমান বহিস্থঃ আবহ জ্যোতির্বলয় দৃশ্যমান হয়। সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তাই কেবল পৃথিবী থেকেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

মহাজাগতিক রাত

অথচ সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও মেঘে ঢেকে যাওয়া আকাশ দেখে এক প্রকার আশঙ্কাই জাগছিল আর বুঝি দেখা হবে না বহু প্রত্যাশিত এ সূর্যগ্রহণ। গ্রহণের সময় সূর্যের ওপর দিয়ে চাঁদ প্রায় ৩০ মিনিটের পথ অতিক্রম করার পরও মেঘের ঘনঘটা আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শেষ হলো না। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সূর্যগ্রহণ দেখার বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ যখন ফিরে যাচ্ছিল আপনালয়ে, ঠিক সে সময় সরে যাওয়া মেঘের ফাঁকে এক ধরনের ক্লাইমেক্স তৈরি করে সূর্যের ওপর চাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থান ঝিলিক মেরে ওঠে। তখনই হাজার হাজার মানুষের চিৎকার যেন সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সঙ্গে সূর্য ও চাঁদের গভীর সম্পর্কের কথা জানান দিচ্ছিল। এরপর সূর্যের ওপর চাঁদ সম্পূর্ণ চলে এলে সীমান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তা, চা-বাগান, পাট ও ধানক্ষেতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বুঝতে পারছিল পৃথিবীতে সেই আঁধার নেমে এসেছে। এ ঠিক অন্ধকারচ্ছন্নতা নয়, এ এক রাত, তবে পৃথিবীর নয়, মহাজাগতিক! সঙ্গে সঙ্গে ভারত সীমান্তের সৌরবাতিগুলো জ্বলে উঠল। রাস্তার গাড়িগুলোকে দেখা গেল হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে। রাতের আকাশের বুধ, শুক্র, লুব্ধকসহ আরও কয়েকটি গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এরপরই সূর্যের বহিস্থ অদেখা অংশ সূর্যের চারদিকে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ৪/৫ মিনিটের দীর্ঘ রাত কাটিয়ে চাঁদটি সরে গিয়ে ঝিকিমিকি করা মহাজাগতিক হীরার আংটি বা ডায়মন্ড রিংয়ের দৃশ্যটিও ধরা পড়ল। দেখা গেল সূর্যের অদেখা বহিস্থ অঞ্চল ক্রমোস্ফেয়ার। এর কিছুক্ষণ পর চাঁদটি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার কাটতে লাগল।
এসময় ডিসকাশন প্রজেক্ট তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কমিটির সঙ্গে যুক্ত নালন্দা থেকে আসা শতাধিক শিশু ও শিক্ষাকর্মী গাইতে লাগল, 'আকাশ ভরা সূর্য-তারা / বিশ্বভরা গান/ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান'। সবাই কাঁদছিল কিন্তু কেন? সম্ভবত মনের গভীরে যে আরেকটি মন থাকে, যে আরাধনা করতে চায় সেই সব শক্তির যার সঙ্গে সময়ের কোনো একসময় আমরা যুক্ত ছিলাম। এখনও তার আলোয় বেচে আছি। তাকে পাওয়ার আনন্দেই হয়তো!
এ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আলো কমে যাওয়ার সঙ্গে তাপও কমেছে এক ডিগ্রির বেশি। গ্রহণের আগে তাপমাত্রা ছিল ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পূর্ণগ্রাসের সময় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি। গ্রহণের পর তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০.৪ ডিগ্রি। মহাজাগতিক এই নান্দনিক দৃশ্য মহানগরবাসীও দেখেছেন। ৭টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকে ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকে চাঁদ। ভাসা মেঘের ভেলার মধ্যদিয়ে এই দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে ওঠে। প্রায় ৯৩ শতাংশ এই গ্রাস দেখা যায়। এতদিন কাস্তের মতো চাঁদ দেখেছিল মানুষ। এখন কাস্তের মতো সূর্য দেখল। এমনই সব বিরল দৃশ্যমালার সাক্ষী হয়ে রইল বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, চীনসহ বিশ্ববাসী। জাপান থেকে সর্বোচ্চ গ্রহণকাল অবলোকন করা গিয়েছিল। প্রায় ৬ মিনিট ২৭ সেকেন্ড। এমন সূর্যগ্রহণ বাংলাদেশ থেকে দেখতে ১০৫ বছর সময় লাগবে। বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে ২১১৪ সালের জুন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকা সম্ভব হবে না। বিজ্ঞান বোধহীন প্রাযুক্তিক বন্যায় প্লাবিত মানুষ কিছুটা নাড়া বোধ হয় খেয়েছিল। অন্তত দু'দিন আগে থেকে চাঁদ, পৃথিবী আর সূর্যের অবস্থান নিয়ে আর কখনো বোধহয় এত সময় কাটায় নি। এই গ্রহণে বায়োলজিক্যাল ক্লক বা জীবচক্রে সামান্য প্রভাব ফেলার সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখা গেছে। ফলে পাখিরা ঘরে ফিরে আসতে চাইছিল, সন্ধ্যার ফুলেরা আগেই ওঠার প্রবণতা দেখা গেছে।

হিরণ পয়েন্ট থেকে পঞ্চগড়

১৯৯৫ সাল ২৪ অক্টোবর। হিরণ পয়েন্ট থেকে একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের মানুষ। মাছরাঙা নামে জাহাজে করে ২০০ অভিযাত্রী সুন্দর বনের হিরণ পয়েন্টে এই অপরূপ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর পর আগামী ২০০৯ সালের ২২ জুলাই তারিখে বাংলাদেশের মানুষ আবার একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করল। আগামী একশো পাঁচ বছরে এই একটি মাত্র পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ছাড়া আর কোন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এখান থেকে দেখা যাবে না। বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি সর্ব সাধারণের কাছে এটা ছিল অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা। আজ সময় হয়েছে, সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার আলোকে ছড়িয়ে দেবার। আর এইজন্য দেশের সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর সঙ্গে একসাথে কাজ করেছিল ডিসকাশন প্রজেক্ট। সেই প্রচেষ্টার একটি প্রাথমিক রূপ হিসেবে ডিসকাশন প্রজেক্ট গড়ে তোলে দেড় বছর আগে 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ কমিটি'। সে লক্ষ্যে জেলা শহরগুলোতে সূর্য গ্রহণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কর্মশালা, সেমিনার, প্রদর্শনী আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সচেতনতা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম চালিয়েছে ওই সময় ধরে। এই কমিটিতে ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর,

ছায়ানট শিক্ষাকার্যক্রম নালন্দা, সমন্বিত শিক্ষা-সংস্কৃতি কার্যক্রম, কসমিক কালচার, বাংলাদেশ নেচার স্টাডি এন্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন। এ কমিটির উদ্যোগে পঞ্চগড়ের বোদা সহ বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণের আয়োজন করেছিল। এই আয়োজন সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে ডিসকাশন প্রজেক্ট, নালন্দা বিদ্যালয়, কসমিক কালচার, বাংলাদেশ নেচার স্টাডি এন্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন দেড় বছর ধরে কার্যক্রম চালিয়ে গেছে।

এই কমিটি তখন থেকেই মনে করেছিল বৈচিত্র্যময় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ একদিকে সাধারণ মানুষ ও সৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মাঝে প্রচন্ড কৌতুহল তৈরি করবে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের আগ্রহ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপি সৌরজগত, মহাবিশ্ব, প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে জ্ঞানের অবারিত দ্বার খুলে যাবে দেশের মানুষের। এর মধ্য দিয়ে কুসংস্কার মুক্ত একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই কমিটি এগিয়ে যাবে। এর সঙ্গে শুরু হবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি মানমন্দির তৈরির প্রচেষ্টা, যা হয়তো খুব বড়ো কিছু হবে না, কিন্তু মহাকাশের দিকে, নক্ষত্রের দিকে তাকানোর প্রতীক হয়ে দেখা দিবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে। যার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য মানমন্দিরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহীরা, তাদের কর্মকা নিয়েও আলোচনা করতে পারবে। এইভাবে ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্ম জ্যোতির্বিজ্ঞানে এগিয়ে যাবে জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা'র মত বিজ্ঞানীদের পথ ধরে- মহাজাগতিক সংস্কৃতির পথ ধরে।

মহামিলনের প্রত্যাশায়

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের একদিন আগে থেকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শিক্ষক, ছাত্র, ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, দোকানদার সবার একই কথা– সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদ। কেন সূর্যগ্রহণ, কী তার তাৎপর্য? মানবজীবনে তার প্রভাব কী? শুধু পঞ্চগড়েই নয়, দেশের সবত্রই মানুষের মধ্যে ছিল একই প্রশ্ন। সবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল এ দেশ থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য শতাব্দীর দীর্ঘস্থায়ী সূর্যগ্রহণের দিকে।

২২ জুলাই রাত ১টা। কিছুক্ষণ আগে নালন্দার শিশুরা, শিক্ষাকর্মীরা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়তে গেছে। খাওয়ার টেবিলের একাকী আমি বসে। ঘুমের প্রয়োজন হলে এখানেই ঘুমাব। এক শিক্ষাকর্মীর (মাহমুদার) সঙ্গে গল্প করছি। অদ্ভুতসব অনুভূতি খেলা করছিল মনের ভিতরে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির শব্দ আর মেঘের ডাক চমকে দিচ্ছিল। বৃষ্টি আর মেঘের কারণে কোনো অঘটন ঘটবে না তো! কারণ আর কয়েক ঘন্টা পর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আমরা শুধু সূর্যকে ঢেকে ফেলার অপার্থিব আঁধার দেখব না। চাঁদ যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তাও চাক্ষুস দেখতে পাব। কেপলারই প্রথম চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখার দৃশ্যের বর্ণনা করেছিলেন। তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন Somnium,'দ্য ড্রিম' নামে। বলা হয় পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন। এটা এই হিসেবেও অনুপ্রেরণাদায়ক যে, সায়েন্স ফিকশনের জন্ম বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন দিকপাল জোহানস কেপলারের () হাতে- গ্রহ গতিবিদ্যার জনকের রচনা। এই গল্পের জন্য তাঁর মাকে মাটির নিচে লোহার গারদে থাকতে হয়েছিল। কেপলারের নিজেরও রাজ গণিতবিদের চাকুরিটা যায়। কেপলার তার সমস্ত গবেষণা ছেড়ে প্রায় ৪০০ নিরাপরাধ নারীকে ডাইনি অপবাদের হাত থেকে বাঁচাতে সংগ্রাম করেছিলেন, সামর্থ্য হয়েছিলেন।

এদিকে এইসব দূর্লভ দৃশ্যগুলোকে ধরে রাখতে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর একটা দল ঢাকা থেকে মাইক্রোতে করে সন্ধ্যা ৬ টার দিকে রওনা দিয়েছে। সাথে দূর্লভ দৃশ্যগুলো দেখতে সবার জন্য চশমা। এই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের গাইবান্ধা ও সৈয়দপুর থামতে হয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। ওইসব অঞ্চলে যেসব ক্যাম্প রয়েছে সেখানে এগুলো সরবরাহ করতে হয়েছিল। ওই মাইক্রোতে বিজ্ঞানকর্মী খালেদা ইয়াসমিন ইতি, অরন্য, সীমান্ত দীপুসহ আরও পাঁচজন ফটোগ্রাফার, রিপোর্টারসহ ছিল ৮ জন। ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে আসা মাইক্রো যখন সিরাজগঞ্জ ছাড়িয়ে গাইবান্ধার পথে, তখন আমি নিজেই বৃষ্টির মধ্যে বাতাসের ঝাপটা অনুভব করছিলাম। কারণ পনে ৪টার মধ্যে ওদের পৌছনোর সময়সীমা ছিল। সাড়ে তিনটা বেজে গেলে নালন্দার শিশু, শিক্ষাকর্মীসহ প্রায় ১০২ জনের একটি দল দুটো বাসে হাড়িভাসা ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। এদিকে অন্ধকারে বোদা ইউনিয়নে অবস্থিত হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডে একা আমি মাইক্রোর অপেক্ষায় রইলাম। রাত ৪টায় ওরা আসল। ১৫ মিনিটে যতটুকু পারা যায় ফ্রেশ হয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। ওদের সঙ্গে আমিও মাইক্রোতে উঠলাম। সাড়ে ৪ টার দিকে ছুটলাম অন্ধকার চিড়ে।

২২ জুলাই, রাত ৪টা। আমরা যখন রাতের অন্ধকার চিরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, হাড়িভাসা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গ্রাম মাধুপাড়ার দিকে। ভেবেছিলাম রাতের অন্ধকারে সাই সাই করে এগিয়ে যাব নির্জন রাস্তা ধরে। ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার, মোটরসাইকেল, রিকশা-ভ্যান, সাইকেল, হেঁটে যাওয়া মানুষের মিছিলের দীর্ঘ সারি দেখে মনে হচ্ছিল তীর্থযাত্রার পথে সবাই। যারা মহামিলনের প্রত্যাশায়, সূর্যের আরাধনার জন্য অক্লান্ত ভাবে হেঁটে চলেছে। শিক্ষিত থেকে অক্ষর জ্ঞানহীন একেবারে গ্রামের ভূমিহীন কৃষকও ছিল। শুধু পঞ্চগড় সদর নয়, পঞ্চগড় হয়ে সূর্যগ্রহণের ফোকাল পয়েন্ট মাধুপাড়া গ্রামের দিকে। এই যাত্রা বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল। তবে গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে তা প্রবল আকার ধারণ করে। রাস্তার দু'ধারে মানুষের বহমান স্রোত আমাকে নিয়ে যেতে থাকে সেলুলয়েডের ফিতার মতো পিছনের দিকে, হাজার হাজার বছর পিছনে। আমি দেখতে থাকি ব্যষ্টি মানুষের হেটে যাওয়ার ছবি। সেই

আদিকাল থেকেই মানুষ তার জীবন-বৃত্তের কেন্দ্রে রেখেছিল সূর্যকে। পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করত নতুন সূর্যের জন্মের মহিমা। আর সেই সূর্য অস্ত গেলে রাতের মধ্যে দেখতে পেত মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। আর তাই যেদিন থেকে চেতনা পেয়েছে মানুষ, সেদিন থেকেই তার কাছে সূর্য ওঠা যেন দেবতার আবির্ভাব। তাই যুগ যুগ ধরে সূর্যের আরাধনা আজো বিশ্বের নানা দেশে নানা ঢংয়ে প্রচলিত রয়েছে।

কেনিয়ার ওমা নদীর তীর থেকে, যেখানে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে হেটেছে লক্ষ বছর ধরে। এরকম কতো দীর্ঘপথ মানুষেরা হেটেছে সময়ের পথ ধরে: ঈজিয়ান সাগরের উপকূল, মিশরের নীল নদ আর ভারতের শিপ্রানদীর তীর হয়ে মেঘনার অববাহিকায়। ৪০ হাজার প্রজন্মের স্বপ্ন নিয়ে বহমান বাতাস আমাকে অণু-পরমাণুতে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিতে লাগল : পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত র হয়ে ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরের সূর্য পর্যন্ত। কিন্তু কিসের সন্ধানে: মানুষ জানতে চায় শিকড়, তার আদি উৎসভূমি। শিকড়ের সন্ধান শুধু পৃথিবীর গ্রামীণ জনপদেই নয়, বাইরেও প্রসারিত করতে হবে। এ দুটোর মেলবন্ধন এক ধরনের উপলব্ধির জন্ম দেবে। তাই আসলে মহাজাগতিক সংস্কৃতি। আর মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধানের তাৎপর্য বোঝার একটি সহজ পথ হলো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। সূর্য চাঁদকে ঢেকে ফেলার সময় যে অন্ধকার তৈরি হয় তা আমাদের মনোজগতে এমন এক প্রভাব বিস্তার করে, যা বলে ওই হলো চাঁদ, যার কারণে জোয়ার ভাটা হয়, এই হলো সূর্য যার আলোর ওপর নির্ভরশীল সমস্ত জীবজগৎ। শত কোটি জীবজগৎকে আলো দিয়ে আসছে।

মহাজাগতিক জাগরণ

এরই মধ্যে আমরা হাড়িভাষা ইউনিয়ন থেকে কাচা রাস্তা ধরলাম। সামনে একটা ভাঙ্গাচোড়া ট্রাক। ট্রাকে কিশোর আর তরুণরা কেউ দাড়িয়ে আছে, কেউ ঝুলে আছে। সরু রাস্তার দুপার্শ্বকে টেনে হিচড়ে চলেছে। যেকোনো মূল্যে নিয়ে যাবে সেই মিলনক্ষেত্রে। যেখান থেকে দেখা যাবে সেই দূর্লভ দৃশ্য। এদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে সময়। কিন্তু সামনে মানুষের মিছিল আর বড়ো গাড়িগুলোর কারণে আমাদের বারবার থামতে হচ্ছিল। এক পর্যায় নিরাপত্তাবাহিনীর বাধার কারণে গাড়ি নিয়ে সামনে বাড়তে পারলাম না। অথচ এই মাধুপাড়ায় ক্যাম্প করার প্রস্তুতি আমাদের ছিল। নালন্দার শিশুদের বহন করা বাসও আমরা হারিয়ে ফেললাম। বাইরে থেকে শুধু কৌতুহলীরাই আসেনি। পুরো গ্রামের মানুষই এই জাগরণে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে সূর্যগ্রহণ দেখার আধুনিক উপকরণ না থাকায় কখনো শহরে লোকদের ওপর তারা চড়াও হয়েছে: বিশেষত যাদের কাছে ফিল্টার চশমা আছে। বঞ্চনা ও বৈষম্যের এটাও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। মানুষ শুধু সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ বাধের আইল ধরে দাড়িয়ে দূর দিগন্তে কিছু একটা দেখছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে মানুষ এক মহাজাগতিক নাটকের অপেক্ষায়।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ শুরু হয় ভোর ৬টা ৫৯ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে, মূল গ্রহণ ঘটেছে সকাল ৭টা ৫৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে এবং তা স্থায়ী হয়েছিল ৮টা ২৫ সেকেন্ড পর্যন্ত। গ্রহণ শেষ বা চাঁদ সম্পূর্ণভাবে সরে গেছে প্রায় ৯টা ২ মিনিটের সময়। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গ্রহণটি ভোর ৭টা ৫৮ মিনিটে হলেও তা উত্তরাঞ্চলের রংপুর, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকা ব্যবধানে ১০/১২ সেকেন্ড আগে-পিছে দেখা গেছে। যখন সূর্য থেকে নেমে যাওয়ার সময় চাঁদের বেড়িয়ে যাওয়া অংশটি যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল তা হতবিহ্বল করে দেওয়ার মতোই। আমার প্রবলভাবে মনে পড়ছিল আজ থেকে ৩০০ বছর আগে কেপলারের গ্রহ গতিতত্ত্বের। কীভাবে বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে এগুলো দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করেছিল। এগুলো ভাবলে এক ধরনের আচ্ছন্নতা ঘিরে রাখে। মূলত মাধুপাড়া অঞ্চলটি গ্রহণের মূল কেন্দ্রীয় রেখার পাশে অবস্থিত এবং এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব হয়েছিল প্রায় ৪ মিনিট। উল্লেখ্য ওই গ্রামের অক্ষাংশ ২৬ ডিগ্রি ২৪.৭২৫ মিনিট, দ্রাঘিমাংশ ৮৮ডিগ্রি ৩৯.৩১৪ মিনিট। এ সময় গ্রহণ পথ বা প্রচ্ছায়ার বিস্তৃতি ছিল ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি এবং তা ঘন্টায় ১০০০ মাইল গতিতে সরে যেতে থাকে।

বাংলাদেশের এ স্থান হতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সর্বোচ্চ সময় ধরে দেখা যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। পূর্ণসূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণে দুটি অঞ্চলকে মুল অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এ অঞ্চলগুলো গ্লোবাল পজিসনিং সিস্টেম যন্ত্রের সাহায্যে নির্বাচন করা হয়েছে। এই অবস্থান দুটির অপরটি হচ্ছে পঞ্চগড় স্টেডিয়াম। এটা ভারতে কেন্দ্রীয় অঞ্চল অতিক্রম করে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, চীন ও জাপানের ওপর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে গ্রহণের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৬ মিনিট ২৭ সেকেন্ডের মতো।

এ দৃশ্য দেখার জন্য দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোর একটি ছিল পঞ্চগড় স্টেডিয়াম। যেখানে সরকারিভাবে আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। পঞ্চগড়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেডিয়ামের অফিস ভবনের ছাদে রাখা মাল্টিমিডিয়ায় ভেসে এল বহু প্রতীক্ষিত সূর্যগ্রহণের প্রথম দৃশ্য। এর কিছুক্ষণ পর মেঘ সামান্য সরে যেতেই দেখা গেল শতাব্দীর শেষ সূর্যগ্রহণের বিরল দৃশ্যগুলো। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ মাল্টিমিডিয়ার পর্দায় দেখানো হয়। ৪টি প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়। হাততালি দিয়ে মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখে দর্শকরা।

নিশাচররা জেগে উঠেছিল চার মিনিটে

আমাদের পূর্বপুরুষেরা জগতকে বুঝতে প্রচন্ড আগ্রহী ছিল কিন্তু তাদের সঠিক পদ্ধতি জানা ছিল না বা আকস্মিকভাবে পদ্ধতিকে খুজে পায়নি। তারা ক্ষুদ্র, অদ্ভুত অথচ মনোরম, যথাযথভাবে সাজানো বিশ্বের কথা ভাবত যার নিয়ামক শক্তি ছিল আনু (Anu), ইয়া (Ea) এবং সামাসের (Shamash) ব্রহ্মার মতো দেবতারা। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কল্পনায় ওই ধরনের বিশ্বে মানুষরা কেন্দ্রীয় না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আমরা প্রকৃতির বাকি অংশের সাথে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কৃমিজাতীয় পোকার বিরুদ্ধে একটি জাদুমন্ত্র যা খ্রিষ্টপূর্ব ১ হাজার বছর পূর্বে এশিরিয়রা দাঁতের বেদনা সংক্রান্ত ঘটনার জন্য দায়ী বলে ধারণা করেছিল। এটা আরম্ভ হয় বিশ্বের উৎপত্তির সঙ্গে ও সমাপ্তি ঘটে দাঁতের ব্যাথার উপশমের মধ্য দিয়ে। মহাজাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে কাছাকাছি তা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পর্যবেক্ষণ থেকেও কিছুটা অনুধাবন করা সম্ভব।

২২ জুলাইয়ের বহুপ্রতীক্ষিত সকালের রাত মাত্র ৪ মিনিট হলেও প্রকৃতিতে বড় ধরনের এক বায়োলজিক্যাল প্রভাব পড়েছিল সবার চোখের সামনেই। যদিও সকাল ৬টা বাজতে না বাজতেই যথারীতি দিনের আলোর পাখিরা খাবারের সন্ধানে ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল। পাকা ফলের বটগাছে কাক-কোকিল আর বসন্তবাউরির আনাগোনা। পোকা ধরে খাচ্ছে ফিঙে আর মেটে আবাবিল। একঝাঁক গো-শালিকের দল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। জমিতে রাখাল হাল চাষে ব্যস্ত। কাঠবিড়ালি লেজ উঠিয়ে চিৎকার করছিল। রাতের পোকামাকড়ের ডাক একেবারেই থেমে গেছে। এসবকিছু অবলোকন করেছিলাম পঞ্চগড়ের মাধুপাড়া গ্রামে গিয়ে।

সূর্যগ্রহণের সময় এক সংক্ষিপ্ত রাত দেখতে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল পূর্ণসূর্যগ্রহণ কমিটির সঙ্গে যুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ নেচার স্টাডি অ্যান্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন ও ডবি-উটিবির একদল স্বেচ্ছাসেবক। তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল সূর্যগ্রহণের সময় প্রাণিজগতের অবস্থা কী হয় তা অনুসন্ধান করা। নেচার কর্মীরা বিভিন্ন পয়েন্টে সবার অগোচরে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণিজগতের চলাচল লক্ষ করছিল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা থাকলেও দিনের আলোটা বেশ ভালোই বোঝা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে হঠাৎ করেই আঁধার ঘনিয়ে এল। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের কয়েক ঘণ্টা আগেই এক পশলা বৃষ্টি নেমেছিল। তাই রাত শুরুর প্রথমেই কোলা ব্যাঙের ডাক কানে ভেসে এল, সঙ্গে ঘুগরি পোকার ডাকও। আমগাছের ডাল থেকে ফুড়ুত করে অন্য ডালে উড়ে গেল নিশাচর পেঁচা। মাধুপাড়া থেকে ভারত সীমান্ত দেখা যায়। সীমানার কোলঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সোলার লাইটগুলো অটোমেটিক জ্বলে উঠল। রাত নামছে দেখে হয়তো সব পাখিই ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোথাও কোথাও নিশাচর শিয়ালও ডেকে উঠেছিল। তারপর আবার যখন ছোট্ট রাত পেরিয়ে দিন এল তখন বেড়ে গেল দিনের জীবনের কর্মচঞ্চলতা। আর নিশাচররা যে যার জায়গায় ফিরে গেল। এই দু'ধরনের প্রাণের দু'রকমের চঞ্চলতা সত্যিই এক বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস দেয়। রাতটা ক্ষণিকের হলেও এর পরিবর্তন প্রায় চোখে লাগার মতোই। একটি রাত ও দিনের মধ্যে কত বিশাল পার্থক্য, কত রকমের জীবন এর ওপর নির্ভরশীল তা টের পাওয়া গেল এই সূর্যগ্রহণের মাধ্যমেই। একেকটি প্রাণীর খাবার আর বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি সময়ই মূল্যবান। রাত ও দিন দুটিই প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। সূর্যগ্রহণের এই স্পন্দন শুধু আলো-আঁধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সব প্রাণেরই অনুভূতিতে এক বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছিল। আর তাতেই বোঝা গিয়েছিল প্রকৃতি ও জীবজগৎ কত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

মানুষ আসলে মহাবিশ্বের সঙ্গে একটি সংযোগ খোঁজে

আদিকাল থেকেই মানুষ তার জীবন-বৃত্তের কেন্দ্রে রেখেছিল সূর্যকে। পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করত নতুন সূর্যের জন্মের মহিমা। আর সেই সূর্য অস্ত গেলে রাতের মধ্যে দেখতে পেত মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। আর তাই যেদিন থেকে চেতনা পেয়েছে মানুষ, সেদিন থেকেই তার কাছে সূর্য ওঠা যেন দেবতার আবির্ভাব। তাই যুগ যুগ ধরে সূর্যের আরাধনা আজো বিশ্বের নানা দেশে নানা ঢংয়ে প্রচলিত রয়েছে। আর তাই দিনদুপুরে আকাশ থেকে সূর্যের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে কালো হয়ে গিয়ে অকাল রাত্রির অবতারণা হলে, মানুষের কাছে তা

অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অশুভ এবং ভীতিপ্রদ বলে মনে হতো। কখনো মনে করা হতো সূর্যগ্রহণ হলো দেবতাদের রোষের প্রকাশ। বর্তমানে মানুষ এক বিজ্ঞানমনস্ক ও সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ ঘটনা অবলোকনে উদগ্রীব। ২২ জুলাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশ জুড়ে।

দেশ জুড়েই বিরাজ করছিল এক ধরনের উৎসবের আমেজ। সানগ্লাস, বাইনোকুলারস, ক্যামেরা ওয়েল্ডিং গ্লাস, এক্সপোজড এক্স-রে ফিল্ম নিয়ে মানুষকে ভোর থেকেই সূর্যের অপেক্ষায় থাকতে হয়। উঁচু টিলায়, খোলা জায়গায়, বাড়ির আঙিনায়, উঁচু ভবনের ছাদে, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সূর্যের অপেক্ষায় মানুষকে থাকতে দেখা যায়। তবে পঞ্চগড় ঘুরে প্রচারণায় কিছু বিভ্রান্তি র ছোঁয়া লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ সচেতনাটার নামে চশমা নিয়ে এমনসব কথা বলছে যা মানুষকে সতর্ক করার পরিবর্তে আতঙ্কিত করেছে বেশি। এছাড়া তার দৈনন্দিন জীবনযাপন এর চেয়ে অনেক বেশি বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে। আরেকটি বিভ্রান্তিকর ভাবনা ছিল, জনসাধারণ ভেবেছেন সাধারণ অবস্থা থেকে গ্রহণের সময় সূর্য অনেক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তাই তাকানো মারাত্মক। সেই কারণে বিকিরণের ভয়াবহতা বেড়ে যাবে এবং চোখের ক্ষতি হবে। বিষয়টি মোটেও তা নয়। এ ঘটনাটি সূর্যেরও কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না, আমাদের জীবনের ওপর তেমন প্রভাব পড়বে না। অবশ্য কোনো সতর্কতাই মানুষ গায়ে মাখেনি। প্রাণভরে দেখেছে পঞ্চগড়ের মানুষ। আর মেঘের যাওয়া-আসা মানুষের চোখকে অনেকটাই রক্ষা করেছে।

কখনো কি ভেবে দেখেছি, নিজেদের অজান্তে পৃথিবী নামের এই গ্রহটির বিভিন্ন দেশে জাতীয় পতাকাতে মহাজাগতিক বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের পতাকায় একটি পূর্ণ সূর্য, তাইওয়ানের পতাকায়ও সূর্য, যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় রয়েছে ৫০টি তারা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইসরায়েলের প্রত্যেকের একটি করে, মিয়ানমারের ৪টি, গ্রানাডা ও ভেনিজুয়েলার ৭টি; চীনের ৫টি; ইরাকের ৩টি; জাপান, উরুগুয়ে, মালয়েশিয়া, ব্রাজিলের একটি মহাজাগতিক গোলক। অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম সামোয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পাপুয়া নিউগিনির পতকায় সাউদার্ন ক্রসের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ; ভুটানের ড্রাগন পার্ল, যা পৃথিবীর প্রতীক; কম্বোডিয়ার অ্যাংকর ভ্যাট যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দির; ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ান পিপলস রিপাবলিকের মহাজাগতিক প্রতীকগুলো। অনেক ইসলামিক দেশ প্রদর্শন করছে পূর্ণ চাঁদ। মূলত জাতীয় পতাকাগুলোর প্রায় অর্ধেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতীকগুলো ব্যবহার করে। এ ঘটনাগুলোকে বলে আন্তঃসাংস্কৃতিক, অসাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ বিশ্বের কথা। এটি কেবল আমাদের কালেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর হতে সুমেরীয় সিলিন্ডার সিল নামমুদ্রায় এবং বিপ্লবপূর্ব চীনের টাউবাদীদের পতাকাগুলোতে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রদর্শিত হয়েছে। জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী কার্ল সাগান বলেছেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে জাতিগুলো, জড়িয়ে ধরতে চায় মহাজগতের ক্ষমতা এবং বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটাকে। আমরা খুঁজে ফিরি মহাবিশ্বের সঙ্গে একটি সংযোগ। এটা বলে যে আমরা সংযুক্ত, জ্যোতিষী বা হস্তবিশারদদের ধারণার মতো ব্যক্তিগত বা কল্পনাশক্তিহীন ছোটমাপে নয়; বরং গভীরতম সব পথে, পদার্থের উৎপত্তি, পৃথিবীর বাসযোগ্যতা, মানবপ্রজাতির বিবর্তন ও গন্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।'

আসুন আমরা সেই আদিম যুগের প্রাচীন মানুষদের মতো বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে এই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করি। তাদের কুসংস্কারটুকু বাদ দিয়ে মানুষের প্রাচীন মূল্যবোধকে জাগরিত করে আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করি এবং মহাজাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে শিকড়ের সন্ধান করি। সেই সম্পর্ক মহাজগতের সঙ্গে মানুষের যখন ঘটে তখন তাকে আমরা বলি মহাজাগতিক সংস্কৃতি। মহাজাগতিক সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠিকে একই কাতারে আনার একটি সহজ রাস্তা। কারণ মাঝখানে চাঁদকে রেখে সূর্য, পৃথিবীর একই রেখা আসায় মানুষের মধ্যে যে ধরনের কৌতুহল দেখা দিয়েছিল তা চিন্তা করলে বোঝা যায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণের মতো একটি ঘটনা কীভাবে সব ধরনের মানুষকে একত্রিত করেছে। সব অঞ্চল থেকে লোক ছুটে এসেছে। বহুকাল ধরে সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী সম্পর্কে এমন সারা দিয়েছে কী না সন্দেহ। এটা আমাদের বোধের সীমানা বৃদ্ধি করবে। লোকঐতিহ্যের সঙ্গে এই চেতনাকে সম্পৃক্ত করে আরও গভীরভাবে শেকড়ের সন্ধান করি– আমরা কে, কোথা থেকে আমরা এসেছি?

সভ্যতার উন্মেষ থেকেই মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে, আমরা কে, কোথা থেকে আমরা এসেছি? এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিইবা কেমন করে? সব প্রশ্নের উত্তর না জানলেও এখন আমরা জানি নক্ষত্র থেকে আমাদের জন্ম। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নক্ষত্র নিজেকে পুড়িয়ে যে ছাই উৎপাদন করে তাই দিয়ে তৈরি হয় আমাদের দেহ। কেননা ওই ছাইগুলো ভারী মৌলিক পদার্থগুলো কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন। সে অর্থে বলা যায় নক্ষত্রের ছাই থেকে আমাদের জন্ম। সূর্য একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের নক্ষত্র। তারই অংশ হিসেবে গ্রহজগৎ, পৃথিবী এসেছে। পরবর্তীতে শতকোটি বছরের রাসায়নিক বিবর্তনে পৃথিবীতে প্রাণ নামক জৈবযন্ত্র এসেছে। তারপর জীববিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় এককোষি থেকে বহুকোষি হয়ে আমরা মানুষেরা এসেছি। মানবজাতি তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। আমরা চিন্তা করতে শিখেছি আমাদের চারিপাশ নিয়ে। আমরা দেখেছি পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সি কি গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে আমরা অনুসন্ধান করে চলেছি আমাদের শেকড় আর বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রসারিত করে

গড়ে তুলেছি নতুন সংস্কৃতি। কেননা লোকঐতিহ্য ভাষা, পরিবেশ, পরিস্থিতি সেখানকার জলবায়ুর দ্বারা নির্মিত। অর্থাৎ আমরা জিনগতভাবে লোক সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এই জলবায়ু সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব, অবস্থান ও ঘূর্ণন গতির ওপর নির্ভরশীল। এই দুইয়ের সংশ্লেষণ ও সম্পর্ক নিরূপণ আমাদের নিয়ে যেতে পারে মহাজগত সম্পর্কে নতুন উপলব্ধিতে। অর্থাৎ লোক সংস্কৃতিকে মহাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে মহাজাগতিক সংস্কৃতি। যেখান থেকে এই অনুধাবন অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক হবে আমরাই প্রকৃতি বা আরো ভালোভাবে বললে প্রকৃতির অংশ। আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও মহাবিশ্বের ক্রমবিবর্তনের ফল। তাই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি ঘটনাবলীর মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রায় এক হাজার দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে 'মহাজাগতিক সংস্কৃতির পথে' শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতায় আমি এই কথাগুলোই বলি। নারায়ণগঞ্জ আইডিয়াল স্কুলের আয়োজনে এটা ছিল ডিসকাশন প্রজেক্ট এর ৫০ ওপেন ডিসকাশন। এর আগে ১৯ জুন একই শিরোনামে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর ৪৯তম ওপেন ডিসকাশনে বগুড়া জেলা স্কুলের মিলনায়তনে প্রায় চারশত দর্শকের উপস্থিতিতে আরেকটি বক্তৃতা দেই। ২০০৯ সালের ১৬ জুলাই হলিক্রস কলেজে আটশ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে ডিসকাশন প্রজেক্ট ৫৪-তম ওপেন ডিসকাশন 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ও মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট' শিরোনামে বক্তৃতা দেই। এগুলোতে আমি উপরোক্ত কথাগুলোর বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেছি।

প্যাগান মূল্যবোধ আমাদের প্রকৃতির বন্দনা করতে শিখিয়েছে এ কথা সত্যি। কিন্তু যে কারণেই ঘটুক একেশ্বরবাদ ধর্মগুলো ক্রমেই তা প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ একেশ্বরবাদ ধর্মগুলো বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে একত্র করতে সামর্থ্য হয়েছিল। এ ধর্মগুলোর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন। কিন্তু উদাহরণ হিসেবে কাউকে পালন করতে দেখলে তার প্রতি দূর্বল হয়, আসক্ত হয়। গণিতের অবরোহী কাঠামোর সঙ্গে এর প্রবল মিল থাকায় গণিতও একে শক্তি জুগিয়েছিল। খুব সম্ভবত সেই কারণে মানুষের খুব স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য যৌনতাকে পৃথক করে ফেলে একেশ্বরবাদীরা। প্রজননের প্রয়োজন না হলে এটা না করাই ভালো। নিস্পাপতার একটা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দাড়ায় যৌনতা থেকে দূরে থাকা। মানুষ ও প্রকৃতি দুটি ভিন্ন ব্যাপারে পরিণত হয়। মানুষকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার বাইরে অনন্য হিসেবে গন্য করা হয়।

সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আধুনিক মানুষেরা ভোগবাদী মানসিকতায় প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, বিজ্ঞানকে নয়। ফলে বিজ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে মৌলিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে শেখায় তা শিখতে আমরা মানুষেরা ব্যর্থ হচ্ছি বার বার। ফলে প্রযুক্তিকে ভোগ করেছি কিন্তু আমাদের মনোজগতের সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না।

প্রাযুক্তিক আচ্ছন্নতা এবং যৌন বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে

অণুজীবের ক্ষেত্রে লিঙ্গের উদ্ভব অর্থাৎ যৌন প্রজনন বা সেক্সের উদ্ভব মহাবিশ্বের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জিতে ঘটনাটি ঘটেছে পহেলা নভেম্বর এবং সত্যিকার হিসেবে ২৪০ কোটি বছর আগে। প্রাণ উৎপত্তিরও দেড়শ কোটি বছর পরে। উচ্চতর জীবন গঠনে দৃশ্যত দুটো লিঙ্গ বা জেন্ডারের প্রয়োজন। আমরা এ দুই লিঙ্গের নাম দিয়েছি মেল বা পুরুষ এবং ফিমেল বা নারী। আর যে পদ্ধতিতে এই দুই লিঙ্গের যোগাযোগে তৈরি হয় নতুন জীবন তার নাম প্রজনন প্রক্রিয়া বা ঝবীঁধষ জবঢ়ৎড়ফঁপঃরড়হ।

এখনো পর্যন্ত জানা সেক্সের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের উৎপত্তি আমাদের ক্ষতিকর মিউটেশনগুলো বর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যৌনতাহীন কোনো জীবের ডিএনএ-তে একটি ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটলে তা সকল পরবর্তী বংশে থেকে যাবে। যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, এদের কেউ কখনো এর হাত থেকে রেহাই পাবে না। অবশ্য একই জিনে অপর একটি পরিবর্তন দিয়ে ত্রুটি মুক্ত পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এগুলোর সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু যৌন জননকারী জীবে নতুন ক্ষতিকর মিউটেশনটি হারিয়ে ফেলা সম্ভব। কেন না, পরবর্তী প্রজন্মে কিছু অধঃবংশে এটি থাকলেও অন্যান্যগুলোতে থাকবে না। কেননা প্রত্যেক প্রজন্মেই জিন সমূহের নব-বিন্যাস একত্রিত হয়ে তৈরি করে নতুন অনন্য জীব এবং অনন্য জিনের মিশ্রণ। বংশানুসৃত বার্তার পুনর্বন্টনই হচ্ছে যৌন প্রজননের মূল ঘটনা। যৌনতা হচ্ছে অমরত্ব। কিন্তু যারা এতে অংশ নেয় সে ব্যক্তিদের জন্য নয়। বরং যে জিনসমূহ তারা বহন করছে, সে সবের জন্য এই

অমরত্ব। যৌনতা বিবর্তনের গতিবেগ বৃদ্ধি করে। কেন মানুষের অবক্ষয় হয় কিন্তু মানবজাতির হয় না? এর উত্তর বংশগতিবিদ্যা দিয়েছে। প্রাণীজগতে নারী পুরুষে বিভাজনের ফলে এত বৈচিত্র্য এসেছে। টিকে থাকার জীবজগৎকে টিকে থাকার শক্তি যুগিয়েছে। জেনিটিক্যালি পরিবর্তন ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণে পৌছতে সহায়তা করেছে। জীবনকে করে তুলেছে আরও বাঙময়। মানব প্রজাতিও বাইসেক্সুয়াল প্রক্রিয়ার ফলাফল। মানুষই একমাত্র প্রাণী যার যৌনতাকে উপভোগ করতে বিশেষ কোনো সময়ের দরকার হয় না।

বিবর্তন প্রক্রিয়া যে বৈশিষ্ট্য আমাদের শরীরের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত। আশ্চর্যের ব্যাপার তাকেই অশ্লিল ও পাপের বিষয় ভেবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সর্বসময় শারীরিক এবং মানসিকভাবে অনুভব করে এবং এর সঙ্গে জন্ম প্রক্রিয়াও নিহীত। এই অবদমনের প্রতিক্রিয়া কি? যে শরীর মনের জন্ম দিয়েছিল সেই শরীর কেন মনের বিরুদ্ধে দাড়াল। কেন একেশ্বরবাদ যৌনতাকে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা থেকে সরিয়ে বিশেষ কিছুতে পরিণত করল? মানুষ প্রকৃতি বা প্রকৃতির অংশ হলেও বর্তমানে এর থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। তার সঙ্গে যৌনতার স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করা বা বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে? প্যাগানমূল্যবোধ থেকে বেশিরভাগ মানুষ কেন একেশ্বরবাদে অনুসারি হলো? তবে এটা ঠিক যৌনতার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে দূরে রাখার ফলে মানব মনে সৃষ্ট তীব্র অবদমনকে কাজে লাগিয়ে যৌনতা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্যিক অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। যে যৌনতা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আমাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তি তাকেই প্রলোভনের অস্ত্র হিসেবে পরিণত করল। অপ্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে পণ্য কেনার কাজে ব্যবহার করল। বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনেও তার ব্যবহার অবাধ অবস্থায় চলে এসেছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাকে আরও ভয়ংকর আবেদনময় করে তুলেছে।

সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আধুনিক মানুষেরা ভোগবাদী মানসিকতায় প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, বিজ্ঞানকে নয়। ফলে বিজ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে মৌলিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে শেখায় তা শিখতে আমরা মানুষেরা ব্যর্থ হচ্ছি বার বার। ফলে প্রযুক্তিকে ভোগ করেছি কিন্তু আমাদের মনোজগতের সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না। গ্রহ-নক্ষত্র, মহাবিশ্বের বিশালতার সঙ্গে নিজের জীবনকে সম্পৃক্ত করতে পারে নি। আর এর অন্যতম কারণ হলো বিজ্ঞান ও আমাদের সামাজিক অভ্যাসগুলোর ছন্দহীনভাবে চলা। তাই সম্ভবত স্নায়ু মনোবিজ্ঞানী জেমস. ডব্লিউ. প্রেসকট ৪০০ শিল্পউন্নত নয় এমন সমাজের একটি বিস্ময়কর আন্তসাংস্কৃতিক পরিসংখ্যানিক বিশে-ষণ সম্পাদন করে দেখিয়েছেন, যে সংস্কৃতি শিশুর প্রতি পর্যাপ্ত মায়া-মমতা প্রদর্শন করে সে সব শিশুরা সহিংসতার প্রতি আসক্ত থাকে না। এমন কি যে সমাজগুলোতে উলে-খযোগ্য আদর-যত্ন পায় না শিশুরা সেখানেও বড়ো হতে পারে সহিংসতা ছাড়া, যদি বয়ঃসন্ধিতে যৌন ক্রিয়াকর্মকে অবদমিত করা না হয়। মহাজাগতিক ঘটনাবলী এবং রাসায়নিক ও জীববিবর্তন ধারণা ছাড়া এ বিষয়গুলো উপলব্ধিতে আনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই ধারণাগুলোকে আয়ত্ব করার সবচেয়ে যৌক্তিক পথ হচ্ছে বিজ্ঞান।

বিখ্যাত জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী কার্ল সাগান তাই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বকে বোঝার জন্য আজ আমরা শক্তিশালী ও চমৎকার পথ আবিষ্কার করেছি। এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞান বলে। এই পথ বিশ্বকে আমাদের কাছে এত প্রাচীন আর বিশাল হিসেবে প্রকাশ করেছে যে মানবীয় ব্যাপার বা বিষয়গুলোকে খুব ছোট মাপের মনে হয়। মহাবিশ্বের ধারণাকে দূরে রেখেই আমরা বেড়ে উঠেছি। প্রাত্যহিক ভাবনা থেকে মহাজাগতিক ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক বা অপ্রাসঙ্গিক এবং অতিদূরের বলে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু এটিই আবিষ্কার করেনি যে বিশ্বের শুধু বিকাশ উম্মুখ সৌন্দর্য্য রয়েছে বা এটি মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র অনুধাবন করাই সম্ভব নয় বরং এটিও দেখিয়েছে যে অত্যন্ত বাস্তব এবং নিগুঢ়ার্থে আমরা মহাবিশ্বের একটি অংশ, আমরা জন্মেছি এটি থেকে, আমাদের নিয়তি বা ভাগ্য এটির সাথে জড়িত বা যুক্ত। মানবেতিহাসের সবচেয়ে মৌলিক ঘটনা এবং পিছনের তাৎপর্যহীন অতি সাধারণ ঘটনা, এ সবকিছুই এই মহাবিশ্ব এবং তার উৎপত্তির সাথে জড়িত।

সূত্রঃ ২০০৯ সালের ১৬ জুলাই হলিক্রস কলেজে ডিসকাশন প্রজেক্ট ৫৪- তম ওপেন ডিসকাশন 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ও মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট'। দর্শক সংখ্যা ছিল আটশ।

২০০৯ সালের ২১ জুন নারায়ণগঞ্জ জিয়া হলে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর ৫০ ওপেন ডিসকাশনঃ 'মহাজাগতিক সংস্কৃতির পথে'। দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার।

১৯ জুন বগুড়া সায়েন্স ক্লাবের আয়োজনে বগুড়া জেলা স্কুলের মিলনায়তনে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর ৪৯তম ওপেন ডিসকাশন। দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় চারশ।

২০০৯ সালের ১৫ জুলাই গাজিপুর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর ৫৩ ওপেন ডিসকাশন 'পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ও মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট'। দর্শক সংখ্যা ছিল ৪০০

মহাজাগতিক আলোয় ফিরে দেখা-আসিফ, সময় প্রকাশ ২০০৩; কসমস- কার্ল সাগান

কৃতজ্ঞতাঃ খালেদা ইয়াসমিন ইতি, আবদুর রাজ্জাক, যোয়েল কর্মকার, সীমান্ত দীপু, সুমনা বিশ্বাস এবং ডাঃ জেনিথ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নে ও বিনির্মাণে

রুশো তাহের

ডিজিটাল জগৎ কী?

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত, ভাষার আক্ষরিক রূপ সৃষ্টি, কাগজ প্রস্তুত, ছাপাখানার উদ্ভব প্রভৃতি শুরু হলে মানুষ সহজে তার ভাব ও ধারণা শুধু ভবিষ্যতের জন্য নয়, তার অবস্থান থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ ও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। উপান্ত, তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের প্রযুক্তির এখন পর্যন্ত চারটি পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটেছে। যথা- দূত এবং পোস্টাল সার্ভিস, যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সার্ভিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশন। টেলিকমিউকেশনের প্রেরিত তথ্য, কথা, টেক্সট বা ছবি প্রথমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎ চুম্বক সংকেতে রূপান্তরিত হয়। তারপর দূরবর্তী কোনো প্রাপকের কাছে সেই সংকেতগুলো পৌছে এবং পৌছানোর পর তা প্রাপকের মেশিনে পুনরায় তথ্য, কথা, টেক্সট বা ছবিতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় এনালগ। কিন্তু এতে খুব বেশি দূরবর্তী স্থানে সংকেত পাঠানোর ক্ষেত্রে এবং একই সঙ্গে অনেক তথ্য পাঠাতে বিশেষত

নয়েজিং এর মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যা উত্তরণে উদ্ভাবিত হয় ডিজিটাল টেকনোলজি। উল্লেখ্য, ডিজিটালে বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা পালস দ্রুত সিরিজে চলে। প্রতিটি পালস বাইনারি ১, এবং পালস না হলে বাইনারি ০-তে পরিণত হয় অর্থাৎ বাইনারি ডিজিট বা বিটে পরিণত হয়। ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার যেকোনো একটিকে ডিজিট বলে। আর ডিজিটাল হলো এসব অঙ্কসংক্রান্ত বা সংখ্যাঘটিত বিষয়-আশয়। এতে সব ধরনের তথ্য ডিজিটাল স্পন্দন বা পালস হয়ে চলাচল করে এবং পুনরায় পূর্বেকার তথ্যে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থায় ফাইবার অপটিক ক্যাবল নামে বিশেষ তার ব্যবহৃত হয়। যাতে প্রতি সেকেন্ডে ৫ বিলিয়ন বিট তথ্য প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ডিজিটাল টেকনোলজির আওতায় কম্পিউটারের মাধ্যমে আন্তঃ কম্পিউটার যোগাযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, ই-মেইল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। বস্তুত, এর মধ্য দিয়ে ইনফরমেশন সুপারহাইওয়েতে প্রবেশ করা হয় অর্থাৎ তথ্য প্রবাহের বিশাল ও দ্রুত সরণিতে প্রবেশ করা হয়। গবেষকরা বিশেষত নেটওয়ার্কিং টেকনোলজিতে বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের সব কর্মকাণ্ডকে অতিদ্রুত ও নিখুঁতভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা সম্ভব। কর্মযজ্ঞের এই জগৎকে বলা হয় ডিজিটাল জগৎ। বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের চিরচেনা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্থান-নিরপেক্ষ বা দেশ, মহাদেশ এমনকি পৃথিবী-নিরপেক্ষ এক জগৎ হলো ডিজিটাল জগৎ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কী এবং কেন?

ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, তা বুঝতে ডিজিটাল রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। বস্তুত কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে কোনো দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে সেই দেশকে ডিজিটাল রাষ্ট্র বলা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সবক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতি প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি দ্বারা। বাংলাদেশকেও ই-গভর্নেন্স, ই-সিকিউরিটি, ই-এডুকেশন, ই-এগ্রিকালচার, ই-হেলথ, ই-কমার্স, ই-ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ই-ডেভেলপমেন্ট, ই-এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ই-জার্নালিজম, ই-ট্রাফিক সিস্টেম প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ডিজিটাইজড অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা যায়। আসলে এর ফলে দেশের এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও ডিজিটাল টেকনোলজির বাইরে থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাজারো সমস্যায় জর্জরিত উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে কেন হঠাৎ করে সব ইস্যুর পরিবর্তে ডিজিটাইজড হওয়াকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। আসলে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে হচ্ছে সূর্যের মতো। তাই সূর্যের আলো যেমন ধনী-দরিদ্র সবাই নির্বিশেষে ব্যবহার করতে পারে তেমনি ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের মূল স্রোতে শামিল হতে পারে। বলতে কি, উন্নত বিশ্ব নয়, বরং বাংলাদেশের মতো অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশকে সবার আগে ডিজিটাইজড হওয়া জরুরি। কারণ আমাদের সম্পদ সীমিত, কিন্তু চাহিদা ব্যাপক এবং তা বাড়ছে অব্যাহতভাবে। আমাদের জমি বাড়ছে না, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে, ফলে চাহিদাও বাড়ছে। পৃথিবীতে এতো ছোট্ট আয়তনের দেশ হয়েও বাংলাদেশ প্রায় পনের কোটি মানুষের আবাসস্থল। আমরা কারো দেশ দখল করতে পারব না সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। বাঙালির নীতিও তা নয়। কিন্তু ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-এ প্রবেশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাপি বাঙালি জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে। কারণ এর কোনো সীমানা নেই। এমনকি মহাশূন্যেও আমাদের দেশের সীমানা বিস্তারের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

কোনো দেশের রাজধানীর গতিশীলতার উপর নির্ভর করে সেই দেশের উন্নয়ন। কারণ রাজধানী হচ্ছে দেশের সেন্ট্রাল নার্ভ। প্রায়শ সেখানকার কোনো ব্যাক্তির এক ঘণ্টা সময়ের মূল্য মফস্বলের কারো একমাসের সময়ের মূল্যের সমান। বস্তুত আধুনিক সময়-অর্থনীতি বা টাইম ইকোনোমিক্সের মূলভিত্তি কিন্তু নগরের অধিবাসীদের সময়ের অর্থমূল্যে। যা হোক, পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি ঢাকা। অথচ এটি স্থবিরতায় পৃথিবীর সব মেগাসিটির শীর্ষে। এর ট্রাফিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কর্মব্যস্ত নগরবাসীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মঘণ্টা শ্রেফ গচ্চা যাচ্ছে প্রত্যহ। শতকরা ২৫ ভাগ রাস্তার স্থলে মাত্র ৭ ভাগ রাস্তায় ধারণ ক্ষমতার চাইতে ৮ গুণ বেশি যানবাহন চলাচল করে। তার বেশির ভাগ আবার অযান্ত্রিক রিক্সা ও যান্ত্রিক প্রাইভেট কার। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে স্বভাবতই আমরা ট্রাফিক ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশান-এর উপর জোর দিতে প্রয়াসী হব। তবে গবেষণায় দেখা যায়, প্রথমে ট্রাফিক সিস্টেমকে ডিজিটাল আমব্রেলার অন্তর্ভুক্ত না করে বিকল্প পথে এগুতে হবে। অন্য যেসব সেক্টর সরাসরি ট্রাফিক সিস্টেম কিংবা সেই অর্থে ঢাকার গতিশীলতায় প্রভাব রাখে, সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাইজড করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাইলট সেক্টর হিসাবে ই-এডুকেশন ও ই-অফিসের কথা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। প্রথমে ঢাকার বড় বড় সব স্কুল ও কলেজকে ডিজিটাল করা যেতে পারে। এছাড়াও ই-এডুকেশনের বিস্তার সারা দেশে ঘটানো সম্ভব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-নেটের মাধ্যমে। যেমন, ঢাকার প্রথম সারির স্কুল ও কলেজগুলোকে ডিজিটালাইজড করে এর সার্ভিস সুদূর নিঝুমদ্বীপেও পৌঁছানো সম্ভব। এতে করে গ্রামাঞ্চলের মেধাবি শিক্ষার্থীদের রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন ডিগ্রি অর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত হয়ে যাবে। এমনকি পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয়কে ডিজিটাইজড করে ভর্তি আহবান করা যেতে পারে। একে আমরা পাইলট প্রকল্প বলতে পারি। এ প্রকল্পের আওতায় ওইসব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের নোটবুক সাইজের ল্যাপটপ সরবরাহ করে তাদের ডিজিটাল আমব্রেলায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ধারণক্ষমতার কয়েকগুণ বেশি শিক্ষার্থীর গাদাগাদি অবস্থান অন্তত থাকবে না। যাহোক, ডিজিটাল ভাবনায় আমরা একা নই। এই প্রমাণই মিলে প্রতিবেশী দেশ ভারতের ১৮,০০০ কলেজ ও ৪০০ বিশ্ববিদ্যালয়কে ই-লার্নিং বা ই-এডুকেশনের আওতায় আনার উচ্চাভিলাষী কর্মসূচিতে। ই-লার্নিং এর অবকাঠামো নির্মাণের অংশ হিসেবে ওইসব কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভারত সরকার মাত্র ৫০০ রুপিতে ল্যাপটপ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রামপ্রধান ভারতের এই ই-প্রোগ্রাম প্রকল্পভিত্তিক মডেল চালুকরণে আমাদের সাহায্য করবে। বস্তুত ভারত তার ই-লার্নিং কর্মসূচিতে নেটওয়ার্কিং কমিউনিকেশন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কীভাবে করছে, তা বাস্তবে জানতে বাংলাদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ পাঠানো যেতে পারে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার আশা করে এর মধ্যদিয়ে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ডিজিটাল বিভাজনে সেতুবন্ধন নির্মিত হবে। বাংলাদেশেও ডিজিটালি শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমনকি একজন দিনমজুরের সন্তানও উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এতে শিক্ষার্থীদের স্কুলে বা কলেজে যেতে হবে না। বাসায় বসেই ই-পদ্ধতিতে শিক্ষকের লেকচার থেকে পাঠ নিতে পারবে। এর ফলে পিক আওয়ারে যানজট অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ কমে যাবে। ই-অফিসের ক্ষেত্রেও দৈহিকভাবে অফিসে না গিয়ে যথাসময়ে কাজ ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে কোনো ফাইলও আটকে থাকবে না। তখন অবশ্য গতানুগতিক ফাইলিং সিস্টেমও থাকবে না। আসলে কমিউনিকেশন ও ফাইলিং সিস্টেমটাই প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায়। তারপরও কাগুজে ব্যবস্থার পুরোটা অন্তত এ মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। এর কারণ মৌলিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমানতালে নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তির অগ্রগতির অভাব। দ্বিতীয়ত, প্রজাতি হিসেবে আমাদের বিকাশ কিন্তু এনালগ পদ্ধতিতে। তাই হঠাৎ করে শতভাগ ডিজিটাল ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি মানুষের অভিযোজন ক্ষমতায় মারাত্মক ডিজঅর্ডার সৃষ্টির কারণ হতে পারে। উপর্যুক্ত বিষয় আমলে না-নিয়ে বাংলাদেশের অনেক আইসিটি বিশেষজ্ঞ কাগুজে ব্যবস্থা পুরোপুরি বাদ দেওয়ার মতো ভুল ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন হরহামেশা। ই-অফিস ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমের অফিস ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনায় দৃষ্টান্ত হতে পারে। আসলে এসব বিষয়ভিত্তিক সেক্টরকে ডিজিটাইজড করতে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণেও অত ঝক্কি-ঝামেলা হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থার সুফল হিসেবে প্রথমেই যানজট থাকবে না। এর সঙ্গে ফুয়েলবার্নিং দূষণও কমে যাবে। তেল আমদানিতে অর্থ সাশ্রয় হবে। এমনকি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে দ্রব্যমূল্য ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর। বস্তুত এভাবে পর্যায়ক্রমে সেক্টর ও শহরভিত্তিক ডিজিটাইজডকরণের মধ্য দিয়ে মাত্র একদশকে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল দেশ। আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এটা করতে হবে। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ দূরের স্বপ্ন নয়, নিকট বাস্তবতা।

ডিজিটালি কমপ্যাক্ট ভিলেজশিপ

বাংলাদেশে গ্রাম সম্প্রসারণ মানে নতুন নতুন বাড়ি নির্মাণ, পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, সড়ক যোগাযোগের বিস্তার সর্বোপরি নগরায়ণের অনিবার্যতায় আবাদি জমি দ্রুত কমে যাচ্ছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে গ্রামগুলো কাছাকাছি আসতে আসতে মধ্যবর্তী মাঠ রীতিমতো হারিয়ে গেছে। তাই আবাদি জমি রক্ষায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণে সচেতনতা ইতোমধ্যে এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এদিকে গ্রামীণ আবাসন সম্প্রসারণের হাত থেকে আবাদি জমি রক্ষায় গবেষকরা কমপ্যাক্ট ভিলেজশিপ'র কথা চিন্তাভাবনা করছেন। আরও মজার বিষয় হলো, বাংলাদেশে এ তত্ত্বের প্রয়োগ সহজে করা সম্ভব। যার প্রয়োজনও এখানে বেশি। কমপ্যাক্ট ভিলেজশিপের অর্থ হলো গ্রামের বাড়িগুলোকে একক ধরে প্রথমে বাড়ি, এরপর পর্যায়ক্রমে গ্রাম, ওয়ার্ড এমনকি ইউনিয়নকে কাছাকাছি এনে কোনো উপজেলার নিদেনপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ জমিকে অনাবশ্যক আবাসনের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব। অর্থাৎ উপজেলার বাকি শতকরা ২০ ভাগ জায়গায় মোট জনসংখ্যার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। উল্লেখ্য, এতে গ্রামীণ জীবনযাপনও ব্যাহত হবে না। কোনো কোনো গবেষণায় দেখা যায়, এমনকি মাত্র শতকরা ৫ ভাগ জায়গায় ঐ উপজেলার মোট জনসংখ্যার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। এতেও কিন্তু গ্রামীণ জীবনযাপন অক্ষুণ্ন থাকবে। বিষয়টি হচ্ছে, কত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত তথ্য এক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কমপ্যাক্ট ভিলেজের সঙ্গে ডিজিটাল ভিলেজ সেই অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্পর্ক কী? আসলে কমপ্যাক্ট ভিলেজে দৃশ্যমান অবকাঠামো যথা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, গবেষণাগার পাশাপাশি ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সহজে ও কম ব্যয়ে নির্মাণ করা সম্ভব। দৃশ্যমান অবকাঠামোতে বেশি দেখা যায় স্থাপনাকে, আর ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের চেয়ে এর মাধ্যমে কাজই দেখা যাবে বেশি। বস্তুত এখানে নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তির মেট্রোপলিটান এরিয়া নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। এমনকি ঐ নেটওয়ার্ককে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসরণিতেও যুক্ত করা যাবে। যার ফলে বাংলাদেশের সুদূর একজন গ্রামবাসীও গ্লোবাল ভিলেজের অধিবাসী হতে পারে। আবার, এর মধ্যে দিয়ে কমপ্যাক্ট ভিলেজের অধিবাসীরা গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেও ঢাকায় চাকরি করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে কাগুজে প্রয়োজনে মাসে একবার এমনকি বছরে একবার হয়ত ঢাকায় আসতে হবে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে তাকে এক পর্যায়ে ঢাকায় আসতে হবে। যেমনটি আগে উল্লেখ করেছি, গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িকে একক ধরে কমপ্যাক্ট ভিলেজ তথা ডিজিটাল ভিলেজ স্থাপন করতে গেলে 'জান দেব জমি দেব না' এই ইস্যুতে রক্তারক্তি বেধে যাবে। তাই অনাবশ্যক ঝামেলা এড়াতে ডিজিটাল ভিলেজ স্থাপনে খাসজমি কিংবা প্রায় পরিত্যক্ত চর এলাকা বেছে নেওয়া যেতে পারে। আনন্দের সংবাদ হলো, একবার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হলে পরবর্তীতে বিনা রক্তপাতে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশ পরিণত হবে কমপ্যাক্ট ভিলেজ তথা ডিজিটাল ভিলেজ প্রধান বাংলাদেশে। যেহেতু, মানুষ শুধু কোনো স্থান বা দেশের নাগরিক নয়, একই সঙ্গে কালের নাগরিক। অর্থাৎ, সে কোন কালে জন্মগ্রহণ করেছে, তা-ও বিবেচ্য। আর আমাদের উত্তর পুরুষেরা কালিক পরিচয়ে পূর্বপুরুষ অপেক্ষা বেশি প্রভাবিত হবে। মানে তারা কোন দেশে জন্ম নিল তার চাইতে কোন কালের মানুষ তা বেশি ব্যবহার করবে অথবা সেই পরিচয়ে নিজেকে জাহির করবে। তাই ডিজিটাল ভিলেজ তৈরিতে ভবিষ্যতে রক্তারক্তি হওয়ার আশংকা নেই।
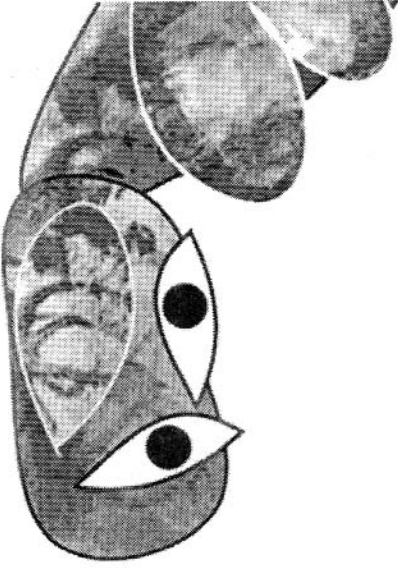
পঙ্‌ক্তিমালা

মনজুরে মওলা

বন্ধু

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
কোথায় চলেছো তুমি,
সন্তান আমার ?
সারা গায়ে ধুলো মেখে,
ঝরিয়ে মাথার ঘাম পায়ে,
রোদে পুড়ে, ভিজে তুমুল বৃষ্টিতে
কোথায় চলেছো তুমি,
কোন দূর দেশে ?

সন্ধ্যা নেমে আসে ;
রাত গাঢ় হয় ;
কিছুই যায় না দেখা চোখে ;
শরীর অবশ হয়ে আসে ;
ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ;
তোমার চলার তবু শেষ নেই,
দু হাতে রয়েছো আঁকড়ে
ঘোড়াটির গলা,
পড়ে যেন না যাও কখনও ।
কোথায় চলেছো
ও ঘোড়ায় চড়ে ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছোড়ে
ক্ষুব্ধ কিছু গাছ ।
ল্যান্ড-মাইন পুঁতে রাখে
রুদ্ধ কিছু পথ ।
ছোঁ মেরে হঠাৎ নামে
বাজ, চিল, বিদ্যুত, ঈগল ।
পারে না কিছুই
থামাতে তোমাকে ।
তোমার ঘোড়ার শব্দ
শোনা যায় দূর থেকে দূরে ।
যেখানেই যাওয়া যাক পৃথিবীর,
ওই শব্দ তাড়া করে ফেরে ।

একদিন তোমারই মতো
অমন ঘোড়ায় চড়ে
আমিও গিয়েছি ।
ভেবেছি, পৃথিবী তার
সব ফুল দিয়ে
সব রঙ দিয়ে
আমাকে মেঘের মতো
নিয়ে যাবে দেশ থেকে দেশে ।
আজ জানি, ফুল বলে
কিছু নেই, রঙগুলো তৈরি
মানুষের, এমন-কি মেঘও নেই
অপার আকাশে ।

কোথায় চলেছো, বন্ধু,
কোথায় চলেছো ?

কিন্তু তুমি

পৃথিবীতে কত সূর্য কত চাঁদ উঠল, আর
ঝরে পড়ে গ্যালো।
কিন্তু তুমি
সেই– যে দিয়েছ দেখা একান্ত আকাশে,
আর অস্ত যাবে না কখনও।

পৃথিবীতে সভ্যতার কত রূপ কত বাঁক
কত ছেলেখেলা দ্যাখা গেল।
কিন্তু তুমি
সেই– যে গিয়েছ স্থির করে সংজ্ঞা তার,
তা থেকে পৃথিবী
পারবে না কখনও আর দূরে সরে যেতে।

রাতে

জীবনের কাছে বড়ো অপরাধই করেছি,
যেহেতু আকাশ থেকে আচমকা পড়েছি,
বৃষ্টির মতো তো নয়, তুষারের মতো,
পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে ছেলে-বুড়ো যত।

সব চেয়ে বেশি পড়ছে ছেলেরা আমার।
ঠ্যাং ভাঙছে সব চেয়ে মেয়েরা আমার।
মাফ চেয়ে লাভ নেই তোমাদের কাছে –
তোমাদের ঘিরে শুধু ভূতই তো নাচে।

কালো ভূত, সাদা ভূত, হাত বড়ো-বড়ো :
খড়কুটো, ডাল-পালা করে যাচ্ছে জড়ো।
চোখ রাখে চার দিকে, একটু ফাঁক পেলে
বিশাল আগুন দেবে জ্বেলে।

তোমরা চোখে দ্যাখো না তাদের।
বয়ে যায় তারা শুধু আমাদের জের –
যেহেতু জন্মেছি আমরা তোমাদের আগে
যখন পৃথিবী ছিল ভরা কুমির, শুয়োর আর বাঘে।

আমরা বুনো লোক।
সভ্যতা সম্পূর্ণ হোক
তোমাদের হাতে –
ঘন রাতে।

অরুণাভ সরকার

ভ্রান্তি

তিনদিন তোমাকে দেখিনি
দিন নয়– হয়তো সপ্তাহ, মাস বা বছর
হয়তো তেত্রিশ, তিনের বদলে
মানে বহু বহু দিন
বহু দিন কিংবা তিন দণ্ড আগে
আমার কণ্ঠে তোমার হাত
হয়তো তিন সেকেন্ড আগে
এখনও সেই হাতের উষ্ণতা, উম আমার শরীরে।

সময় আসলে এক ভ্রান্তি
ভুল সময় এই আঙুলে।

তুহিন তৌহিদ

প্রজাপতিঘুড়ি

আমার যে হাতে ছিল ঘুড়ির নাটাই
আমি সেই হাতটাকে গুটিয়ে নিয়েছি, আর
সুতো কেটে দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি ঘুড়িটির দিকে।
দেখছি, ঘুড়িটা ঠিক প্রজাপতি হয়ে গেছে

প্রিয় প্রজাপতিঘুড়ি, তুমি কেন সারাক্ষণ চারপাশে ওড়ো?

জাহিদুল হক

কে আমার প্রিয় তোর মতো

তুমি কী রকম প্রিয়, ভালোবাসাগুলো ভরা,
আমি শুষে নিই সুরভি তোমার যত ঝরা;
আরো পাতাঝরা তাকেও কুড়োই চিরকাল;
শতক, হাজার বছরের স্মৃতি– কতকাল?

হোক, কবরের বাড়ি চারদিকে ডাক পাড়ে,
বিধূর কাফন তার ভাঁজ খোলে আড়ে আড়ে;
হোক শ্রাবণের প্লাবনের ধারা– তুমি আছো,
আমি পেয়ে গেছি আমার হৃদয়ে তার আঁচও!

শুধু যদি ভোলো, যদি খুলে যাও ওই দোর,
কারুকাজে ভরা সিস্তিন জুড়ে হবে ঘোর;
আঁধারেরা হয় আরো আঁধারের কালো বাড়ি,
যদি তুমি বাতিঘর না থাকো তো, ভুলি পাড়ি।

দ্যাখো, জীবনের ভাঁজে ভাঁজে কত ক্ষতফুল
ফুটে থাকে তারা, দুঃখের বাঁকে ভাঙে কুল;
দ্যাখো, তুমি, এই দুটো চোখ জ্বলে কতকাল,
তোমাকেই ছোঁব বলে উড়িয়েছি কত পাল।

দ্যাখো, দিনগুলো খঞ্জের মতো হেঁটে যায়,
রাতগুলো যেন রোগিদের মতো কাৎরায়;
মনে নেই যেন প্রতিশ্রুতির কথাগুলো
দূর কর্দোভো কী করে উড়ালো এত ধুলো?

ও চাঁদ, কে তুমি, কী রকম করে ভাঙে ঘুম?
কবর গর্তে লাশ ফেলে কারা করে ধুম?
আত্মার কাছে কার কথা ফোটে এই রাতে,
আহা, অনিকেত প্রেমগুলো এল কাৎরাতে?

আজ লাভ নেই, এই লোকসানে তুমি নেই,
অস্তিত্বেরও ভেতরের দিকে তুমি নেই ?
বিধূর গারদ, খুবই পাশবিক হয়ে ওঠে
আহা, মনে রাখি শুশ্রূষা ছিল তোর ঠোঁটে !

খন্তার ধ্বনি ঝুরঝুর করে মনটাতে.
নামে অটমের ঝড় হলুদাভা গানটাতে ;
ফুরোয় সামার ! দিগন্ত জুড়ে ম্রিয়মান
কুয়াশায় কালো লোবানেরা জ্বলে, কাঁদে প্রাণ।

আমি খুঁজে মরি গন্ধ তোমার তবু কেন ?

পতনের স্বর জুড়ে নদীটাকে তুলে আনো ;
তুমি চিরকেলে বাগানের সেই প্রিয় ফুল
উপমায়িতও হও রুধিরে কি ? গড়ো কুল।
থাকো, ঘরে থাকো, শোকেদের খোপে স্মৃতিজুড়ে,
কালের বাতাসে যদি সব ধন যায় উড়ে;
থাকো রক্তের ভেতরেও– স্রোতে– খুব করে
পঙ্ক কি পুঁজে ভাঙা হৃদয়ের ঘন জ্বরে।

থাকো, কেন যাবে ? যদি যাও তুমি, তবু থাকো,
তুমি স্মৃতিদের বুকপকেটকে ভরে রাখো ;
যে রকম করে গোলাপকে দিতে সুরভিটা
ফের দিও তা-ও– দুয়িনো কে তার পুরবীটা।

আর যদি তুমি না থাকো তো, জেন, দেব রেখে
ভোরের শিশিরে গোধূলির রঙে রঙ মেখে ;
উপমার কোনো প্রিয় ভাঁজ ব্যপে, কোনো সুরে
দূরগুলো শুধু কী অদূর করি বুক কুঁড়ে !

তুমি ভুলে গেছ, মনে রাখো, না কি, কবিটিকে
অজস্র সব আমাদের আশা হলো ফিকে ;
সারি সারি বচলে এ-সকল যান– তারা কারা ?
যেন মৃতদের ব্যথাগুলো নিয়ে দিশেহারা।

যাব যতটুকু, আমি কবিতাকে তারও চেয়ে
পাঠিয়েছি দূরে– হাহাকারে ভরা স্মৃতি বেয়ে ;
স্পর্শ কি পাও শরীরের কাছে তুমি তার
স্নায়ুদের ব্যথা পেয়েছ কি তুমি ক্ষুরধার ?

হৃদয়, কী করি ! অদূরকে দূর চিরকাল
আমি কি করি ? রোদনের তোড়ে কী মাতাল ?
তবু কেন ডাকি ফের ভাঙা ঘরে– এসো, এসো,
জুড়োবে ও জোড়া লাগবে তো, যদি ভালোবাসো।

এই, ভালো আছো, হাত রাখো আজ, তুমি, যাতে
বিলাপের মতো জাগতেও পারো ঘন রাতে ;
কী কথা এখন ? তার চেয়ে ভালো নিশ্চুপ,
খুব পুড়ে যাব– যেন তোমাকেও করি ধূপ !

কবরেরা হবে বাগানের যত ফুল-ফোটা,
পতাকার মতো শোকগুলো ছোঁবে নীলিমাটা ;
শঠিত মাংস, স্মৃতি-মজ্জারা মাথা তুলে
ফের আমাদের প্রিয় বাড়িটাকে দেবে খুলে।

আমি শুষে নেব মতো আছে তোর সুরভিরা,
স্পর্শে তো তোর কী ফেনিল হবে কালো শিরা;
সব ধসগুলো পাতাঝরাগুলো কুড়াব তো,
বল্, ভাঙনেও কে আমার প্রিয় তোর মতো !

শিহাব সরকার

মেঘের সঙ্গে

চিলতে মেঘ ধূসর মেঘ জমেছে আজ বনের ওপর
ছিল একদিন পত্রতৃণে ছাওয়া ঘর,
আকাশ এবং ভুবন জুড়ে নীল কার্নিভাল খেলা
এই সমাচার কে না জানে, নরম যখন বেলা।

যদিও সবাই ভূতগ্রস্ত, টালমাটাল আদি গুল্মরসে
অরণ্যচারী জেগে থাকে; নিঝুম মাঠে চাঁদের শস্য চষে।

দেখতে দেখতে বাদুড়ে নীল খেয়েছে চেটেপুটে
আকাশ চেনে কোন মুসাফির, বিনীত করপুটে
ধরেছে প্রথম বর্ষা ফোঁটা এবং হারালো দুর্যোগে
চিলতে মেঘ মনভোলানি; দেখছি প্রবল শোকে।

ধেয়ে আসছে পঙ্গপাল, অন্যদেশে সকাল-সন্ধ্যা হিম ঝরছে
জাহাজে নোঙর, বণিক প্রসন্ন জীবন ধন্য, উড়ছে
সাত সাগরের কূলে এবং এলাচবনে রক্ত-সুরার জয়ন্তী
রাত্রি তখন ভিন গোলার্ধে, দল বেঁধে সব করছে সন্ধি।

দূরের দেশে নবান্নের ধুম, শান্ত ঝোরায় খোঁপার ফুল
জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিকেল মাতায় সুগন্ধী চুল

মেঘ বলে ও আসবে ওড়ে সুসময়ে, মেনেছি তা এই
বিশ্বাসে যে, যক্ষ বলেন চলিষ্ণু ঐ মেঘকেই,
'যাও গো মেঘ উড়ে তুমি অলকাপুরী, বলো গে তারে
আমি আছি ব্রাত্য পতিত দুর্ভাগাদের খামারে।'

ওগো মেঘ, মনভোলানি, যাও না দেখে কবি এখন কেমন থাকে
জানালা খুলতেই তুফান খুব, গাছতলা ছায় মরা কাকে।
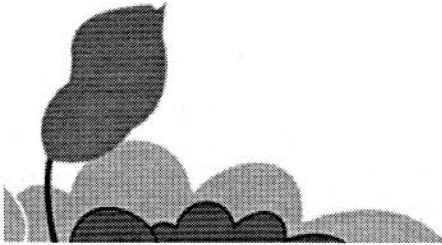
নাহার মনিকা

রাজনীতি

সহজ বোধিনী শিক্ষা করি, দুইপাশে বাহুর বহর বাড়ে
দূরের রাস্তার পেছনে পেছনে ঘুরি,
চোরাকুঠুরিতে খুঁজি নিশানার দিকচিহ্ন ছাপ,
দেখেছ? হঠাৎ ঘরের কোণে পুচ্ছকল্প ঢোড়া বোড়া সাপ।

এক দৌড়ে চলে গেছি দূরের রাস্তায়,
তরলের মানসাংক কতটা ভুলেছে সুকন্যার দল?
কেন ভোলা, জল রাশি দেখে সাঁতারের মিথ্যা ফাঁদ,
ভুলে আর আবার পিছনে ঘুরে হারাব না দিক
যেমন বিভ্রম হয় জেগে উঠে, হারালে সম্বিত।

বিস্মরণের টবে ফুটে ওঠে নিশিরানী ফুল,
ক্ষণস্থায়ী বাল্যশিক্ষা শেষ হলে সহাস্য ঈশারা
ঈশারায় আগুন থাকে, সংযোগে নিবিষ্টতা ছিল
চোরাকুঠুরির ঘরে সাপ পুড়ে গেলে
পলায়নের ক্রোধ ঘ্রাণ আর সেই সঙ্গে শ্রবণও পোড়াল।

চিত্রিত পোড়া সর্প সুখে নিদ্রা যায়
বিপদের ভয় কমে আসে দক্ষিণের নিরেট জানালা থেকে
বাতাসের দেয়াল দেয়া ঘরের খাটাল
পোড়াগন্ধে ভরে ওঠে।

সহজ বোধিনী ঘিরে এ মরা কাটাল
স্রোত এসে সঙ্গী হয়, স্রোতের উজানে দূরে যাই।
মরা সাপ বায়বীয় ওড়ে, আমি তার স্মৃতি মচকাই।
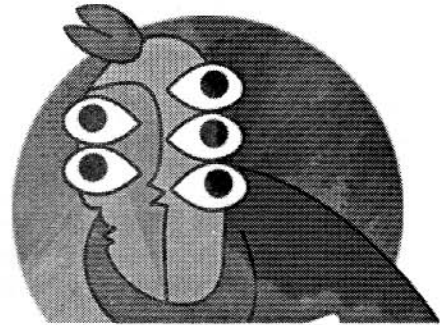
নাসির আহমেদ

শ্রাবণের মর্মার্থ বদলে গেছে পঁচাত্তর থেকে

হাজার বছর ধরে বাংলার শ্যামল মৃত্তিকা ভিজেছে বর্ষায়-শ্রাবণে বৃষ্টিতে। হাজার বছর পরও এই বাংলার শ্যামল মাটি ভিজবে বর্ষার অঝোর ধারায়। ঘনকালো মেঘের অবিশ্রান্ত কান্নায় এখনো ফোঁপাচ্ছে আকাশ এই শ্রাবণে, এই আগস্টে। এত ঋতু পরিবর্তনেও, এত ওলোট পালোটেও শ্রাবণের এই কান্না থামেনি এবং থামবে না কোনোদিন। শুধু এই কান্নার মতো বর্ষণের অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই কালো রাত থেকে। শ্রাবণ এখন আর বৃষ্টির মওসুম মাত্র নয়, এখন সে আগস্ট এবং শুধু শীতল বর্ষণ বৃষ্টি নয়– উষ্ণ রক্তেরও, যে রক্ত বীরের।

রূপকথার চেয়ে চাঞ্চল্যকর এক ইতিহাস থমকে আছে এই শ্রাবণের অন্তরালে, সেই পনেরই আগস্ট মধ্যরাত্রির অন্তরালে শোনো প্রিয় অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ! তোমাদের পূর্বপ্রজন্মকে বিভ্রান্ত করেছে সেই সত্য ইতিহাস থেকে। তোমাদেরও চেষ্টা করা হবে। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আমি তাই লিখে যেতে চাই সেই বীর রাজকুমারের কথা তোমরা যার গর্বিত উত্তরাধিকার।

তার কথা যদি লেখে অনন্তকাল ধরে নিরবধি এ বাংলার শত শত নদী, তবু শেষ হবে না কাহিনি আর অনন্য গৌরবগাথা তাঁর। দুঃখিনী বাংলার সেই গৃহস্থঘরের রূপকথার রাজকুমার স্বাধীনতা চেয়েছিল, চেয়েছিল হাজার বছর বন্দি তার প্রিয় দেশ আর দেশের মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত হোক। মানুষের মূল্য হোক মানুষ-সমান উচ্চ গণতন্ত্রে। একাত্তরে স্বাধীনতা রক্তে ভেসে এসেছিল তাই। সেই দীর্ঘ ইতিহাস আজ নয়। আজ শুধু ঘনকালো মেঘ আর বর্ষণের সঙ্গে সেই রূপকথার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর বেদনার শোকার্দ্র কিছু ইতিহাস আর শ্রাবণ-আগস্ট-রাত্রি শুধু। সেই রাত শ্রাবণের বৃষ্টির কান্নার, সেই রাত আগস্টের হু হু দীর্ঘশ্বাসের। এই দুঃখিনী বাংলার প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতার স্বাপ্নিক এবং জনক যিনি, তারই রক্তে এই শ্রাবণের বৃষ্টিস্নাত কালোরাত্রি রক্তাক্ত হয়েছিল বড়। উনিশ শ পঁচাত্তরে পনের আগস্ট মধ্যরাতে স্বজনাপনসহ তার খুনে ভেসে গেল বাংলাদেশ; ভেসে গেল ইতিহাস!

সারারাত কাঁদলো আকাশ অঝোর বর্ষণের চেয়ে ভারি অশ্রুপাতে সারারাত কাঁদলো বাতাস অব্যক্ত গোমড়ানো হু হু বাতাসের দীর্ঘশ্বাসময় অভিশাপে। স্ত্রী-পুত্র পরিজনসহ জনকের খুনে ভাসলো স্বদেশ, যেন বিংশ শতকে ইমাম হোসেনের মতো স্বজন ও শিশুপুত্রসহ অন্য এক ফোরাতের তীরে।

অশ্রুসিক্ত ঘুমন্ত বৃক্ষেরাও জেগে জেগে কাঁদলো সারারাত। নিসর্গ ও চরাচরে পবিত্র শোক উচ্চারিত হলো ভোররাতের বাতাসে 'ইন্না লিল্লাহে... রাজেউন'। ঘনকালো মেঘেরাও থমকে গিয়েছিল সেই শ্রাবণের ভোররাতে যখন মসজিদ থেকে 'আস্‌সালাতো খায়রুম মিনান নাওম...' কান্নার মতো সম্পূর্ণ অন্য সুর ছড়িয়েছিল এই নিষ্প্রাণ নগরে। নিভৃতে কেঁদেছে বাঙালি ভয়াবহ মারণাস্ত্রের মুখে জিম্মি তার প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা আর প্রিয় সোনার স্বদেশে। শুধু চাপচাপ মেঘ দূরে আকাশের কোণে থমকে থেকেছে শোকে স্তব্ধ হয়ে সেই রাতে, আবার নিষ্পাপ অশ্রু ঝরিয়েছে টিপটিপ সারাদিন। তাই সেই বৃষ্টির মর্মার্থ বদলে গেছে হাজার বছরের ইতিহাস থেকে।

আমি জানি সেই রাতে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কী গভীর শোকে গুমড়ে গুমড়ে কেঁদেছিল তার প্রাণপ্রিয় সন্তানের জন্য, রবীন্দ্ররচনাবলির প্রতিটি পাতায় সেই অশ্রুচিহ্ন হয়তো বা আছে লেগে। নজরুলের দ্রোহী চেতনার অগ্নিও তো মুহূর্তের জন্য নিভেছিল সেই রাতে আকস্মিক শোকের প্লাবণে। হয়তো দুর্গত বাংলাদেশ সেদিন বোঝেনি কত সুদূরপ্রসারী সর্বনাশ হয়ে গেছে; বুঝেছে নিসর্গ-প্রকৃতি আর বাংলার শ্রাবণ এবং রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

হাজার বছর ধরে বর্ষায় প্লাবিত হবে বাংলার মাটি, শত শত নদী প্লাবিত হবে শ্রাবণের ধারাজলে। এই দৃশ্য বহমান থাকবে বাংলায়। শুধু পঁচাত্তরের সেই পনেরই আগস্টের মধ্যরাত থেকে বদলে গেছে শ্রাবণের বৃষ্টির মর্মার্থ। বদলে গেছে আমাদের নৈসর্গিক ভাষা আর ঋতুর প্রাচীন ইতিহাসও। যদি ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে হতে একদিন শ্রাবণে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নাও ঝরে, তবু অনাগত বাংলার সন্তান ! তোমরা জেনে রেখো– শ্রাবণ মানেই অশ্রুসিক্ত বাংলাদেশে নিসর্গের শোক, শ্রাবণ মানেই স্বদেশের মানচিত্র রক্তাক্ত করা এক পনেরই আগস্ট মধ্যরাত।

গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে তাকালে দেখবে তোমরা– দূরে কোথাও থমকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ইতিহাস তার রূপকথার রাজকুমারের চেয়ে সাহসী সন্তান শেখ মুজিবের শোকে। যদি সামান্যও বৃষ্টি হয় বুঝে নেবে প্রতি ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গেই মিশে আছে এই বাংলার অমর কীর্তি সৃষ্টিকারী জাতির জনক আর তার প্রিয় স্বজনদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

অনাগত কাল আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমরাও জেনো– এই অমোঘ সত্য ইতিহাস বহুভাবে আড়ালের অপচেষ্টা হয়েছিল, হবে– যেমন রেসকোর্স মুছে ফেলা হলো উদ্যান বানিয়ে!
ইতিহাসের এই অমল অমোঘ সত্য তোমরা যদি না জানো, তবে– কোনোদিন খুলবে না তোমাদের মননের পবিত্র জানালা, জানবে না ইতিহাসে কীভাবে বীরের পুনর্জন্ম হতে পারে! তোমরা সেই বীরের বংশধর উত্তরাধিকার অনাগতকাল।

ইকবাল আজিজ

শূন্যে আঁকা ছবি

নদীর পানি টলোমলো দুঃখ জুড়োয় গানে
স্বপ্নগুলি এলোমেলো অন্ধবাউল জানে–
জীবনশেষে ফিরে পাবো মৃত্যুদিনের খাতা
ডাক দেবেন আমায় তখন মহাকালের মাতা।

পর্চাদলিল লাঙল জমি সবই রবে পড়ে
ভূতের পোলা নাচবে তখন আমার আঁধার ঘরে।
জীবন জুড়ে চাওয়া পাওয়া কত কিছু দেখা!
হয়নি শুধু ছবি আঁকা একটি সরল রেখা।

জীবন যেন এক নিমিষে রঙের খোয়াব শুধু
শূন্য আকাশ শুধুই ধূ ধূ আগুন জলের মধু।
নদীর পানি টলোমলো দুঃখ জুড়োয় গানে–
সারাজীবন অচিন ঢেউ আঘাত শুধু হানে।

শূন্য মাঝে বিরাজ করে কোন্ সে লীলাময়
শরীর নেই জীবন নেই অমর অক্ষয়।
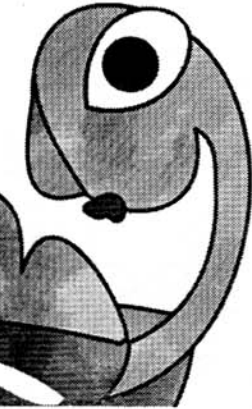
মোস্তাক আহমাদ দীন

কারখানা

তোমার হলুদ জানালা কেমন কালো হয়ে গেছে
আজ চিমনির ধোঁয়ায়

কোথায় ধানের দুধ? কোথায় পাটের সেই শাদারঙ সোনা

ছেলে চেয়ে রয় তার মিথ্যে প্রেমিকার প্রতি

শেষ বাঁশিটি বাজছে, নাতিদূর কারখানার দিকে

মেয়ে চেয়ে রয় তার মিথ্যে প্রেমিকের প্রতি

শুভাশিস সিনহা

আশাবরী

আবারো উৎসব হবে, ফেলে যাওয়া গান, ছুড়ে দেয়া
মুদ্রা, উড়ানো ভঙ্গিমা একযোগে এ আশ্বাস দেয়
এত রঙ বিফলে যাবে না, এত অশ্রু, রক্ত ঘাম
এতটা বদনাম কভু বৃথা নয়, কেবলই সময়
যে ঘোড়া বোঝাই করে আয়ু কাল চঞ্চলতা পিঠে
ছুটে গেছে গোপন অরণ্যে, তার লাগাম ছিঁড়েনি
অনন্ত খুরের ধ্বনি বাতাসে নাচিয়ে ফেরাকালে
স্মৃতির পাথরগুলো হবে ঠিকই রঙের মানুষ

আবারো রঙের দিন দিদিমারা শ্বেতকেশে রাঙা
প্রজাপতি, আঁচলে ধূলির ফুল বেঁধে জড়ো হবে,
বলবে ঠিক, দেখেছিল কোন অমাবশ্যা রাতে সেই
অচিন দস্যুর দল কেড়ে নিল নাতিপুতিদের

বিফলে যাবে না সবই, আবারো দাঁড়াবে উঠে শব
জীবন অনিঃশেষ, আদিঅন্ত দারুণ উৎসব।

৭—

জাহিদ হায়দার

হে বার্তা সকল ক্ষমা করো

আমি চৈত্রের ফরসা রৌদ্রে
আকাশের নিচে
পাখির ডানার সাথে থাকি নাই,
ক্ষমা করো চৈত্র মাস;

বৃষ্টি আষাঢ়ের, বৃষ্টি শ্রাবণের;
আমি সবুজ পাতার সাথে ভিজি নাই,
ক্ষমা করো বৃষ্টি-সহোদরা;

শীতের ভেতর
ক্ষমাহীন আগুনের সঙ্গ লয়ে
আমি রাত জেগে দেখেছি ক্রিকেট,
কিন্তু মাঘের গ্রহণ নিয়ে লিখেছি কবিতা;

এই আমি কাদামাখা ক্রিয়াপদ
নদীতে ফেলেছি থুতু,
আবার কাপড়ও পরি!

হে বার্তা সকল ক্ষমা করো,
বর্ণ শিক্ষা দাও।

হেনরী স্বপন

ভেজা পরিচ্ছদ যতটা ছড়াবে

বিকেলের রৌদ্র অতটা বিপ্লবী নয়,
গাঢ়লাল জবা-পুকুরের জল...
খালের জোয়ারে বয়ে যাচ্ছে রক্তাভ হিজল
জানালার এত কাছে !
তবু-ফুল দেখি না,
দেখি! রক্তের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে
ছটফটে স্রোতে...

যে ঘরের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি
টাঙিয়ে রেখেছি;
আমাদের আলিঙ্গনে ভেজা
পরিচ্ছদ কতটা শুকাবে প্রার্থনায় ?

মনিকাঞ্চন ফুলের গন্ধ যতটা ছড়াবে
সুপারি গাছের চিরল পাতায় বিছেপোকা সুরসুরে হেঁটে যায়
ভিজে হাওয়া জানালায় এসে
উঁকি দেয়....রূপকথা...
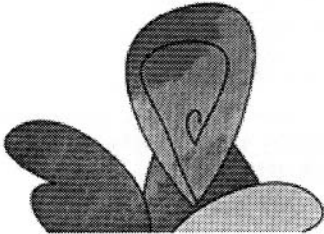
শামস আল মমীন

মানুষ

মনুষ্য পরিবারে দেখি নানান মানুষ
কেউ করে নিরিখন প্রতিক্ষণ কষ্টি পাথরে
কেউ বলে জীবন মানেই রঙ্গমেলা
অফুরান হাসিখেলা।

মনুষ্য পরিবারে দেখি নানান মানুষ
দেশে এবং বিদেশে বর্ণে বর্ণে আর
বর্ণমালায়
মাটিতে মাটিতে
বাদামি ও শাদা
জামরঙ হলুদ খয়েরি
আরও আছে কালা। এতো রঙ
তবু রক্তে ... নিঃশ্বাসে ... নিঃশ্বাসে ...
দেখি নাই কোনো ভেদ

যদি বলি সাগর পাড়ের কথা
যদি বলি পঞ্চগড় আর পদ্মার কথা
যদি বলি নীলনদ আর নীল দরিয়ার কথা
যদি বলি চাকমা আর চেরোকির কথা
যদি বলি ইকারুশ আর ইনকার কথা
যদি বলি আমাজন আর আমার আম্মার কথা
হায়-রে
মানুষ
বর্ণে আর বর্ণমালায় আমরা যতনা বিবিধ
রক্তে ও নিঃশ্বাসে কাছাকাছি তারও অধিক।

বর্ণে বর্ণে আমরা যতনা বিবিধ
রক্তে ও নিঃশ্বাসে কাছাকাছি তারও অধিক

মনুষ্য পরিবারে দেখি নানান মানুষ
আমি থাকি শুধু চক্ষু মেলিয়া ....

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

নৌকা বিষয়ক রচনা

নদী নেই। নৌকা আছে। নাও লোকজ সম্পদ।
মাঝি নেই। নৌকা কে বাইবে ?

এই প্রশ্নটি পকেটে নিয়ে আমরা প্লেনে পা দিলাম।

নৌকার সাথে উজান এবং ভাটির সম্পর্ক নিবীড়
নৌকার সাথে স্রোত এবং পালের যোগসূত্র গাঢ়

নৌকা কী ভাবে চলবে !
গুণ টেনে, লগ্গি মেরে, বৈঠা দিয়ে, দাঁড় বেয়ে ?

প্রশ্নগুলো মধ্য আগস্টে জবাবহীন বেয়ারিং চিঠির মতো
প্রকৃত প্রাপকের পোস্টাল কোড খুঁজে
খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে ফিরে আসে ...
প্রশ্নপত্র, পত্রপাখি
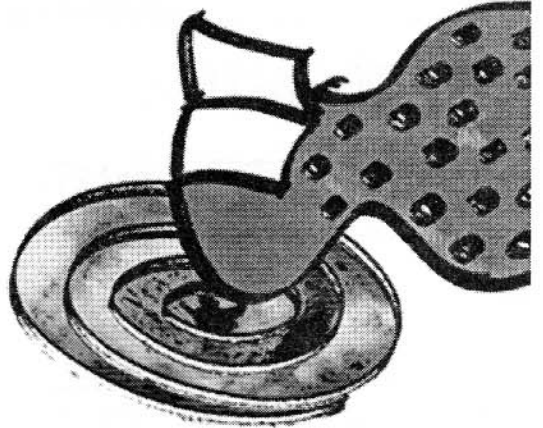
[একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার]
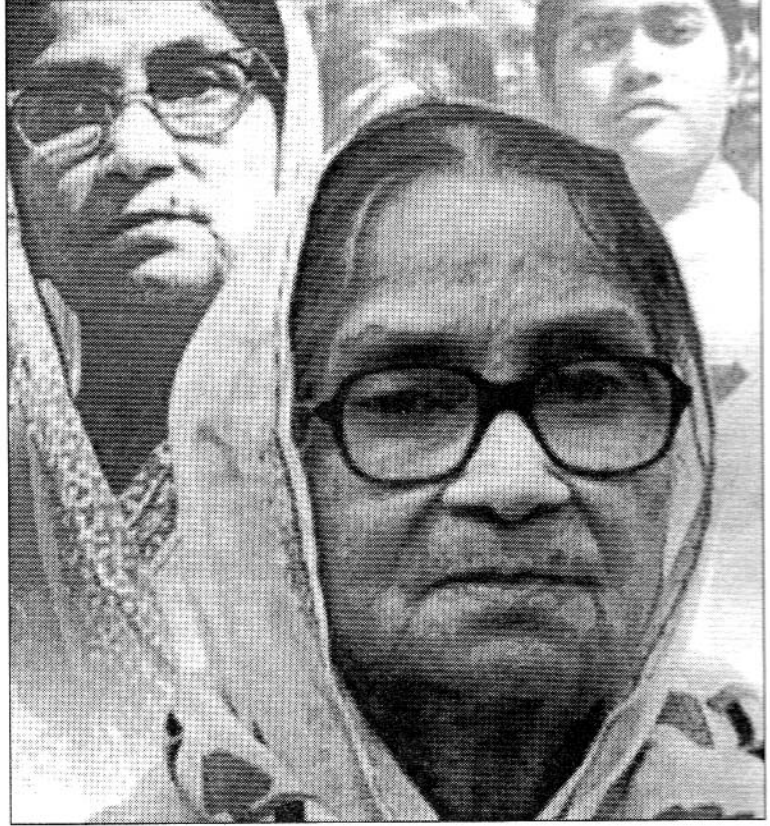
সুফিয়া কামাল অন্তরঙ্গ আত্মভাষ্য

আবুল আহসান চৌধুরী

শতবর্ষ আগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাঙালি মুসলমান নারীর দুরবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন :

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। [*মতিচূর*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩১৪]।

অবরোধবাসিনী মুসলিম রমণীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে রোকেয়া আক্ষরিক অর্থেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

নারীজাগরণের এই অগ্রদূতীর কাজ দু'টি ধারায় প্রবহমান ছিল : সমাজকর্ম এবং সাহিত্যচর্চা। তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও ছিল বহুমুখিতা, যার কেন্দ্রে ছিল নারীশিক্ষার আয়োজন। এর পাশাপাশি মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলা, বস্তির মেয়েদের ভাগ্যের উন্নয়ন, এমন কী পতিতা-পুনর্বাসনের প্রয়াসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাঁর লেখার প্রধান অংশই ছিল নারীসমাজের দুর্দশা-দুঃখের বিবরণ, এর কারণ বিশ্লেষণ এবং প্রতিকার অন্বেষণ ও নির্দেশ। বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রেরণার বশে তিনি কলম ধরেন নি। বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি, ছিলেন আশাবাদীও– তাই নারীর ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন– তবুও শাস্ত্রের ভীতি, সমাজের শাসন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। কালবিরোধী থাকলেও অনুগামীপরিকর হিসেবে পেয়েছিলেন একদল আদর্শব্রতী শেকল-ছেঁড়া বয়ঃকনিষ্ঠ সমলিঙ্গের মানুষকে, সমকালে যাঁরা তাঁর সহায়ক ছিলেন– উত্তরকালে তাঁর আদর্শের পতাকা বহন করেছেন। সেই একগুচ্ছ নামের মধ্যে বোধকরি সুফিয়া কামালই (১৯১১-১৯৯৯) তাঁর চেতনা ও কর্মের সবচেয়ে যোগ্য ও সার্থক উত্তরসূরি।

২.

সুফিয়া কামালের জীবনে রোকেয়ার অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়– পরিবার-পরিবেশে, আদর্শ-ব্রতে, শোকে-দুর্ভাগ্যে, স্বীকৃতি-সাফল্যে। সুফিয়া কামাল জন্মেছিলেন সেকালের এক সম্ভ্রান্ত বংশে– মানুষ হয়েছিলেন অভিজাত সামন্ত পরিবারে। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সুযোগের যোগ্য ব্যবহার করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। রোকেয়ার মতো তিনিও ছিলেন স্বশিক্ষিত। কৈশোরেই পারিবারিক শোক-তাপ সইতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বরিশালের এই সম্পন্ন-সম্ভ্রান্ত-সম্পদশালী পরিবারকে আকস্মিকভাবে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। শুরু হয় কলকাতায় এক অনিশ্চিত নতুন জীবন। কিন্তু এই মহানগরীতেই তাঁর ছকে বাঁধা আটপৌরে জেনানা ফাটকের জীবন পালটে যায়। রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগ জীবনবিকাশের এক নতুন দুয়ার খুলে দেয়– বদ্ধ খাঁচার পাখি ক্রমে মুক্ত আকাশে ডানা মেলতে শেখে। আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর তমসাঘন ভুবন। বৃত্তাবদ্ধ জীবনকে অগ্রাহ্য করে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন– হয়ে ওঠেন রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা-ভাব-ভাবনার এক অনুগত-উদ্দীপ্ত অনুসারী।

বঞ্চিত-অনাদৃত-উপেক্ষিত-পীড়িত নারীর জীবনকে আলোর স্পর্শে জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি রোকেয়ারই মতো কলম ধরেন– সত্য-সুন্দর-কল্যাণ-আনন্দের অন্বেষণে যাত্রা শুরু হয় সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের স্নেহ-সান্নিধ্য তাঁর জীবনের অমূল্য পাথেয়। তাঁর সাহিত্যচর্চায় এই দুই যুগন্ধর কবির প্রেরণা ও আনুকূল্যের কথা বার বার স্মরণ করতে হয়। এরই মাঝখানে আর-একজন এসে দাঁড়ান– তিনি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক– বাঙালি মুসলমান নারীর জাগরণে যাঁর ভূমিকার কথা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। রোকেয়ার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন সমাজের কাজে, রবীন্দ্র-নজরুলের কাছ থেকে প্রেরণা পান সাহিত্যচর্চার, আর লেখার জগতে বিকশিত হয়ে ওঠেন 'সওগাত'-এর সৌজন্যে। রোকেয়ার মতো তাঁরও জীবনের দুটি ধারা সমান্তরাল বয়ে চলেছে : সমাজ আর সাহিত্য।

৩.

'কবি' অভিধা সুফিয়া কামালের নামের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও কবিতা নয় গদ্যরচনা দিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি গল্প। তাঁর প্রথম বইও গল্পের, নাম– 'কেয়ার কাঁটা' (১৯৩৭)। এরপর অবশ্য গদ্যচর্চায় আর বেশি মনোযোগ দিতে পারেন নি– মাত্র তিনটি বই বেরিয়েছিল– ভ্রমণকথা 'সোভিয়েটের দিনগুলি' (১৯৬৮), স্মৃতিচর্চা 'একালে আমাদের কাল' (১৯৮৮) ও দিনপঞ্জি 'একাত্তরের ডায়েরী' (১৯৮৯)। কবিতার বইয়ের সংখ্যা এগারো– এরমধ্যে 'ইতলবিতল' (১৯৬৫) ও 'নওল কিশোরের দরবারে' (১৯৮১) শিশুতোষ কবিতার সংকলন। কবি বেনজীর আহমদের সৌজন্যে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই 'সাঁঝের মায়া' (১৯৩৮) কবি হিসেবে সমাদর ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। এই বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল এইরকম : 'তোমার কবিতা আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা' [*রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র* : ভূঁইয়া ইকবাল, ঢাকা, বৈশাখ ১৩৯২; পৃ. ৩৩]। এরপর একে একে বের হয় : 'মায়া কাজল' (১৯৫১), 'মন ও জীবন' (১৯৫৭), 'উদাত্ত পৃথিবী' (১৯৬৪), 'দীওয়ান' (১৯৬৬), 'প্রশস্তি ও প্রার্থনা' (১৯৬৮), 'অভিযাত্রিক' (১৯৬৯), 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' (১৯৭০), 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' (১৯৭২)– বইটি পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'Where my darlings lie buried' নামে ইংরেজিতে তরজমা হয়। প্রকাশ পেয়েছে 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' (১৯৭৬)। সুখের কথা, বাংলা একাডেমী তাঁর রচনাবলি প্রকাশে মনোযোগী হয়েছে, ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ড বেরিয়েও গেছে। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতা ও অন্যান্য রচনার সংখ্যাও কম নয়। প্রণয় ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। চকিতে দেশ-মাটি-মানুষও দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। ধর্মীয় ঐতিহ্য কিংবা ব্যক্তি-প্রশস্তিও তাঁর কবিতায় নিয়েছে স্থান করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর চেতনায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, শোক-অশ্রু-বিষাদ– তার পরিচয় মেলে 'মোর যাদুদের সমাধি পরে' কাব্যগ্রন্থে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সাময়িকপত্র-সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বাঙালি মুসলমান নারীদের প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বেগম'-এর সূচনালগ্নের

সম্পাদক ছিলেন ১৯৪৭-এ, দেশভাগের কিছু আগে। ১৯৪৯-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সুলতানা'র যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে দেশ ও বিদেশে নানা পুরস্কার-সম্মাননা-স্বীকৃতিও লাভ করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৯৭), জাতীয় কবিতা পরিষদ সম্মাননা (১৯৯৫), বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক (১৯৯৭) এবং স্বাধীনতা পদক (১৯৯৮)। বিদেশে লেনিন পুরস্কার (রাশিয়া, ১৯৭০), সংগ্রামী নারী পুরস্কার (চেকোশ্লাভাকিয়া, ১৯৮১), মেম্বর অব্ কংগ্রেস সনদ (যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৯) লাভে সম্মানিত হন।

৪.

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সুফিয়া কামাল কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর থেকে তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। একদিকে রোকেয়ার আদর্শে নারীসমাজের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করেন– অপরদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হন। কলকাতায় যেমন রোকেয়ার সান্নিধ্য ও প্রেরণা তাঁকে পথনির্দেশ করেছিল, ঢাকায় তেমনি লীলা নাগ-আশালতা সেন– এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সামাজিক কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। তাঁর এই কাজ সাংগঠনিকভাবে নতুন মাত্রা পায় মহিলা পরিষদ (১৯৭০)-এর মাধ্যমে। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সবসময়ই তিনি পালন করেছেন নির্ভীক দিশারীর ভূমিকা। ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সক্রিয়-সাহসী ভূমিকা পালন করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ, রবীন্দ্রবর্জনের সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা, রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী উদ্যাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিবাদ হিসেবে সরকারি খেতাব বর্জন, সত্তরের প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনসহ সব কর্মসূচিতে মহিলাদের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দান– তাঁর সমাজ ও স্বদেশমনস্ক বিবেকী চেতনার স্মারক। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর কর্মকাণ্ড ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন মাত্রা পায়। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে শত সংকটেও তাঁর সক্রিয় সাহসী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত স্বৈর-সামরিকচক্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম-প্রতিবাদও কখনো থেমে থাকে নি।

শুধু আন্দোলন-সংগ্রামেই নয়, প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার নেতৃত্ব প্রদানেও তাঁর সময়োপযোগী ভূমিকার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সূচনা হয়েছিল বরিশালে 'মাতৃমঙ্গল'-এর মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা আরও গাঢ় হয় রোকেয়ার সান্নিধ্যে এসে তাঁর 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এই দীক্ষার আলোকেই দেশভাগের পর ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনে লীলা নাগের নেতৃত্বে 'শান্তি কমিটি'র সঙ্গে কাজ শুরু করেন। ১৯৫১-তে 'ঢাকা শহর শিশুরক্ষা সমিতি' ও ১৯৫৪-তে 'ওয়ারী মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও তার সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ-ছাড়া দেশের বেশ কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রেরণা-পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার নেতৃত্ব বর্তায় তাঁর ওপরেই। তাঁর ঢাকার তারাবাগের বাসার চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা' (১৯৫৬)। তাঁর উদ্যোগেই ঢাকায় গঠিত হয় 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি' (১৯৬০)। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটিরও (১৯৬১) তিনি ছিলেন সভানেত্রী। এদেশের সুস্থ সংস্কৃতিধারার বিকাশে ও বাঙালি সংস্কৃতির লালনে 'ছায়ানট' (১৯৬১)-এর ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের সঙ্গেও তিনি যুক্ত এবং এর প্রথম সভানেত্রীর দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়। 'পাক-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতি'রও তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সভানেত্রী (১৯৬৫)। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল– আর তাই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উৎসবে তিনি ১৯৬৬-তে মস্কোয় যান। এই দেশ থেকেই লাভ করেন সম্মানসূচক 'লেনিন পদক' (১৯৭০)। 'সোভিয়েটের দিনগুলি' (১৯৬৮) সেই লেনিনের দেশ সফরের অন্তরঙ্গ চালচিত্র। ১৯৭০-এ 'মহিলা পরিষদ' গঠন তাঁর আর এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ' (১৯৮২) কিংবা 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' (১৯৮৮)-এর মতো বিপরীত মেরুর প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে তাঁর মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-পরিধি সম্পর্কে সহজেই একটি ধারণা অর্জন করা যায়। যে-দেশের লেখক–বুদ্ধিজীবীরা ভীতি এবং প্রলোভনে নিয়ন্ত্রিত– সে-দেশে সুফিয়া কামালের মতো বিবেকী মানুষকে নিঃসঙ্গ পথিকের মতোই পথ চলতে হয়।

৫.

দেশের মানুষের কাছে সুফিয়া কামালের একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সাধারণের মধ্যে অসাধারণ– সমাজের আটপৌরে গতানুগতিকতার মধ্যে ব্যতিক্রমী। তাঁর কোমল-পেলব-স্নেহময়ী রূপের আড়ালে ছিল বজ্রের বাণ। 'জননী সাহসিকা'– এই হলো তাঁর চরিত্রের যোগ্য অভিধা। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও অর্জনের স্বরূপ কেমন, তা বেশ বুঝতে পারা যায়, আনিসুজ্জামান যখন বলেন :

আমাদের সমাজে অনুকরণীয় মানুষের বড় অভাব। কবি সুফিয়া কামালকে দেখিয়ে আমরা বলতে পারি, একে অনুসরণ করো। মহৎ মানুষ, আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, বিবেকবান মানুষ, সৎ মানুষের উদাহরণ দিতে গেলে বলতে পারি। আমাদের মধ্যে

তিনি থাকলে আমরা সাহস পাই, প্রেরণা লাভ করি। আমাদের মুরুব্বি নেই– তিনি এ জাতির অভিভাবকস্বরূপ। [*চলতিপত্র*, ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯]

এ-কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য যে, 'তাঁর কোমল মাতৃহৃদয় থেকে দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা যেমন স্বতোৎসারিত হয়, তেমনি বুকভরা সাহস নিয়ে জাতির প্রয়োজনে ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষটিই অকুতোভয়ে এসে দাঁড়ায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে' [*ঐ*]।

তাঁর মূল্যায়নে শামসুজ্জামান খান যে-কথা বলেন, তার ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন ঘরোয়া চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাতের মমতাময়ী জননীর চিত্র ফুটে ওঠে,– অপরদিকে অন্যায়-অবিচারের নিরসনে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আবিষ্কার করা যায় রাজপথে মিছিলে মিছিলে শ্লোগানমুখর রোদ-ঝলসানো মুখের এক লড়াকু মাকে– যেন বা গোর্কির 'মা'। শোনা যাক সমকালের চোখে দেখা তাঁর এই দ্বিবিধ রূপের কথা :

কবি বেগম সুফিয়া কামাল সমকালীন বাংলাদেশে এক অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর আটপৌরে সরল জীবনযাত্রার একটি স্বকীয় সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা ছিল। একে পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছিল তার অন্তরের মাধুর্য ও চরিত্রশক্তির দার্ঢ্য। এর সঙ্গে বাঙালি মাতৃমূর্তিকে যুক্ত করলে যে অবয়ব গড়ে ওঠে তা-ই সুফিয়া কামাল। অর্থাৎ প্রতীকটি হল জীবনযাপনের সরলতা ও স্নিগ্ধ মাধুর্য, অন্তরশক্তির তেজোময় বিভা এবং বাঙালি মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত রূপ। [*দৈনিক সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯]।

সৌম্য-স্নিগ্ধ 'বাঙালি মাতৃমূর্তি'র প্রতীক যিনি, তাঁর সংগ্রামী রূপের অপর ছবিটি এই রকম :

জীবন যে কত বড়ো এবং তাকে যে সাধনায়, ত্যাগে, সদিচ্ছায়, শ্রমে, অঙ্গীকারে কত সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্মাণ করা যায় তার নজির বেগম সুফিয়া কামাল। যে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে তার জন্ম , সেখান থেকে তিনি শুধু উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে বেরিয়ে আসেন নি– দুঃসহ নিগড়ে আবদ্ধ বাঙালি মুসলমান নারীসমাজকে তিনি জাগর-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, শৃঙ্খলমুক্ত জীবনের স্বাদ দিয়েছেন। রক্ষণশীল ও আভিজাত্যের বৃত্ত ভেঙেই তিনি সাহসী কিন্তু দৃঢ় পদচারণা শুরু করেছিলেন। বৃত্ত যিনি ভাঙতে পারেন– তিনি আরো বৃত্ত ভাঙার জন্য প্রস্তুতি নেন। সুফিয়া কামালও তাই করেছেন আজীবন। অশুভ, অসুন্দর, অকল্যাণ-এর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আজীবন সক্রিয় যোদ্ধা। [*ঐ*]।

এই আমাদের সুফিয়া কামাল– স্নেহ ও শক্তির আধার– বিবেক ও কল্যাণের কণ্ঠস্বর– মনুষ্যত্ব ও শুভবুদ্ধির প্রতীক। শামসুর রাহমানের ভাষায় : 'অন্ধকারে যিনি বারবার হেঁটেছেন রাজপথে / জ্বলন্ত মশাল হ'য়ে নির্ভুল'। আজ এই মমতাহীন অন্ধবেলায় তাঁকেই খুঁজে ফেরে শীতার্ত মানুষ কোমল স্নেহের প্রত্যাশিত ওমের জন্যে– তাই স্মৃতিপটে বারবার 'আলোকিত পদ্মের মতোই ফুটে ওঠে তাঁর মাতৃমুখ'।

৬.

সুফিয়া কামালকে প্রথম দেখি ১৯৬৪ সালে, বাংলা সন হিসেবে ১৩৭১-এ, শিলাইদহে। 'ছায়ানট'-এর তরফ থেকে বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সুফিয়া কামাল বোধকরি তখনও 'ছায়ানট'-এর সভানেত্রী। শিলাইদহে সেই প্রথম এইভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-বার্ষিকী পালনের উদ্‌যোগ গৃহীত হয়। একুশে শ্রাবণ কুষ্টিয়া শহরের জি.কে.র ঘাট থেকে একটি বড় লঞ্চে করে গড়াই নদী বেয়ে পদ্মাকে ছুঁয়ে শিলাইদহে যাওয়া হয়। 'ছায়ানট'-এর দলে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, বিলকিস নাসিরউদ্দীন এবং আরও অনেকে। সবাইকে চিনতামও না। কচি-কাঁচার মেলার পক্ষ থেকে আমরা বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলাম। তাঁর সহজ-সরল আচরণ ভারি ভালো লেগেছিল। তখনকার জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে ফেরার পথে নৌকাই ছিল বাহন। মনে পড়ে এক নৌকায় উঠেছিলেন মোতাহার হোসেন ও সুফিয়া কামাল। বৃদ্ধ মাঝির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়েছিলেন দু'জন। এই আলাপচারিতার একটা ছবি আমাদের কেউ যেন তুলেছিলেন, খুঁজলে হয়তো এখনও পাওয়া যাবে। মাতুল কাজী মোতাহার হোসেনের ফাই-ফরমাশ খাটার সুবাদে তাঁর সৌজন্যেই সুফিয়া কামালের সঙ্গে পরিচয় হয়। কথাবার্তা আবার কি হবে– হাফ্‌প্যান্ট পরা অতটুকু ছেলে– উনি চিবুক ধরে একটু আদর করে দিয়েছিলেন। তারপর দু'একটি অনুষ্ঠান ছাড়া আর দেখা হয় নি– আলাপ তো দূরের কথা।

বহুকাল পরে, যখন কিছুটা লায়েক হয়েছি– ভাবলাম, কবি সুফিয়া কামালের একটি সাক্ষাৎকার নেব। সালটা ১৯৯৫। আর ক'বছর পরেই তো নজরুলের জন্মশতবর্ষ। মূলত তাঁর জীবনকথা আর নজরুলস্মৃতি নিয়েই আলাপ করব। এই চিন্তা মাথায় রেখে এর আগে দুই বাংলার আরও বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। ফোনে দিন-তারিখ ঠিক করে ওঁর ধানমন্ডির বাড়িতে গেলাম ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫, বাংলা তারিখ ৯ কার্তিক ১৪০২ মঙ্গলবার, বিকেল চারটেয়। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে সামান্য বিরতি দিয়ে তাঁর প্রায় দেড় ঘণ্টার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি টেপ-রেকর্ডারে। এই কাজে আমাকে সহায়তা করেন অধ্যাপিকা শিরীনা হোসেন। এই প্রসঙ্গে কবি-কন্যা চিত্রকর সাইদা কামালের আন্তরিকতার কথাও স্মরণ করি। পরে প্রকাশের জন্যে ক্যাসেট-রেকর্ডার থেকে সাক্ষাৎকারটি লিখে দেন আমার ছাত্র বর্তমানে কুষ্টিয়ার আমলা সরকারি কলেজের বাংলার সহকারী অধ্যাপক প্রাবন্ধিক-গবেষক মাসুদ রহমান।

৭.
সাক্ষাৎকারটি প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্যে সামান্য সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে– বিশেষ করে পুনরুক্তি, স্মৃতিভ্রমজনিত তথ্যভ্রান্তি কিংবা অসম্পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে। কোনো কোনো স্থানে কথা অস্পষ্ট হওয়ায় সেই অংশ বর্জিত হয়েছে। কখনো প্রশ্নের ভাবমতো জুতসই জবাব পাওয়া যায় নি বলে পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতির সময় জবাবের অনুকূলে প্রশ্নের ধরন বদলাতে হয়েছে। আবার বক্তব্যে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কোনো শব্দ উহ্য থেকে গেছে। সে-ক্ষেত্রে বাক্যকে অর্থপূর্ণ বা সেই শূন্যপূরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য দু'একটি শব্দ সংযোজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই প্রয়োজনের কারণে কোথাও বক্তব্যের কোনো রকম বিকৃতি যাতে না ঘটে, সে-সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়েছে।

৮.
অশক্ত-অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন। বিরক্তি নয়, মাঝে-মধ্যে শ্রান্তিবোধ করলে সামান্যক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার কথা বলা শুরু করেছেন। প্রসঙ্গের প্রকৃতি অনুসারে কণ্ঠ ওঠা-নামা করেছে– কখনো স্মৃতির আনন্দে উচ্ছল– কখনো বিষাদে নিমজ্জিত– কখনো ক্রোধ বা হতাশায় উত্তেজিত– আবার কখনো বা আশাবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে তাঁর কথামালায় একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তথ্যে-বক্তব্যে এই অন্তরঙ্গ কথোপকথন বহুমাত্রিক কবি সুফিয়া কামালের জীবন, সাহিত্য, সমাজকর্ম, ব্যক্তিগত অনুভব-উপলব্ধি ও স্মৃতি-অনুষঙ্গের এক প্রামাণ্য আত্মভাষ্য হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

আবুল আহসান চৌধুরী

<u>আলাপ-পর্ব</u>

আবুল আহসান চৌধুরী : শুরুতেই আপনার জন্ম– আপনার পরিবার-পরিবেশ সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে চাই।

সুফিয়া কামাল : আপনি বহুদূর থেকে এসেছেন আমার কাছে আমার খবর নেওয়ার জন্য, এজন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এই জীবন নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বলা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। কেননা আমি অসুস্থ। বিস্তারিতভাবে গুছিয়ে বলতেও পারবো না। একে তো বয়স হয়েছে তারপরে এখন গুছিয়ে বলার মতন সুস্থ মন আমার নাই। যতটুকুন জানতে চান আমি বলতে পারি। আমার জীবন নিয়ে অনেক বই-টই হয়েছে। আমার জন্ম-তারিখ আপনি যদি সেখান থেকে নিতে পারতেন, বোধ করি ভালো হতো।

আ.আ. : হ্যাঁ, আপনার ওপর তো অনেক লেখালেখির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বইও বেরিয়েছে। 'একালে আমাদের কাল'– এই নামে আপনার একটি স্মৃতিচর্চামূলক বইও আছে।

সু.কা. : কিছুটা। কিছুটা বেরিয়েছে। আরও আলোচনা রয়েছে। আপনি যতটুকু জানতে চান সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি। আর কিছু আপনি হয়তো বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

আ.আ. : আপনার জন্ম কোন সালে?

সু.কা. : এগারো, উনিশশো এগারো।

আ.আ. : তারিখ কি মনে আছে?

সু.কা. : সেই হিসেবে আষাঢ় মাসে আমার জন্মদিন। বাংলা ১০ই আষাঢ়। কিন্তু ইংরেজি হিসেবে ২০শে জুন চালু হয়ে গেছে– ২০শে জুন ১৯১১– এইটেই চালু হয়ে গেছে।

আ.আ. : আমরা তো জানি, আপনি বরিশালের খুব সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। তো আপনাদের সেই পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যদি দু'একটি কথা বলেন।

সু.কা. : দেখুন, পারিবারিক সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে এখন গুছিয়ে বলা কি সম্ভব? সেকালের সেই বিরাট জমিদারি– তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আজকালকার দিনের সঙ্গে সেই পরিবারের খাপ খাওয়ানো বড় মুশকিল। আর দীর্ঘকাল হয়ে গেছে। আমি তো এখন বার্ধক্যে উপস্থিত। ছোটবেলার সেইসব দিনের কথা মনে করলে এটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। কাজেই গুছিয়ে বলা ঠিক হবে কি না আমি জানি না। আমি আমার নানার বাড়িতে মানুষ। উনারা ছিলেন সেকালের নবাব পরিবারের মানুষ। ওখানে তাঁদের হালচাল, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরকম ছিল। আমি সেই আবহাওয়ার মধ্যে ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি। তাঁদের ভাষা ছিল উর্দু– তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ ছিল সেই আগেকার দিনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতোই মর্যাদাশীল। মেয়েরা বাংলা-ইংরেজি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। তবে আরবি-ফারসি-উর্দু এসবের চর্চা ছিল। শিক্ষিত পরিবার ছিল। এর মধ্যে ছোটবেলায় আমি মানুষ হয়েছি। তারপরে দুর্ভাগ্য তো অনেক রকম আসে। আস্তে আস্তে সব পরিবারেই একটা দুর্যোগের ছায়া নেমে আসে। দুর্ভাগ্য হলে সেখান থেকে বিচ্যুত হতে বেশি দেরি লাগে না। সেই হিসেবে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি নানান রকমের শোকাবহ ঘটনা– আস্তে আস্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও বাড়িঘর জমিদারি ইত্যাদি যাবার ফলে আমরা নানান দিকে নানান ভাবে ছিটিয়ে পড়ি। এই পর্যন্ত বলতে পারি। সেইসব দিনের বর্ণনা দিতে এখন আমি হতাশ হই।

আ.আ. : আপনার জীবনের খুব উল্লেখযোগ্য সময় তো বরিশালে কেটেছে, তাই না?

সু.কা. : বরিশালে, বরিশালেই কেটেছে আমাদের নানাবাড়ি শায়েস্তাবাদে। আমাদের দেশের বাড়িতেও কেটেছে। নদীর ভাঙনে আমাদের বাড়িঘর ভেঙে যায় যখন তারপরে আমরা চলে আসি বরিশাল থেকে কলকাতায়। প্রধানত সেখানে বসবাস শুরু হয় আমার কৈশোর জীবন থেকে।

আ.আ. : তারপর তো কলকাতা থেকে ফিরে এক নাগাড়ে

ঢাকাতেই?

সু.কা. : হ্যাঁ, সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ হবার পরেই ঢাকায় চলে আসি। সেই থেকে ঢাকাতেই আছি।

আ.আ. : আপনি লিখতে শুরু করলেন কিভাবে? এই প্রেরণাটা পেলেন কার কাছ থেকে?

সু.কা. : প্রেরণা কার কাছ থেকে পেয়েছি বলা মুশকিল। পরিবারটা তো শিক্ষিত পরিবার ছিল। আমাদের বাড়িতে আমার মামার মস্তবড়ো পাঠাগার ছিল। সবাই বলতো যে খোদা বক্সের পরেই তাঁর পাঠাগার বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানে নানারকম বইপত্র আসতো– বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি। মামা প্রায় সাত-আটটা ভাষা জানতেন। সংস্কৃত– অসমিয়া ভাষাও জানতেন। নানান রকম পত্র-পত্রিকা আসতো। কলকাতা থেকে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'– এইসব আসতো ওখানে। রবীন্দ্রনাথের নজরুলের লেখা বেরুতো ওখানে। লেখা দেখতাম। 'শিশু' বলে একটা পত্রিকা আসতো। তা বাংলা আমি জানতাম না। আমার মা আমাকে বাংলা শিখান। আমাদের পরিবারে বাংলা ভাষাটা ছিল না। আমার মা-ই আমাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। পড়তাম, পড়ে মনে হতো এঁরা যখন লিখতে পারেন, আমিও বোধ করি পারবো লিখতে। এই বলে বাংলা লেখা আমার শুরু হলো। কি লিখতাম তখন তো জানি না, পরে হাবিজাবি করে লেখার একটা অভ্যাস হয়ে গেল। মানুষের ওরকমই হয়। লেখার অভ্যাস হলো, আস্তে আস্তে লিখতে শিখলাম। অনেক লেখা-টেখার পরে যখন বিয়ে-শাদি হলো, তখন বরিশালে একটি পত্রিকা বেরুত 'তরুণ' বলে– অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলেরা বের করেছিলেন– সেখানে আমার স্বামী আমার লেখা নিয়ে যান। ওরা বললো, 'ভালোই তো হয়েছে লেখা। তোমাদের পরিবারে যে বাংলা লেখে সেটা তো আমরা জানতাম না।' সেই আমার প্রথম লেখা– বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হয়।

আ.আ. : সেই লেখাটি কি কবিতা ছিল?

সু.কা. : না, আমার প্রথম লেখা গল্প।

আ.আ. : এটা একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম আর কি !

সু.কা. : হ্যাঁ, এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, প্রথম আমার যে লেখা ছাপা হয়েছিল সেটা গল্প।

আ.আ. : গল্পের নাম কি মনে আছে?

সু.কা. : বোধ করি 'সৈনিক বধূ' বলে একটা গল্প লেখা হয়েছিল। সে তো বহুকাল আগে, তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ কি পনের বছর।

আ.আ. : আপনার বাংলা শেখা এবং এই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে বেগম রোকেয়ার বাংলা শেখা এবং সাহিত্যচর্চার বেশ খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সু.কা. : তা পাওয়া যায়। উনি তো সে রকমই। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। উনি সেরকমই একটা অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন। লেখাপড়া শিখতে কোন স্কুলে তো উনিও যান নি।

আ.আ. : তাঁদের পরিবারেও বাংলার চল ছিল না।

সু.কা. : না, প্রায় সব মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারেই বাংলা বেশি ছিল না। সবসময় দেখেছি উর্দু ভাষার চলন ছিল। আমাদের ওখানেও তা-ই ছিল। তো আমার মা আমাকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। আমার বাবা আমার মাকে শিখিয়েছিলেন, সেই হিসেবে আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন।

আ.আ. : মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও গদ্যেও আপনার চমৎকার হাত ছিল– খুব ভালো গদ্য লিখতেন। আপনার গল্প তো একসময় বেশ সমাদর পেয়েছিল। পরে আপনি সেই দিকটা উপেক্ষা করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু কেন?

সু.কা. : একসময় তো গদ্যই লিখতাম। গল্প-টল্প লিখতাম। কিন্তু বোধকরি সময়ের অভাবের জন্যই গদ্য লেখাটা কঠিন হয়ে গেছে। কবিতা লেখাটাই সহজ হয়ে গেছে। সেটিরই বেশি চর্চা হয়েছে। সময়ের অভাবে হয়তো গল্প লিখতে বসতে পারি নি কিংবা অন্য কাজে রয়েছি বলে চর্চা হয় নি।

আ.আ. : আমরা শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। আপনি তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পান। আপনার কবিতার প্রশংসাও করেছেন উনি– চিঠিপত্রও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগটা হলো কিভাবে?

সু.কা. : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হলো ওনার জন্মদিনে আমি একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। উনি তার উত্তরে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। এবং আমাকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন। ওনার বাড়িতে নাট্যোৎসব হতো, তাতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম।

আ.আ. : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে?

সু.কা. : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

আ.আ. : এটা কোন সালের দিকে?

সু.কা. : এইটেই তো আমি বলতে পারবো না। এটা ২৭-২৮ হতে পারে।

আ.আ. : তখন তো আপনি কলকাতাতেই থাকতেন!

সু.কা. : কলকাতাতেই থাকতাম।

আ.আ. : এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?

সু.কা. : হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আমাকে ডেকেছেন– নানা উৎসবে গিয়েছি। এমনিও দেখতে গিয়েছি। বরিশালে তো উনার বিয়াইবাড়ি ছিল। সেই হিসাবে উনি আমাকে খুব আদর করতেন। অনেক সময় ডেকে নিয়েছেন কাছে। কোনো ঋতু-উৎসবে নাটক-টাটক হলে আমাকে ডেকেছেন, আমি গিয়েছি।

আ.আ. : আপনার জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকার কথাও তো বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নজরুলের স্নেহ-

প্রীতি আপনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আপনার হয়েছে। নজরুলের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিভাবে হয়?

সু.কা. : আমি তখন বরিশালের 'তরুণ' বলে পত্রিকায় গল্প লিখেছি। মাঝে মাঝে কবিতাও দিতাম। আমাদের পরিবার তো আবার রক্ষণশীল পরিবার ছিল। আমি যে বাংলায় লিখি, কবিতা ছাপতে দেবো– সেটা আমার বড়মামা পছন্দ করতেন না। পরিবারের মধ্যে আমার একটা খুব দুর্নাম হয়ে গেলো যে আমি বাংলায় লিখি, বাংলা কাগজে বেরোয়। তো আমার নানা আমাকে একদম বারণ করে দিলেন যে আমার কোনো রকম লেখাটেখা যেন প্রকাশিত না হয়। ফেলে দিলাম, আমি কি করবো আর! আমার ছোটমামা তখন ঢাকায় পড়াশুনো করতেন। উনি আমার লেখার খাতা ওখানে নিয়ে গেলেন। ছোটমামা আমার বেশি বড় ছিলেন না। আমার ভাইদের বয়সী ছিলেন। তো ঐ খাতা উনি নিয়ে গেলেন সেখানে। ঢাকায় তখন একটা পত্রিকা বেরুত। গোলাম কাসেম কি, কি কাসেম!

আ.আ. : মোহাম্মদ কাসেম।

সু.কা. : মোহাম্মদ কাসেম 'অভিযান' বলে একটা পত্রিকা বের করতেন। তখন সেখানে উনি একটা কবিতা দেন। সে সময়ে নজরুল ইসলাম ঢাকায়, সাহিত্য সম্মেলন হলো, ঐ সময়।

আ.আ. : 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সম্মেলন?

সু.কা. : হ্যাঁ।

আ.আ. : 'শিখা'-গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এসেছিলেন নজরুল।

সু.কা. : বোধ করি। উনি তখন ঢাকায় এলেন। পত্রিকায় আমার লেখা দেখে লম্বা-চওড়া মস্তবড় একটা চিঠি লিখলেন– 'এইরকম কোনো মুসলমান মহিলা এত সুন্দর কবিতা লেখে...!' আগে অবশ্য মোতাহেরা বানুও লিখতেন, বরিশালের কবি। নজরুল আমাকে লিখলেন যে, 'মুসলিম মেয়ে এরকম একটা কবিতা লিখেছে এটা প্রশংসার কথা।' বরিশালের ঠিকানায় চিঠি লিখলেন। লিখলেন, 'এত সুন্দর কবিতা তোমার, প্রকাশিত হচ্ছে না এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।' আমাদের তখন কলকাতায় যাওয়ার কথা, নদীর ভাঙনে বাড়ি-টাড়ি ভেঙে গেছে, আমরা কলকাতায় যাব। উনি আমার মামার কাছে শুনলেন। তখন ঐ শুনে লিখলেন, 'শুনলাম, কলকাতায় যাচ্ছো! তা আমিও যাব কলকাতায়, তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি নাসিরউদ্দীনের কাছে– 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরউদ্দীন– তাঁর কাছে কবিতা পাঠাবে'– এই বলে উনি আমার কাছে চিঠি লিখলেন। সেই-ই প্রথম চিঠি

আ.আ. : এটা কোন্ সালের দিকের ঘটনা?

সু.কা. : সেই তো, আমি ঠিক মতো বলতে পারব না

আ.আ. : ২৭-২৮? না, তার পরে?

সু.কা. : না, ২৬-২৭।

আ.আ. : ২৬ বা ২৭ সাল যদি হয়, তখনও তো আপনি নজরুলকে সামনাসামনি দেখেন নি!

সু.কা. : না, দেখি নি। তারপরে আমরা বরিশাল থেকে কলকাতায় এলাম। আমরা একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। বাড়িতে অন্য ভাড়াটেরাও ছিল। তো একদিন হঠাৎ আমরা দেখি বাড়িতে এসে একজন বললো যে, 'আমি কবি সুফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' আমরা তো অবাক! আমরা তো তখন আবার কারো সামনে যাইনে, কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে তখন দেখা করিনে। আমার মা ও আমার আব্বার বারণ।

আ.আ. : তখন তো পর্দাপ্রথার বেশ কড়াকড়ি ছিল।

সু.কা. : হ্যাঁ, বেশ কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু নজরুল তো তা মানে না। একদম হৈ চৈ করে– 'কই, কোথায়, কোথায় কবি?' তখন মা-ও হকচকিয়ে গেছে, আমরাও হকচকিয়ে গেছি। কেউ বাড়িতে নেই, ভাই-বোনেরা সব কলেজে। তাঁকে তো আর ঠেকানো যায় না। 'কোথায়, কোথায়?' একদম ভিতরে গিয়ে আম্মাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। আমাকে বললেন, 'তুমি এতটুকুন মানুষ! আমি তো ভেবেছিলাম, কবি হয়েছ, কত বড়– মহা মস্তবড় একজন মহিলা!' সে-কথা আর বলা যায় না। আপনারা নজরুলকে দেখেছেন, কিন্তু সেই নজরুলকে দেখেন নি। 'তুমি আমার ছোট বোন'– সেই একই দিনে বলছেন– 'আগে তুমি আমাকে 'দাদু' বলে ডাকবে। তুমি আমাকে 'তুমি' বলবে। বলো– বলো, 'দাদু তুমি এসেছো', এই কথা বলো।' এই কথা আমাকে দিয়ে বলান। আম্মা তো সেকালের মানুষ আর পর্দানশীন। কে কার কথা শোনে! আম্মাকে বললেন, 'আমার খিদা পেয়েছে, আমি খাব।' এই তো পরিবারের মধ্যে একসাথে হয়ে গেলেন। দিনরাত আসা-যাওয়া। আমাদের ওখানে থাকতেন, আসতেন, গান করতেন– কত গান, কত গল্প, দিনের পর দিন। 'রোজ কবিতা লিখবে, রোজ একটা করে কবিতা লিখবে'– এই কথা উনি আমাকে বললেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রোজ একটা করে কবিতা লিখব।' এই কথাতেই বোধ করি গদ্য লেখাটা কমে এলো। তারপর তো 'সওগাত'-যুগে, 'সওগাতে'র নাসিরউদ্দীন সাহেব আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। লেখা পাঠিয়েছি, উনি দেখেছেন। 'সওগাতে'ই আমার লেখার শুরু। নাসিরউদ্দীন সাহেব আজকে নাই, তাঁকেও আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আ.আ. : এই 'সওগাত' পত্রিকার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক রচিত হয়, সেটা কি নজরুলের সূত্রেই?

সু.কা. : নজরুলের সূত্রে। এর আগে আমি কোনো লেখা পাঠাই নি।

আ.আ. : এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নজরুলের যখন খুব আর্থিক দুরবস্থা সেই সময় আপনি 'সওগাত'-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন খুবই আবেগতাড়িত হয়ে। সেই সময় একজন মুসলিম মহিলা কবি আরেকজন কবির

জন্যে যে এতখানি মমতা দেখাতে পারেন– সহায়তার জন্যে এত উদাত্ত আহ্বান জানাতে পারেন, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। সেই চিঠি সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

সু.কা. : নজরুল যখন অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়েন আমরা তো তখন কলকাতায় ছিলাম। উনি থাকতেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের কথা তাঁর বইতে আছে। 'মৃত্যুক্ষুধা'র মধ্যে এই চাঁদসড়কের বর্ণনা আছে। খুবই অর্থাভাবে পড়েছিলেন ছেলে, বউ এবং শাশুড়িকে নিয়ে ওখানে। তখন কবি মঈনুদ্দীন একদিন গিয়ে দেখলেন এরকম অবস্থার মধ্যে নজরুল। তারপরে ঢাকায় এলেন সাহিত্য সম্মেলনে। ঢাকায় কয়েকজন মিলে অপমান-টপমান করবার জন্য খুব চেষ্টা করলেন। তখন খবর পেয়ে আমি নাসিরউদ্দীন সাহেবকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে, এরকম করে তাঁর ওপরে অত্যাচার হচ্ছে। আমার তখন বয়স খুব অল্প তো, খুব মনে লেগেছিল। কৃষ্ণনগর থেকে কবি মঈনুদ্দীন নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে এলেন– নাসিরউদ্দীন সাহেব 'সওগাত' অফিসে তাঁকে জায়গা দিলেন।

আ.আ. : নজরুলের জন্যে নাসিরউদ্দীন সাহেবকে চিঠি লেখার তাগিদ আপনি কিভাবে অনুভব করলেন?

সু.কা. : ঐ-তো কলকাতায় নজরুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। তারপর যখন শুনলাম তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবে আর কষ্টে আছেন, তখন মনে একটা আবেগ এলো। তারপরে ঢাকায় ওঁর উপর একটা অত্যাচার হচ্ছে। সাধারণত যেমন নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য লাগে সেরকমই লাগতো। ওঁকে তো আমরা সবাই ভালোবাসতাম। পরিবারের লোকের মতোই ভালোবাসতাম। মনে তখন খুব কষ্ট লেগেছিল। তাই নাসিরউদ্দীন সাহেবকে ঐ চিঠিটা দিয়েছিলাম।

আ.আ. : নজরুল কি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে গান করতেন?

সু.কা. : হ্যাঁ, সবসময়, কত গান আমাদের বাড়িতে বসে করেছেন। কত গান গেয়েছেন। আমাদের বাড়িতে অনেক সময় থেকেছেন। গান গেয়ে– দাবা খেলতেন। আমার ভাই খুব ভালো দাবা খেলতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে রাতভর দাবা খেলেছেন।

আ.আ. : আপনি কি কখনো গানের চর্চা করেছেন?

সু.কা. : আমাদের তখন তো পড়াশুনাই করতে দিত না, গান গাইতে দেবে? মেয়েরা জোরে জোরে কথা বললেই– সর্বনাশ। তখন অবশ্য ঘরের মধ্যে মেয়েরা বিয়ের গান-টান গাইতো। চর্চা ছিল। কিন্তু মেয়েরা যে শিখবে এটা ছিল না। বিয়ের গান হতো, এমনি গান হতো, মিলাদ হতো, মেয়েরা সব মিলাদ পড়তেন। সবাই মিলে সেখানে গজল হতো– হাম্‌দ-না'ত হতো, কিন্তু গান শেখার কোনো চর্চা ছিল না।

আ.আ. : নজরুল কি কখনো আপনাকে গান শেখার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেছেন?

সু.কা. : না, তা করেন নি। খালি কবিতার কথা বলতেন, 'রোজ একটা করে কবিতা লিখবে।' উনি তো জানতেন যে, গান গাওয়া আমাদের হবে না।

আ.আ. : নজরুল আপনাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তখন কি আপনার কবিতা শুনতে চাইতেন?

সু.কা. : হ্যাঁ। 'কবিতা লিখেছো?'– যেয়েই আজকে লিখেছি কি না এইটা জিজ্ঞেস করতেন। বেশি তো আসতেন না। আর উনি তো ভীষণ বাইরে বাইরে থাকতেন। হয়তো একমাস পরে দুইদিন, তিনদিন, হয়তো রোজই আসতেন। ছ'মাস হয়তো আর পাত্তাই নেই। এরকম খেয়ালি মানুষ তো! হয়তো তিনদিন একটানা রোজ আসলেন– তিনদিন পরপর। আবার হয়তো মাসভর তাঁর পাত্তাই নেই। থাকলেই বলতেন, 'আজকে কবিতা লিখলে কি না?'– এইটে বলতেন।

আ.আ. : আপনারা কি কখনো নজরুলের বাসায় বেড়াতে গেছেন?

সু.কা. : হ্যাঁ, যখন পানবাগানে বাসা নিলেন, বেড়াতে গেছি। উনি তো থাকতেনই 'সওগাত' অফিসে, কাজেই একসাথে তো দেখাই হতো। তাছাড়া ওনার বাড়িতেও গেছি।

আ.আ. : নজরুলের দাম্পত্যজীবনটা কেমন ছিল?

সু.কা. : বড় ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল। খুবই ভালো ছিল। তাঁর বউ– এই যে আশালতা– নামটা প্রমীলা ছিল– আশালতার ডাকনাম ছিল দুলু–দোলন। এত শান্ত যে আমাদের খুবই ভালো লাগতো। আমাদের সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতো। তা ওনার শাশুড়ি অবশ্য একটু কড়া মেজাজেরই ছিলেন। বুঝতেই পারেন হিন্দু বিধবা মানুষ। তারপরে মুসলমানের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে এলে কিছু খেতেন না। আমাদের বাড়িতে আসতেন। সবসময় আসা-যাওয়া ছিল। বউ আসতেন, কাজীদা না আসলেও– হয়তো কলকাতায় নেই অন্য জায়গায় চলে গেছেন– তখন তাঁরা বেড়াতে আসলে উনি কিছু খেতেন না। তা আমার আম্মা বলতেন যে, 'দিদি, এখন তো মুসলমানের ঘরে বিয়ে হয়েছে, ছেলেপেলে হয়েছে।' বলতেন, 'না দিদি, তা হয়েছে। আমি রেঁধে দিই, বেড়ে দিই, মুরগি রেঁধে খাওয়াই। কিন্তু আমার একটা সংস্কার আছে, এইজন্য–' এইটে বলেছেন উনি। এটা স্বাভাবিক।

আ.আ. : নজরুল তো একটু বেহিসেবি, খানিকটা ঘরছাড়া– ছন্নছাড়া মতো ছিলেন। তো তাঁর দাম্পত্যজীবনে কি এর কোনো প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়?

সু.কা. : না, এটা আমি দেখিনি। বউকে নিয়ে আসতেন। হাসি-খুশি মেজাজ। তারপরে দেখেন চোদ্দ বছর বেচারি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এরকম অবস্থায় নজরুলকে মুখে তুলে খাইয়েছেন। যখন নজরুল অসুস্থ হয়ে গেলেন, নজরুল কারুর কথা শুনতেন না, তখন 'কবি' 'কবি' বলে ডাকলেই উনি পাশে এসে বসতেন। ভাত খেতে চাইতেন না। ওনার বউ বলতো,

'বসো, বসো'। ওখানে বসাতেন এবং শুয়ে শুয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে নজরুলকে খাওয়াতেন। আমি দেখেছি নিজের চোখে। দাম্পত্যজীবন বড় ভালো ছিল।

আ.আ. : আপনাদের কালে নজরুল সম্পর্কে বাঙালি সমাজের মনোভাবটা কেমন ছিল?

সু.কা. : তখন নজরুলকে আমরা বলতাম 'কাফের', আর হিন্দুরা বলতো 'নেড়ে'। এই করে তো তাঁর জীবন। পরে অবশ্য তিনি 'জাতীয় কবি' হিসেবে সম্মান পেয়েছেন– অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যে অবহেলা করা হয়েছে, যদি সেই সময় তাঁকে একটু ভালো করে রাখা হতো তাহলে তাঁর এই দশা হতো না। মধুসূদন দত্তের সাথে ওঁর অনেক মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন অন্যরকম– তাঁদের পরিবার, পারিবারিক পরিবেশও– তাঁরা সম্পদশালী ছিলেন। কিন্তু এই বেচারা নজরুলের যে কি রকম দিন কেটেছে আপনারা তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। বই লিখেছেন, বইয়ের বিক্রিও অনেক হয়েছে। কিন্তু কতটা যে উনি পেয়েছেন, সেটার হিসাব উনি কোনোদিনই নেন নি। হয়তো বইয়ের স্বত্ব দিয়ে দিলেন। কুড়িটা টাকা দিলেই মহাখুশি। বাড়ি ভাড়াটা দিল– তখন কতই বা বাড়ি ভাড়া ছিল– ষাট-সত্তর টাকা! নজরুল হিসাবও নেননি কত বই বিক্রি হলো, কত টাকা পেলেন! অনুগ্রহ করে যে যা দিয়েছে তাই নিয়েছেন। অর্থকষ্ট বড়ই ছিল। তারপর আস্তে আস্তে গ্রামোফোন কোম্পানিতে গেলেন। তা তাঁরা তো তাঁকে এমন ঘেরাই ঘিরলেন আর তো তা থেকে নজরুল বেরিয়ে আসতে পারলেন না। [অস্পষ্ট]। এরপর যখন তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন তখন আর গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে কিছুই দিলেন না।

আ.আ. : নজরুল তো নিজে গান লিখতেন। আপনি কবিতা লিখতেন। নজরুল কি কখনো আপনাকে গান লেখার ব্যাপারে কিছু বলেছেন?

সু.কা. : না, তা বলেন নি। কত গান লিখেছেন নিজে বসে বসে, গান শুনিয়েছেন, লিখেছেন।

আ.আ. : আপনাদের বাড়িতে বসে কি নজরুল কোনো গান বা কবিতা লিখেছেন কখনো?

সু.কা. : না, নিজে গান লেখেন নাই– গান শুনিয়েছেন। উনি তো লিখতেন না, গান লিখতেন না

আ.আ. : মুখে মুখে –

সু.কা. : মুখে মুখেই গাইতেন– সবসময়ই। নজরুল ইসলামের এইটা ছিল– 'সওগাত' অফিসেও দেখেছি– খাওয়া-দাওয়ার পরে বিকালে আমি তো প্রায়ই যেতাম 'সওগাত' অফিসে– হারমোনিতে হাত বুলোচ্ছেন– সুর উঠছে– সেই সুর দিয়ে তারপরে হয়তো কথা লিখে দিলেন। এই দেখেছি, ঐখানে বসে বসে।

আ.আ. : এই গান রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য বা মিলটা কি আপনার চোখে কিছু ধরা পড়ে?

সু.কা. : রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলকে মিলানো যায় না। মিল আকাশ আর সমুদ্র– দুটোই অপূর্ব।

আ.আ. : খুব সুন্দর বলেছেন। নজরুল তো তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্যটা খুব বেশি এনেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা গানে নজরুল একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন– এসব কথা যাঁরা গান বোঝেন তাঁরাই বলেছেন, বিশেষ করে দিলীপকুমার রায়।

সু.কা. : দিলীপকুমার রায় বলেছেন। তাছাড়া নজরুলের গজলের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বকবি, তাঁর নানান রকমের গান। আর নজরুলের গজলের দিকে বেশি একটা ঝোঁক ছিল, মনে হয়। আর সে হিসেবে তিনি লিখেও গেছেন অজস্র গজল। বাংলাতে গজলের সুরের চল ছিল না। তো উনিই চল করলেন। অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায়– এঁরা সব গান করেছেন। কে. মল্লিকের নাম তো আপনারা শুনেছেন। আমাদের বাড়িতে বসে কে. মল্লিকও গান করেছেন। উনি নিয়ে আসতেন– দিলীপ রায়কে নিয়ে আসতেন। আমাদের ওখানে গান-টান হতো। নিজেও বলতেন, 'এটা গাও'– আবার শেখাতেন। আব্বাসউদ্দীনকে দিয়েও গান গাওয়াতেন। তখনকার দিনে তো মাইক ছিল না। আমাদের দোতলায় বসে গান করতেন বা আবৃত্তি করতেন–নিচে মানুষ জমে যেত। এমন উদাত্ত কণ্ঠস্বর ছিল নজরুলের। আপনারা নজরুলকে দেখেছেন?– সেই নজরুলকে?

আ.আ. : সেই সৃষ্টিশীল প্রাণবন্ত নজরুলকে দেখার তো আর সুযোগ হয় নি।

সু.কা. : এখন তো মাইক না হলে একটা শব্দও কেউ উচ্চারণ করে না। কিন্তু নজরুল সেই খালি গলায় গান করেছেন– আবৃত্তি করেছেন। আর নিচে মানুষ জমে গেছে।

আ.আ. : নজরুলের গানের গলাটা কেমন ছিল?

সু.কা. : ওরকম গলা আমি আর শুনি নি। এত সুন্দর– এত উদাত্ত কণ্ঠ! আপনারা তো রেকর্ডে তাঁর আবৃত্তি হয়তো শুনেছেন!

আ.আ. : জী, শুনেছি।

সু.কা. : রেকর্ডের চেয়েও এমনি খালি গলায় শুনতে ভালো লাগতো। চেহারায় যেমন ছিল একটা ব্যক্তিত্ব আর গলাটাও তেমনি ছিল।

আ.আ. : আমরা শুনেছি, কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গে নজরুলের একধরনের বৈরী-শীতল সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারে আপনার কি কিছু জানা আছে?

সু.কা. : গোলাম মোস্তফা তো কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসেন নি। অবশ্য পরে দেখা ওনার সঙ্গে– তখন আমার আলাপ হয়েছে। উনি আমার কবিতা নিয়ে বই-টই ছাপিয়েছেন। তারপরে ঢাকায় আসার পরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল আমাদের। কলকাতায় থাকতে দু'একবার দেখেছি,

নজরুলের সাথে একটু বিরূপ মনোভাব ছিল। এটা নিয়ে অনেক হাসিঠাট্টা– অনেক কিছুই হয়েছে, আমি জানি।
কিন্তু একসাথে আমি দু'জনকে দেখি নি কখনো।
আ.আ. : সেই সময়ে নজরুলের অন্য বন্ধুরা, বিশেষ করে 'কল্লোল-কালিকলম' কিংবা 'সওগাত'– এইসব পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রধান লেখক যাঁরা– প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়– এঁদের সঙ্গে তো এক ধরনের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল নজরুলের। পত্রিকা অফিস ও বাইরে জমে উঠত তুমুল আড্ডা। তো নজরুলের এই আড্ডার ব্যাপারে আপনার কি কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা আছে?
সু.কা. : ঐতো 'সওগাত' অফিসেই তো হতো। 'সওগাতে'র সঙ্গে লেখকদের যোগাযোগ বিষয়ে 'বাংলাসাহিত্য সওগাত যুগ' বইটি আপনি পড়ে দেখতে পারেন। নাসিরউদ্দীন সাহেবের ওখানেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলুন, নলিনীকান্ত সরকাররা সব ওখানে আসতেন। একটা আড্ডা জমতো। সবাই ওখানে–এই যে ডি.এম. লাইব্রেরির এঁরা– কল্লোলযুগের বুদ্ধদেব বসু। তখন বুদ্ধদেব বসু অতোটা বিখ্যাত হন নি। তখন এই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন মিত্তির এরাই বেশি করে ওখানে জাঁকিয়ে বসতেন। 'সওগাত' অফিসেই বেশি আড্ডা জমতো, সেটা আমি জানি। ওখানেই দেখা হয়েছে। তারপরে ওয়াজেদ আলী সাহেব ছিলেন, আবদুল কাদির, আমাদের দেশের অনেকেই। ওখানে যাঁরা *যাঁরা ছিলেন সবাই তখনকার দিনের উদীয়মান লেখক।* হাবিবুল্লাহ বাহার– সবাই তো ওখানে আড্ডা দিতেন।
আ.আ. : নানা প্রসঙ্গে তো নজরুল আপনাকে বেশকিছু চিঠিও লিখেছেন শুনেছি। সেসব চিঠিপত্র কি ছাপা হয়েছে কোথাও?
সু.কা. : নজরুলের যতগুলো বই বেরিয়েছিল সমস্ত বই তিনি নিজের হাতে আমাকে দিয়েছেন লিখে। আর চিঠিপত্র বেশি দেন নি, দূরে গেলে চিঠি লিখতেন। [*অস্পষ্ট*]। আমার একটি মেয়ে ছিল তখন, মেয়েটিকে খুব আদর করতেন। তারপর নজরুল যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন 'নজরুল নিরাময় সমিতি' বলে একটা কমিটি হয়েছিল, বোধ করি আপনারা জানেন না। জানেন কি?
আ.আ. : হ্যাঁ, শুনেছি।
সু.কা. : হ্যাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন, ঢাকায় কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব তো কলকাতায় থাকতেন। আর রবীউদ্দীন বলে একজন–
আ.আ. : রবীউদ্দীন গুণী মানুষ ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মূলে তাঁর কিছু অবদান ছিল। উনি তো ওদুদ সাহেবের বাসাতেই থাকতেন।
সু.কা. : হ্যাঁ, ওখানেই থাকতেন। [*অস্পষ্ট*]। তা উনি ঐ সমিতিটা গঠন করে ঢাকায় এলেন। আগে থাকতে আমরা জানতাম উনি নজরুলের হিতৈষী মানুষ। এঁরা মিলে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করলেন। তা উনি বললেন, 'অনেকের কাছে নজরুলের বইপুস্তক চিঠিপত্র আছে। আপনার কাছেও তো আছে।' নজরুলের বইগুলো আমার কাছে ছিল। 'ভাঙ্গার গান' মানে বাজেয়াপ্ত বইগুলো থেকে শুরু করে শেষ বইটা 'চক্রবাক' পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। আর কোনোখানে কপি পাওয়া যায় না। তা আমাকে বললেন, 'এগুলো আমার কাছে দেন, আর রবীন্দ্রনাথের চিঠি আর নজরুলের চিঠি আমাকে দেন। আমি 'নজরুল নিরাময় সমিতি' করেছি। এগুলো এক্সিবিশন করে, ফটোকপি করে আপনাকে ফেরত দেবো।'– তখন তো আর ফটোকপি করা যেত না, তবু উনি বলেছিলেন যে, 'এগুলো কপি করে আপনাকে দেবো। আর এইটার একটা এক্সিবিশন করে টিকিট করে নজরুল সাহায্য সমিতির টাকা উঠবে।' তা আমি বললাম যে, 'এগুলো কবির দেওয়া আমার অমূল্য স্মৃতি।' আমার স্বামী বললেন যে, 'এরকম এত করে যখন বলছেন, তুমি দিয়ে দাও।' রবীউদ্দীন সাহেব আবারও বললেন, 'তা দেন, আমি নিয়ে যাই, আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেবো।' ওগুলো যখন নজরুলের জন্য চাইছে না দিয়ে পারলাম না। সব নিয়ে গেলেন উনি– নিয়ে ওনার বাড়িতে রাখেন। তখন বোধ করি নক্‌শালের না কিসের বোমা পড়লো বাড়িতে। বইপত্র সব, ওনারও নিজের লেখা বইপত্র দলিলপত্র অনেককিছু সব শেষ হয়ে গেল। আমার গুলোও শেষ হয়ে গেল। এই দুঃখ আমি আর ভুলতে পারি না। এই দুঃখের *কথা– আর বলবেন না। একটু চিহ্ন রইল না নজরুলের* কোনো। শান্তিনিকেতনে গেলাম পরে ওখান থেকে অবশ্য ওঁরা আমাকে রবি ঠাকুরের চিঠিপত্র কপি করে দিলেন। উনি তো আবার কপি-টপি রাখতেন। নজরুল এসব কপি-টপি রাখতেন না। কিন্তু ওনার কপিগুলো পেলাম– রবি ঠাকুর আমাকে যে চিঠিপত্র লিখেছেন তা পেলাম, কিন্তু নজরুলের আর কোনো চিহ্ন রইল না। আমার জীবনে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এই দুঃখটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। একটুও চিহ্ন রইল না।
আ.আ. : আপনাকে লেখা নজরুলের কোনো চিঠিই কি ছাপা হয় নি?
সু.কা. : না, একদম সব শেষ।
আ.আ. : মোটামুটি কতগুলো চিঠি নজরুলের কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন?
সু.কা. : বেশি চিঠি না। তিন-চারটে হয়তো চিঠি ছিল। এমনিতে তো সবসময়ই আসা-যাওয়া করতেন। চিঠি তো বেশি লেখালেখি হতো না।
আ.আ. : এইসব চিঠির প্রসঙ্গ কি ছিল?
সু.কা. : এই ধরেন ঢাকা থেকে চিঠি লিখলেন– কিংবা কৃষ্ণনগর থেকে চিঠি লিখলেন, এ-ই কবিতার জন্যই– কবিতার কথাই– ভালো করে লিখতে বলতেন, বলতেন,

'ছাপতে পাঠিও অমুক পত্রিকায়'। অনেক পত্রিকা তো তখন কলকাতায় বেরুতো। উনি যে যে পত্রিকায় লিখতেন সেসব পত্রিকায় লেখা পাঠাতে বলতেন। তো আমি একটু লাজুক ছিলাম, আমার ভয় করতো, কোনখানে পাঠাবো, হাতের লেখাও ভালো ছিল না। আমি তো লেখাপড়াও কোথাও শিখি নি। খুব লজ্জা করতো, হাতের লেখা আর পাঠাতাম না। উনি লিখতেন। এই তিন-চারটে চিঠি, খুব বেশি না। একবার কৃষ্ণনগর থেকে একটা লিখলেন, ঢাকা থেকে দু'খানা লিখেছিলেন। আরেকবার বোধ করি বিষ্ণুপুর না কোথায় গিয়েছিলেন– ঐখান থেকে লেখেন, 'তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। তুমি যদি দেখতে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। তোমার ভাবীও আমার সাথে আছেন– উনিও বলেন'। মানে নজরুলের বউ-এর কথা।– 'উনি তোমার কথা মনে করছেন, তুমি দেখলে খুব খুশি হতে'। কোথায় যেন– বিষ্ণুপুর না কোথায় গেছিলেন।

আ.আ. : এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলি। যদিও একটু সঙ্কোচও বোধ করছি। নজরুল আমাদের একজন প্রধান কবি। তাঁর কালের ও কাছের মানুষ আজ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। যাঁরা খুব কাছ থেকে নজরুলকে দেখেছেন আপনি তাঁদেরই একজন। আমরা জানি যে, নজরুলের জীবনে নানাভাবে অনেক নারী এসেছেন– নার্গিস আসার খানম, ফজিলাতুন্নেছা, রাণু সোম (পরবর্তীকালের প্রতিভা বসু), উমা মৈত্র, জাহানারা চৌধুরী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, কানন দেবী এবং আরও কারো কারো নাম বলা যায়। তো এঁদের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কটা কেমন ছিল বা নজরুল কি ধরনের সম্পর্ক এঁদের সঙ্গে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন?

সু.কা. : এইসব বিষয়ে কিন্তু কোনোদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় নি আমার। আঙুরবালার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ঐ 'দাদা–দাদা' বলে প্রণাম করেছেন। আঙুরবালা তো একবার ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় এলে তখন বললেন 'দাদা'র কথা। প্রতিভা বসু বা নার্গিস আসার খানমের সাথে দেখা হয় নি। ফজিলাতুন্নেছা– উনি তো ঢাকায়ই ছিলেন। ওঁর সঙ্গে বা আর কারুর সঙ্গে আমার এসব বিষয়ে কোনো কথাই হয় নি। তবে ফজিলাতুন্নেছা যখন বিলাতে গেলেন না!– অনেক চেষ্টা করেই তো ওনাকে পাঠানো হলো। তখন একটা সংবর্ধনা দেওয়া হলো 'সওগাত' অফিসে। নাসিরউদ্দীন সাহেবের ওখানে ফজিলাতুন্নেছা থাকলেন। ওখান থেকে বিলেত যাওয়ার পাসপোর্ট-টাসপোর্ট ইত্যাদি যত কিছু– নাসিরউদ্দীন সাহেব খুব করেছেন। তা না হলে তাঁর বিলেত যাওয়া হতো না। একদম সেই ভাইস-চ্যান্সেলরকে ধরে-টরে পাঠানো হলো– একটি মুসলমান মেয়ে যাবে। আমি তো তখন তার সাক্ষী মতো ছিলাম। তখন তো 'সওগাত' অফিসে দেখেছি একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেছেন উনি [নজরুল]। যাওয়ার সময় একটা কবিতা লিখে বিদায়-সংবর্ধনা দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছু দেখি নি।

আ.আ. : ফজিলাতুন্নেছার সঙ্গে নজরুলের কিছুটা রোম্যান্টিক সম্পর্কের কথা কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্মৃতিচর্চায় উল্লেখ করেছেন এবং মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠিপত্রেও কিছু কথা জানা যায়। তা এ-সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

সু.কা. : এ-সম্পর্কে আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয় নি। কাজী মোতাহার হোসেন আপনার মামা তো!– আমরা তাঁকে 'আব্বু' বলতাম, উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার স্বামী তো ওনার হোস্টেলে থাকতেন। বিয়ে হওয়ার পর কলকাতায় উনি আমাকে দেখলে তো খুবই আদর করতেন। উনি বলতেন, 'আমার একটি মেয়ে'। এখনও ওরা সেই হিসেবেই বলে যে, 'আব্বুর আরেকটা মেয়ে'। ওঁদের কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান হলে আমাকে খবর দেয়। তো এইসব কথা নিয়ে ওনার সাথে আমার কোনো আলোচনা হয় নি।

আ.আ. : প্রতিভা বসুর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ছিল

সু.কা. : আমি যখন কলকাতায় তখন উনি ঢাকায়। আবার আমি যখন ওখানে গেলাম, শুনলাম উনি শান্তিনিকেতনে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে গেলাম, শুনলাম উনি কলকাতায়। এখন তো উনি চলাফেরা করতে পারেন না, পঙ্গু হয়ে গেছেন। কাজেই আমার দেখা হয় নি।

আ.আ. : নজরুলের জীবনে তো এইসব রমণীর প্রভাব-প্রেরণা আছে, নজরুলের গান, তাঁর কবিতায়–

সু.কা. : এইসব শুনেছি, কিন্তু আমার চোখে কোনোদিন পড়ে নি। আমাদের সাথে তো খুব মেলামেশা করেছেন। আঙুরবালা, সাহানা দেবী, কাননবালা– এদের সঙ্গে সব নাচ-গান করতেন, শুনেছি। আঙুরবালা তো কবিকে দেখতে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। তখন দেখি– এই শেষ দেখা– 'দাদা–দাদা' বলে নমস্কার করে বলেন, 'উনি তো আমাদের দেবতা।'

আ.আ. : নজরুল তো ওঁর 'সঞ্চিতা' বইখানা ফজিলাতুন্নেছাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। চিঠিতে সেই খবর জানা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফজিলাতুন্নেছা সাড়া দেন নি।

সু.কা. : হ্যাঁ, সে তো শুনেছি। বোধ করি আপনারাও শুনেছেন। আমি তো এসব কথা নিয়ে 'আব্বু'র সাথে কোনো আলোচনা করি নি।

আ.আ. : 'আব্বু' মানে কাজী মোতাহার হোসেন তো

সু.কা. : হ্যাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন। ওনার চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কেউ ছিল না। সুখে-দুঃখে যেমন বিদ্যাসাগর ছিলেন মধুসূদন দত্তের, তেমনি 'আব্বু' ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের।

আ.আ. : নজরুলের এই যে অসুস্থতা– এর মূলে কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

সু.কা. : নানান জনে নানান কথা বলে। কিন্তু কি যে হলো ! আসল কথা তাঁর দুঃশ্চিন্তা। তিনি তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ছিলেন মধুসূদন দত্তের মতো। মধুসূদন কত বড় পরিবার থেকে এসে একদম নিঃস্ব হয়ে গেলেন, আর বেচারা নজরুল নিঃস্বের ঘর থেকে এসে চেয়েছিলেন একটু আরামে থাকবেন। কিন্তু সেইটা তাঁর কপালে হয় নি। দারিদ্র্য ওনাকে খুব বিপর্যস্ত করেছে। আমার মনে হয় যেটি, যদি সময় মতো একটু সচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারতেন, চিকিৎসাটা ভালো হতো, তাঁর বউ ওরকম হঠাৎ অসুস্থ না হয়ে পড়তেন– তাহলে বোধ হয় এইটা হতো না। আমার তাই মনে হয়। সংসারে– ঐ যে বলে উদাসীন, সত্যি একজন উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সংসার-ছেলে-বউকে এত আদর করতেন– না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমরা তো নিজের চোখে দেখেছি। ছেলেদের এত ভালোবাসতেন– ওঁর ছেলেটা মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। তারপরে বউ পঙ্গু হয়ে গেলেন– এইসব নানা দিক দিয়ে উনি খুব মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। ওনার খালি মনে হতো পয়সা নেই বলে ভালো চিকিৎসা করাতে পারলেন না। এই দুঃখটা মন থেকে কখনো যায় নি।

আ.আ. : নজরুলকে যখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় আনা হলো, সেই সময় কি আপনি দেখতে গিয়েছিলেন ওঁকে?

সু.কা. : আমি তো প্রায়ই যেতাম। কিন্তু আমার ভালো লাগতো না। গেলে খুব বিষণ্ন হতাম। অথচ আমি গেলে চিনতে পারতেন উনি। গেলে হাত ধরে বসে থাকতেন। আর সবাই বলতো, 'বোধ করি আপনাকে চিনেছেন'। সবাই গেলে অনেক চিৎকার করতেন, রাগ করতেন। আমি গেলে এইটা করতেন না। হাতটা ধরে বসতেন। কি কি সব দেখাতেন। আমার খুব কষ্ট হতো, এজন্য আমি প্রায়ই যেতাম না। আমার খুব কষ্ট লাগতো। শুধু তাঁর মুখের একটা কথা যদি আপনারা শুনতে পেতেন, কি রকম যে–

আ.আ. : একজন শিল্পী হিসেবে– একজন লেখক হিসেবে নজরুলকে কিভাবে বিচার করেন?

সু.কা. : সেই তো বললাম যে, সমুদ্রের কোনো তুলনা হয় না। কিভাবে আপনাকে বোঝাব? নজরুলকে যখন এখানে আনে আমার খুব ভালো লাগে। কারণ এখানে এসে উনি আদর-যত্ন পেয়েছেন। কলকাতায় আমি গেছিলাম তাঁকে দেখতে। কিন্তু সেই মানুষ আর দেখি নি। আগেও যখন মুসলমান সমাজ তাঁকে অবহেলা করেছে, তখন থেকেই ওনার মনে একটা আঘাত ছিল। তখন যদি একটু যত্ন করতো তাহলে উনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু সেই সময় যা অবহেলা হয়েছে! ওদিকে হিন্দুরা, তখন তারা বলা শুরু করলো– 'নেড়ে', আর মুসলমানরা বলতো– 'কাফের হয়ে গেছে'। কত রকম, কত রকম কথা হয়েছে। কিন্তু তা উনি উড়িয়ে দিয়েছেন। হেসে-খেলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মনে কিন্তু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত আহত হয়েছেন।

আ.আ. : এমন মানুষ তো আর জন্মালো না– এমন বিশুদ্ধ বাঙালি এবং পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক– এমন মানুষ!

সু.কা. : একজন রবীন্দ্রনাথ, আর-একজন নজরুল। যুগে যুগে একজনই হয়। বেশি হয় না। আপনারা অবশ্য ছেলেমানুষ, আমি তো দেখে গেলাম। এই যে এক-একজন, যুগান্তকারী একজন এক-এক যুগের উপর এসে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যান। মুসলমান সমাজকে নজরুল জাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

আ.আ. : নজরুলের গান তো আপনাকে নিশ্চয়ই টানে। তো আপনার খুব প্রিয় নজরুলের দু'একটি গানের কথা বলবেন?

সু.কা. : আমার প্রিয় গান তো অনেকই আছে। ক'টা শুনতে চান?

আ.আ. : দু'একটির উল্লেখ করলেই চলবে, যা আপনাকে খুব নাড়া দেয়, অভিভূত করে।

সু.কা. : একটা গান আছে না,– 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়'। তারপরে 'আসে বসন্ত ফুলবনে'। তারপরে ইসলামি গান তো অনেক রকম আছে। অনেক গান আছে। কিছু গান আছে যার তুলনা হয় না। নজরুলের গান তো মানুষের মধ্যে সৌকুমার্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমান মেয়েরা যে কথা বলতে পারে, মুসলমান মেয়েরা যে লিখতে পারে, মুসলমান মেয়েরা যে গান করতে পারবে এটা কিন্তু আগে কেউ সাহস পেতো না। নজরুলই মুসলমানের ঘরে ঘরে গানের প্রচার করে একটা জাগরণের সুর সৃষ্টি করে গেছেন। আকাশটা বাড়িয়েছেন গানের, কবিতার, সাহিত্যের।

আ.আ. : নজরুলের কবিতা– অনেক কবিতাই তো নিশ্চয় আপনার প্রিয়। তার মধ্যে দু'একটি কবিতার কথা বলুন যা আপনাকে খুব মুগ্ধ ও প্রাণিত করে।

সু.কা. : হ্যাঁ, 'নারী' কবিতা, 'সাম্যবাদী'– সব কবিতাই আগে মুখস্থ ছিল। এখন তো বলতে পারবো না। 'সাম্যবাদে'র কবিতা, 'নারী' কবিতার কথা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমরা তো নিজের মুখেই শুনেছি, এখন আর কি বলবো আপনাকে ! এখন তো অন্যের মুখে শুনতে আর অতোটা ভালো লাগবে না। সে রকম আবৃত্তিও আর কেউ করতে পারবে না– সেই গলাও আর কারো নাই। তবু যখন শুনি তখন ভালো লাগে। অনেকে নজরুলগীতি গায়। এটা আবার এখন নজরুলসংগীত হয়েছে, আগে তো নজরুলগীতি ছিল। এখন নজরুলসংগীত গায়। এখানে ঢাকায় প্রথমে নজরুলসংগীত গায় সুধীন দাশ। নজরুলসংগীতটা সুধীন দাশ আর সোহরাব হোসেন– এই দু'জনেই ঢাকায় স্থায়ী করে নিয়েছে। এর আগে ঢাকায় এত চল ছিল না।

আ.আ. : নজরুলের প্রেমের কবিতা আপনার কেমন লাগে?

সু.কা. : প্রেমের কবিতা তো তাঁর সবগুলোই ব্যথার কবিতা– সবগুলোই। এই নিয়েই তো একটা জীবন শেষ করে দিলেন নিজের।

আ.আ. :এইসব কবিতার পেছনে কবির নিজের জীবনের ব্যথা-বেদনা কি লুকিয়ে নেই?

সু.কা. : হ্যাঁ, ব্যথা– সব শূন্যতা নিয়ে তাঁর ঐসব লেখা। তাঁর কবিতাগুলো সব শূন্য, কোনোখানে তার পূর্ণতা নেই। আপনিও নিশ্চয় পড়েন, বুঝতে পারেন। এই সমস্তটা, সব জায়গায় তাঁর একটা ব্যর্থতার মধ্যে, একটা ব্যথার মধ্যে, সব অপূর্ণতার মধ্য দিয়ে ওঁর কবিতা। এত ব্যথা এত বেদনা আর যেন কোনোখানে নেই। তাঁর সারাটা জীবন এইরকম কেটে গেছে। মুহূর্তের জন্যও বেদনা তার কখনো যায় নি। সেই যে সমুদ্রের এত গর্জন, সেই গর্জনই রয়ে গেল। অবশ্য তিনি লিখেছিলেন, 'সেই দিন হব শান্ত'। কিন্তু সেই দিন আর ওঁর জীবনে আসে নি। এইটেই বড় দুঃখ।

আ.আ. : নজরুলের মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি-সমাদর কি যথাযথভাবে হয়েছে বা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সু.কা. : শুনুন, একদম যে হচ্ছে না তা নয়। মানে যারা অন্তর দিয়ে করছে, যারা তাঁর ভক্ত, যারা বোঝে– তাদের মধ্যে নজরুল তো চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেনই, আর চিরকালই দেশে-বিদেশেও তিনি থাকবেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যে প্রহসন হচ্ছিল এইটা আমার খুব ভালো লাগে নি। এখন অবশ্য তা নেই। তাঁর মূল্যায়ন তো কেউ কোনোদিন করতে পারবে না। রবি ঠাকুরই বলেন– আর নজরুলই বলেন, মূল্যায়ন সহজ নয়। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তার কতখানি আমরা দিতে পারি! আমরা প্রকাশ করতে পারি নি। যারা করছে তারা কি অতখানি প্রকাশ করতে পারে? কিন্তু শেষজীবনে নজরুল এখানে এসে যে সম্মান পেয়েছেন, এটা যদি একটু আগে হতো তা'হলে ভালো হতো। শেষজীবনে আমরা তাঁকে বড় অবহেলা করেছি।

আ.আ. : পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে– এই দুই দেশে তো নজরুল নিয়ে নানা আলোচনা-গবেষণা হচ্ছে। নজরুলসংগীতের চর্চাও হচ্ছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার নানা ব্যবস্থা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গেই বেশি কাজ হচ্ছে,– না, বাংলাদেশে?

সু.কা. : আমি বহুকাল পশ্চিমবঙ্গে যাই নি, বুঝলেন। ওঁদের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আপনারা তো যান, আপনারা আমাকে বলতে পারেন, আমি তো যাই না। তবু ওখানে এখন নজরুলকে অনেকেই স্মরণ করেন, অনেকেই করেন। বাংলাদেশে তো বেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান হয়– নজরুল একাডেমীতে হয়। রফিকুল ইসলাম আছেন না? তিনি তো গবেষণা করে যাচ্ছেন, গবেষণামূলক অনেক বই-টই বের করেছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধও বেরিয়েছে

আ.আ. : নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায়।

সু.কা. : হ্যাঁ, ওটা তো সরকারি। খুব ভালোই হয়েছে। মাহফুজউল্লাহ একবার চলে গেলেন আবার এসেছেন। ওতো আমার বাড়ির পাশেই–

আ.আ. : নজরুল ইনস্টিটিউট কেমন কাজ করছে?

সু.কা. : আমি তো এসব সরকারি ব্যাপারে এখন যাই না। আমার কারো কাছে যেতে খুব সংকোচ লাগে। জানি যে করতে পারবো না কিছুই। জানি যে ভালো কাজই চলছে। শুনলাম অনেক বই-টই– গবেষণামূলক বই বেরিয়েছে। এই তো শুনেছি আমি। এখন তো যেতেই পারি না, হাঁটা-ফেরা করতে পারি না। আপনারা যান না নজরুল ইনস্টিটিউটে?

আ.আ. : হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে যাই। আপনি কি মনে করেন, আমাদের দেশে নজরুলচর্চার জন্যে, নজরুল-স্মৃতিরক্ষার জন্যে যা করা হচ্ছে তা কি যথেষ্ট, না আরও কিছু করা উচিত?

সু.কা. : আর কিছু করা মানে তাঁর এই সাহিত্যগুলো বাঁচিয়ে রাখা দরকার। এর চেয়ে বেশি কিছু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়, সেটা ভালো না। এইটাকে তারা ব্যাপকভাবে যদি করে সেইটেই ভালো। আর এটার চর্চাটা যাতে বজায় থাকে সেটা করাই উচিত। এর চেয়ে বড় একটা বাড়ি করে হ্যান্ করবো ত্যান্ করবো– ওসবে হবে না। আসল কথা হচ্ছে যে, এটা মানে নজরুলের সাহিত্য ঘরে ঘরে প্রচার করা, যা করে সবাই তাঁর মর্যাদা বুঝতে পারে। সেটা করলেই ভালো হবে।

আ.আ. : আপনাদের সময়ে নজরুলের গান যে সুরে গাওয়া হতো, এখনকার গায়কির সঙ্গে তার কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?

সু.কা. : কিছু কিছু জিনিস বুঝি। আমরা শুনি যে সে তো অনেক রকম সুর, নানারকম সুর। তখনই মনে হয় এই সুর আমাদের সময় ছিল না। নজরুল থাকলে এসে এক থাপ্পড় লাগাতেন। উনি তো নিশ্চয়ই এরকম করতেন। আব্বাসউদ্দীনও থাপ্পড় লাগাতেন। আমরা তো দেখেছি, হাতে করে গান শিখিয়েছেন। এই কে. মল্লিক গান করতেন, আব্বাসউদ্দীন সাহেব গান করতেন। আব্বাসউদ্দীন সাহেব অবশ্য আমাদের বাড়িতে কখনো আসেন নি। নজরুল কে. মল্লিককে নিয়ে এসেছেন– দিলীপ রায়– এঁদেরকে নিয়ে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। কত গান করেছেন। গানে একটুও ত্রুটি উনি সহ্য করতে পারতেন না।

আ.আ. : নজরুলকে ঘিরে তো আপনার অনেক স্মৃতি, অনেক অনুভূতি,– তো সেই নজরুলকে নিয়ে আপনি কি কোনো কবিতা লিখেছেন?

সু.কা. : প্রচুর কবিতা লিখেছি, তার কোনো অন্ত আছে!

আ.আ. : কোনো কবিতার কিছু অংশ কি আপনার স্মরণে আছে?

সু.কা. : এইটেই আমি বলতে পারবো না। আমার কবিতার দুটো লাইনও আমার মনে নেই। অনেক কবিতা নজরুলকে নিয়ে লিখেছি। এখন আর বলতে পারি না। অনেকদিন হয়ে গেছে।

আ.আ. : আপনার কাব্যচর্চায় নজরুলের প্রভাব কিভাবে আপনি স্বীকার করেন?

সু.কা. : ঐ-তো তিনি নিজেই আমাকে উৎসাহ দিলেন।

বললেন, 'নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে লেখা পাঠাও'। নাসিরউদ্দীন সাহেবকে আবার বলেছেনও। তা না হলে তো কোনো যোগাযোগই হতো না।

আ.আ. : সেটা তো গেলো আপনার প্রেরণাগত দিক। আমি বলছি যে তাঁর কাব্যভাবনা বা শৈলীর দিক থেকে কোনো প্রভাব আপনার উপরে কি পড়েছে?

সু.কা. : হ্যাঁ, ঐ তো বললাম যে আমি তখন থেকেই নজরুলের কবিতার ভক্ত, যখন আমি পড়তে-লিখতে শিখলাম। আমি বললাম যে আমাদের ওখানে মেয়েদের বাংলা শেখা বা বাংলা লেখা তো নিষিদ্ধ ছিল। অনেক পত্র-পত্রিকা আসতো। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', তারপরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'। তখন আমি বানান করে করে একটু শিখতে লাগলাম। তখন নজরুলের একটা লেখা দেখলাম, 'হেনা' বলে একটা উপন্যাস ছিল ঐ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় [*উপন্যাস নয়, গল্প– কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।– আ. আ. চৌ.*]। ঐ-টা পড়ে সেই সময় আমার মনের মধ্যে একটা অসম্ভব রকমের আবেগ তৈরি হলো যে, লিখতে আমিও বোধকরি পারবো। এত ভালো লেগেছিল! তখন আমার বয়স কত– অনুভূতি বলতে যে কি আছে জানি না। এই রকমই বোধ করি হয়, সবারই বোধ করি হয়। এইভাবে লেখার দিকে আমার একটু ঝোঁক এলো– ভাবলাম, আমিও চেষ্টা করবো এরকম করে। এত সুন্দর ছিল লেখাটা। আর 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলাম। তখন সেই কবিতার স্বাদটা আমার মনে আছে। তখন আমার বয়স কত– এই দশ-এগারোর বেশি হবে না। এখন বলতে গেলে অনেক কথা আসে, সেই আমাদের বাড়ি-ঘর– সেই প্রাসাদের মতো বাড়িটা– আমার সঙ্গী-সাথী কেউ ছিল না। এই বই নিয়ে আমি থাকতাম, ঐখানে পড়ে পড়ে চুপচাপ করে পড়তাম। চুরি করে বাংলা শিখেছিলাম, আমার আম্মা অবশ্য বাধা দিতেন না। বসে বসে মনের মধ্যে একটা ভাবনা জাগতো– এত সুন্দর কারা লিখতে পারে? এত সুন্দর যারা লিখতে পারে, না জানি তারা কি রকম মানুষ! তারপরে বেগম রোকেয়া লিখতেন, বেগম সারা তৈফুর, সৈয়দা মোতাহেরা বানু লিখতেন। এই দেখে দেখে আমার মনে হলো যে ওঁরা তো লিখতে পারেন, বোধ করি আমিও লিখতে পারবো। হিন্দু মহিলারা তো অনেকে লিখতেন তখন। মুসলমান মহিলারা তো তখন বেশি লিখতেন না। তখন তো বেগম রোকেয়াই লিখতেন আর বেগম সারা তৈফুর লিখতেন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু কবিতা লিখতেন।

আ.আ. : আপনার এই যে সামাজিক চেতনা ও কাজ এবং প্রতিবাদী ভূমিকা– এর মূলে নজরুলের কোনো ভূমিকা বা প্রভাব কি আছে?

সু.কা. : নজরুলের কবিতা পড়ে– অবশ্যই 'সাম্যবাদী' কবিতা-টবিতা পড়ে– 'নারী' কবিতা পড়ে আমার ভিতরে একটা চেতনার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু এটা হলো অন্যদিক। এটা কি করে যে গেলাম– অনেকেই বলেন, শহীদুল্লাহ কায়সার বলতেন, 'খালাম্মা, আপনি এত বড় ঘরের মেয়ে, পর্দানশীন ঘরের মেয়ে, সমাজের কাজে মাটিতে কি করে নেমে এলেন?' সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। তবে বরিশালে অশ্বিনীবাবুর ওখানে তাঁরা 'তরুণ' বলে পত্রিকা বের করতেন, সেই অশ্বিনীবাবুর ভাইয়ের ছেলের বউ বাসন্তী দেবী–এঁরা ওখানে 'মাতৃমঙ্গল' নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। আগেকার দিনের বরিশালের হিন্দু মহিলারাও বেশ পর্দানশীন ঘরের ছিলেন। বেশি রাস্তায়–টাস্তায় বেরুতেন না। উনি যে 'মাতৃমঙ্গল' বলে একটা সমিতি করলেন– ওখানে গার্লস্ স্কুল ছিল সেই বালিকা বিদ্যালয়ের ভেতরে ওখানে আমরা গেলাম– তখন বোরকা পরে গাড়িতে ঢাকা-ঢুকা দিয়েই আমরা গেলাম। এই প্রথম বোধকরি আমার মনে হলো যে, মেয়েদের জন্য কিছু করা দরকার। এত কষ্ট তাদের! এই দরিদ্র ঘরের মানুষ মানে দরিদ্র ঘরের মেয়েদের সাথে এই আমার প্রথম পরিচয়– মেয়েরা কি রকম অবহেলিত আর কত গরিব! আগে তো আমাদের সেই বিশাল রাজকীয় প্রাসাদের সাথে গরিবদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বরিশালে প্রথম এখানে এসে দেখলাম দারিদ্র্যের কি নিষ্ঠুর পীড়ন আর মেয়েদের উপর কি অত্যাচার, তারা কত অবহেলিত! এটা আমি এখান থেকে পেলাম। তখন তো নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হয় নি আমার, সেই অল্প বয়সে– চৌদ্দ বছর বয়স আমার তখন। বরিশালে 'মাতৃমঙ্গলে' এসে এই প্রথম দেখলাম যে সমাজের সেবা করবার অনেক কাজ আছে। এই শুরু হলো আমার সমাজের সাথে যোগাযোগ।

আ.আ. : বাঙালি– বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের অবস্থা আপনাদের কালে বলা চলে যে খুব শোচনীয় ছিল। তাদের যে আলাদা একটা অস্তিত্ব তা কোনোভাবেই স্বীকৃত ছিল না। নানাভাবে তারা ছিলেন অবরুদ্ধ। অবরোধবাসিনী এই বাঙালি মুসলমান সমাজের নারীমুক্তি আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা কতটুকু?

সু.কা. : নজরুল তো কবিতা লিখেছেন এই 'সাম্যবাদী'– 'নারী' এইসব। এমনি সাধারণত নারীমুক্তির জন্য যেকোনো সভাসমিতি কোনোরকম কিছু সেটা করেন নি। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রেরণা পেয়েছে মানুষ এটা আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে তখন আমরা এসব ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার কাছ থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছি। যখন বেগম রোকেয়ার সাথে কলকাতায় আমাদের যোগাযোগ হলো, তখন দেখলাম যে আমাদের ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে একটা উৎসাহ জাগলো। ওনার বইগুলো নিশ্চয় আপনি পড়েছেন। উনি যে শুরু করেছিলেন– এই প্রথম 'আঞ্জুমানে খাওয়াতানে ইসলাম' বলে একটা সমিতি গঠন করেছিলেন। সেখানে আমরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম। আমাদের দূরসম্পর্কের কুটুম হতেন উনি। ছোটবেলা থেকেই আমাকে উনি খুব স্নেহ করতেন।

উনি চেয়েছিলেন ওনার স্কুলে পড়াতে। তখন তো আমরা কলকাতায় থাকতাম না। আমি তো তখন স্কুলে পড়ি নি। কিন্তু বিয়ের পরে যখন একেবারে কলকাতায় চলে এলাম। বাড়িঘর ভেঙে গেল নদীতে। আপনি হয়তো জানেন আমাদের সমস্ত শায়েস্তাবাদ পরগণাটাই চলে গেছে। বাড়ি-ঘর-মসজিদ– মানে কিছুই নেই। সেই সময় কলকাতায় যখন আমরা থাকলাম, তখন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হলো। সেইখানেই লেখাপড়ার চর্চাটা বেশি করে হলো। এই হিসেবেই ভাবতে শুরু করলাম মেয়েদের জন্য কি করা যেতে পারে। এই তো আমার বাড়িতে এখনো কত বই রয়েছে ওনার, বিক্রি করতে পারছি না। সমিতি করলাম। ওনার বইগুলো ছাপিয়ে ছাপিয়ে বিক্রি করছি। ওনার কাছ থেকে এই প্রেরণাটা আমরা পেয়েছি। মহিলাদের উপরে, মেয়েদের উপরে কি রকম করে অত্যাচার– কি রকম করে অবিচার হচ্ছে!

আ.আ. : বেগম রোকেয়াকে তো আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং জেনেছেনও।

সু.কা. : হ্যাঁ, একদম পাশাপাশি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি। উনি আমাদের প্রথম বলেন যে, 'ঘরের মহিলাদের জন্য নয়, বস্তিতে তোমরা কাজ করো।' সেই বস্তিতে কাজ করে বস্তির মেয়েরাও যে মানুষ, মেয়েমানুষ হলেও যে মানুষ– বস্তির দুর্দশা আমরা দেখেছিলাম। কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে আমরা কাজ করেছি। কি রকম অসহায়! ওরা জানে না তার স্বামী কি এনে দেবে– কি খাবে, সে কথা– তার বাচ্চা আছে। ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ, তারপরে ঘরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে তা জানে না। আমাদের গ্রামের মহিলারা অন্তত একটা খোলামেলার মধ্যে থাকে– ওরা তা-ও থাকত না। গ্রামীণ মহিলারা তো ঘাটে পানি আনতে যেতো, ক্ষেতের কাজে যেতো, কিন্তু কলকাতার বস্তির মেয়েরা– তাদের কথা আর বলবেন না! আমার নিজের চোখে দেখা।

আ.আ. : অবরুদ্ধ?

সু.কা. : একেবারে অবরুদ্ধ। বেগম রোকেয়া বলতেন, 'ওদের সঙ্গে কাজ করো।' এই যে অবরুদ্ধ,– আর অবরোধবাসিনী আমাদের বড়ো ঘরে যেটা, সেটা ছিল আরেকরকম।

আ.আ. : সে তো শরিফ খান্দানের ব্যাপার, বলা চলে এটা তাদের একটা শরাফতির লক্ষণ।

সু.কা. : হ্যাঁ, শরাফতির লক্ষণ। গ্রামের মেয়েরা অন্তত কলকাতার বস্তির মেয়েদের চেয়ে অনেক মুক্ত ছিল। তারা ঘাটে পানি আনতে যেতো। তারা ক্ষেত-খামার দেখতো। মানে খোলামেলা একটা পরিবেশে ওরা আসমানের মুখ দেখতে পারতো।

আ.আ. : আপনাদের পূর্বসূরি বেগম রোকেয়ার যে নারীমুক্তির চেতনা বা নারী-জাগরণে তাঁর যে ভূমিকা সেই সূত্র ধরে আমরা আজকের দিনের নারীদের কাজ ও কথাকে বিশ্লেষণ করলে কি দেখতে পাই? নারীবাদী চেতনা বা এই যে তসলিমা নাসরিন– এঁদের বক্তব্য বা কাজ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

সু.কা. : আচ্ছা বেশ, আপনি বলুন আপনাদের কি মত? আপনি কি বলেন?

আ.আ. : আসলে নারীর স্বাতন্ত্র্য, নারীর অধিকার, নারীর বিকাশ নিয়ে শাস্ত্রবাহক মৌলবাদী-গোষ্ঠী ছাড়া আর কারো মধ্যে তো তেমন কোনো বিতর্ক নেই। সমাজের স্বার্থে স্বীকার করতেই হয়, করা প্রয়োজনও– নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা সবকিছুরই। কিন্তু এ-সব বিষয়ে তসলিমা নাসরিনের যে তীব্র-উত্তেজক বক্তব্য, সে-সম্পর্কে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে থাকেন, যাঁরা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় লালিত তাঁরাও কেউ কেউ করেছেন। নারীর সার্বিক মুক্তি-আন্দোলনের কাজে আপনার রয়েছে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। তাই আপনার মুখ থেকেই এ-বিষয়ে আপনার মন্তব্য-মতামত জানতে চাই।

সু.কা. : না, শুনুন! তসলিমা নাসরিন এখন তো খুব পরিচিত, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের যুগের থেকে আজকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তো এটা তো স্বাভাবিক– এক-এক যুগের একটা ধর্ম আছে না! আজকে আপনি যে আমার সাথে কথা বলছেন, আমার বয়স হলো পঁচাশি। কত যুগ– কত কাল কেটে গেছে। আমার মতো এত অভিজ্ঞতা বোধ করি আর কেউ লাভ করে নি মেয়েদের জীবন নিয়ে। তারপরে তসলিমা নাসরিন যখন লিখতে শুরু করলো, দেখলাম– লিখলো যে– ওতো নিজের কথা কিছু বলে না, কোরান থেকে এ-থেকে ও-থেকে কোট্ করে করে দিয়েছে– কোরান এই বলেছে, রামায়ণ এই বলেছে, মহাভারতে এই বলেছে– ইত্যাদি। কোরানে মেয়েদের যে অধিকারের কথা বলেছে সেই কথা সে কিছু বলে নি। যেখানে যেখানে পুরুষের কথা আছে, সেইখান থেকে নিয়েছে– সেই কথা বলেছে। সেই নিয়ে একটা আন্দোলন হলো, তাকে কথা বলতে দেবে না। আমরা তখন একটা প্রতিবাদ করলাম যে, লেখার স্বাধীনতা তার থাকা দরকার। আমরা মহিলা পরিষদ থেকে তার প্রতিবাদ করলাম। সে লিখবে না কেন? সে লিখুক, কি চায়– কি বলতে চায়, সে বলুক। আমরা প্রতিবাদ করলাম। এটা নিয়ে বেশ গণ্ডগোল হলো। একদিন আমি একজনকে বললাম যে, তসলিমা নাসরিন মেয়েটিকে পেলে হতো। তা উনি গিয়ে বললেন। একদিন তো এর চেয়ে রাত হয়েছে, মাগরেবের নামাজ পড়তে বসেছি। আমার শরীর অসুস্থ। আমার প্রেশার তো খুব বেশি, বসতে পারি না। তারপরে তসলিমা এসেছে। নামাজ শেষ করে আমি বললাম, 'তুমি তো লিখছো, তুমি তো নিজে ডাক্তার, আমি খুব একটা অসুস্থ। মা, তুমি এসো আমাদের সঙ্গে, কাজ করো, তোমার লেখা আমার ভালো লাগে'– মহিলা পরিষদের কথা বললাম– 'তুমি এসো, কাজ করো, তোমার মতো মেয়েদের আমার দরকার আছে।' কিছু বললো না। 'আজকে তো আমি বেশি কথা বলতে পারছি না। আর তুমি তো ডাক্তার, তুমি ডাক্তার হিসেবে আমার কাছে এসো, তুমি

যখনই খুশি– আসবে। আমাকে দেখতেও তো আসতে পারো। আমার কাছে এসো। আমাদের দরকার আছে তোমার মতো মেয়ে।' – পিঠে হাতটা দিয়ে আমি বললাম। উঠে চলে গেল, কিছু বললো না। তারপর এই লেখালেখি। এমন সব লিখতে শুরু করলো, এইগুলো আবার আমার পছন্দ না। মানে লেখার একটা সীমা আছে না! আমরা মেয়েরা, আমরা অনেক কিছু চাই– কিন্তু লেখার মধ্যে একটা শালীনতা থাকা চাই। বিশেষ করে যখন এই মসজিদ ভাঙা হলো– বাবরি মসজিদ– তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা সারা ঢাকায় হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি– এখানে ওখানে সব জায়গায়। সেই কালীবাড়ি থেকে শাঁখারিপট্টি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে হিন্দুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছি, যাতে সাম্প্রদায়িকতা না ছড়ায়, এটার ব্যবস্থা করছি। সে এদিকে কি আনন্দ পুরস্কার-টুরস্কার সব পেয়ে গেলো। এমন জঘন্য সব লেখা– সে-সব পড়তে পারলাম না। তার সাথে কোনো সম্পর্কও রাখতে পারলাম না। এসব লেখা অবশ্য আমাদের অল্পবয়সী মেয়েরা যারা তারা হয়তো সমর্থন করেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। সে লেখিকা হিসেবে ভালো, কিন্তু এইটা আমি পছন্দ করি নি। আমি বললাম – 'এসো'। তারপরে কোনো মিটিং-এ আমার সঙ্গে দেখা হলে উঠে চলে যেতো। দু-তিনটে মিটিং-এ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে আমাকে দেখে চলে গেছে। আমার সঙ্গে তার আর কোনো কথা হয় নি। তারপর তো সে দেশ ছেড়ে গেলো।

আ.আ. : এবারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলবো। আমরা জানি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদানের কথা, ভূমিকার কথা, আপনার অনুভূতির কথা। এখনও– এই বয়সেও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে আপনি যেভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন, তাতে আমরা আপনাকে আমাদের দেশের 'অভিভাবক' ও বাঙালি জাতির 'জাগ্রত বিবেক' হিসেবে বিবেচনা করি। মাত্র কয়েকদিন আগেই আপনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন করলেন– গত পরশুই তো। আমাদের গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপনি যদি অনুগ্রহ করে কিছু বলেন।

সু.কা. : দেখুন, আমি তো কোথাও যাই নি– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই বাড়িতেই তখন বন্দি। তখন আমাদের এইসব গাছ-গাছালি, দেওয়াল-টেওয়াল কিছুই ছিল না। এখানে একটা বাড়ি, ওখানে একটা– আমাকে মিলিটারি পাহারা দিয়ে রেখেছে। সব খোলা। রেলিং-টেলিং তো পরে হয়েছে। এই ঘর একদম খোলা। এই পাড়ায় কোনো ভদ্রমহিলা-ভদ্রলোক কেউ ছিল না। কেউ ঘরে ছিল না। শুধু একজন মহিলা আর আমরা পাড়ায় ছিলাম। বাড়িঘর সব খালি। আমি তো হাতে কোনো অস্ত্রও নিতে পারি নি– কিছুই করতে পারি নি। কিন্তু যখন যুদ্ধ লাগলো, আমাকে এসে বললো বোরহান– বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর– 'খালাম্মা, এরকম যুদ্ধ লেগেছে, মেয়েদের ওপারে পাঠিয়ে দিন।' তখন আমার মেয়েদের আমি পাঠিয়ে দিলাম আগরতলা হাসপাতালে– আমার দুইটা মেয়ে এখানে ছিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। আমার জামাইকে– আমার বড় মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেললো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে– চাটগাঁয়ের রেডিও অফিসে কাজ করত সে। মেয়ে দু'টোকে পাঠালাম আগরতলায়। আমি এখানে থাকলাম। আমার স্বামী আর আমি। [অস্পষ্ট]। সামনে দিয়ে তো কেউ আসতে পারতো না, মিলিটারি ছিল। তাই পেছনের দিক থেকে আসতো। যারা যারা এখান থেকে চলে গিয়েছিল, তাদের রেশন-কার্ড আমি রেখেছিলাম। রেশন-কার্ডের চাল-টাল আমি তুলে রাখতাম। বস্তা মাথায় করে, গিয়াসউদ্দীন মাথায় গামছা বেঁধে লুঙ্গি পরে বস্তা ভর্তি চাল নিয়ে যেতো। টাকা-পয়সা নিয়ে যেতো। বোরহানউদ্দীন এসে বললো, 'খালাম্মা, এরকম মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে'। তো মেয়েদের আমি কোথায় রাখি, আমার বাড়িতে তো কোনো লোকও নাই। বেবী মওদুদকে খবর দিলাম। বেবী মওদুদ ও আর-একজন মহিলা– সিলেটের নাহার– ওকে খবর দিলাম। আমাকে তো সবাই চেনে, আমি তো বেরোতে পারি না। মিলিটারিরা সবসময় আমার পাহারায়। ওদের দিয়েই এখানে-ওখানে মেয়েদের একটু জায়গা করে দিলাম। লালমাটিয়ায় এ্যাডভোকেট একজন ছিলেন মেহেরুন্নেছা, তাঁর বাড়িতে কিছু রাখলেন। এই করে করে– এখানে বসে থাকতাম, এখানেই বসেই– বারান্দায় বসে বসে কাঁথা সেলাই করতাম আর সবসময় খবর নিতাম। মেয়েগুলোকে পার করে দিলাম। আরও মেয়েদের পাঠালাম। আগরতলায় অনেক মেয়েদের পাঠালাম। আল্লাহ, মরে যাক তবু যেন মিলিটারির হাতে না পড়ে। বড়ো দুঃখের দিন গেছে।

আ.আ. : এই মুক্তিযুদ্ধে কত ত্যাগ, কত তিতিক্ষা, কত উৎকণ্ঠা, কত রক্তের নেপথ্য ইতিহাস আছে, যা হয়তো কোনোদিনই কেউ জানবে না।

সু.কা. : শুনুন, এখন বড় দুঃখ লাগে এই সময়ে এই কথা বলতে, এই বাঙালিরা এখন বাঙালি মেয়েদের উপর অত্যাচার করে। পাঞ্জাবি নেই, শিখ নেই– এই যে বাঙালিরা মেয়েদের উপর এত অত্যাচার করছে এইজন্য আপনারা কিছু করতে পারেন না? কি যে লজ্জার কথা, কি রকম যে দুঃখের কথা– এই দুঃখে আমি মরে যাচ্ছি। আমার প্রেশার– ডাক্তার বলে, 'আর আপনাকে ওষুধ দেব না। আপনার প্রেশার কমে না, আপনি খেতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না। আপনি খবরের কাগজ পড়বেন না'। নিত্য খবরের কাগজে পড়ি অত্যাচারের কাহিনী। আর এই যে এখন পুলিশ-টুলিশ পর্যন্ত মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করেছে। একটা মেয়েছেলে, কই পার্লামেন্টে কোনো মেয়েছেলে কথা বলে না, কোনো একটা বেটাছেলে কথা বলে না। এই-ই তো দুঃখ।

আ.আ. : এই যে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অবরুদ্ধ অবস্থাতেও আপনি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছেন– মুক্তিযোদ্ধাদের মনে

সাহস জুগিয়েছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এমন ধারণা কি পোষণ করতেন?

সু.কা. : হ্যাঁ, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে সেটা তো বরাবরই পোষণ করেছি বলে বুকে বল ছিল যে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবে তাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আ.আ. : বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

সু.কা. : ওরকম আর-একটা মানুষ হবে না। বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে কেউ ভালোবাসবে না। এখন যারা আছে তারা সবাই নিজের পদটা কতখানি বজায় থাকবে, এইটুকুন ভাবে। তাছাড়া দেশের কথা কেউ ভাবছে না। ওরকম বলিষ্ঠ সাহসী দেশপ্রেমিক মানুষ আর হবে না, এই আমি বুঝি। তাঁর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু দেশকে ভালোবাসতো সে, সাহসী ছিল, সংগ্রামী ছিল। [অস্পষ্ট]। ওঁর মতো আর একটা মানুষ হবে না।

আ.আ. : মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ যে উদ্দেশ্য ছিল, আজকে আমরা কি তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি?

সু.কা. : অনেক দূর সরে এসেছি। এখন মুক্তিযুদ্ধের কোনো আদর্শ নেই, এখন আছে নিজের পদের আদর্শ। কে কতখানি পদ আঁকড়ে থাকতে পারবে,– গালাগালি, কাদা-ছোড়াছুড়ি এসব নিয়ে। একটা মানুষের মধ্যে আমি দেখছি না যে দেশের কথা ভাবছে।

আ.আ. : এই যে এখন আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে– আমরা বাঙালি, না বাংলাদেশি?– এ-সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

সু.কা. : এইসব যারা করে করুক। ওসব নিয়ে আমি মোটেই ভাবি না। আমরা বাঙালি– বাঙালি, ব্যাস্। ওসব যারা বলে তার কোনো মানেও নেই মূল্যও নেই।

আ.আ. : আজকে আমরা লক্ষ করছি যে চারদিকে অবক্ষয়, অধঃপতন, হতাশা, নৈরাশ্য। এই অবস্থা থেকে জাতি হিসেবে আমাদের মুক্তির উপায় কী?

সু.কা. : মুক্তির উপায় তো আপনারাই করতে পারেন। একবারে সবাই যদি একসঙ্গে থাকত– খালি দল, খালি দল, খালি বিভক্তি, খালি বিভক্তি– এতে কিছুই হবে না। সবাই যদি একত্র হয় তাহলে হবে। সেই সময় যখন মারামারি হয়– শিবিরের দল এই গিয়াসউদ্দীনের বোনের হাত ভেঙে দিল মেয়েদের উপর অত্যাচার করে। তখন আমি ওখানে বসে বলেছিলাম যে, 'পাঁচ কোটি মানুষ,– পাঁচ কোটির মধ্যে যদি এক কোটি শিবির হয় তবে চার কোটি মিলে কি একটা শিবিরকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না? লজ্জা লাগে না!' এ-কথা নিয়ে আমার উপর শিবিরের মানুষেরা কত রকম কত কিছু করলো। কত ছুরি দেখালো, কত লাঠি দেখালো, কত 'মুরতাদ' বানালো, কত হুমকি দিয়ে চিঠি দিলো। তখন কোনো ব্যাটাছেলে একটা কথা বললো না। এখন তার শাস্তি ভোগ করছে। এখন এই বাঙালির যে ভীরুতা, বাঙালির যে হীনম্মন্যতা– এ কাটিয়ে আমরা আশা করছি নতুন একজন কেউ আসবে, কোনো একজন নেতা। এখন না আছে এখানে মনীষী, না আছে নেতা, না আছে সেনাপতি। একদম শূন্যের উপরে আমরা আছি। আমি আশা করছি, এরকম একজন আসবে যে আমাদের দেশকে আবার উদ্ধার করবে।

আ.আ. : একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী যারা আছে, তাদের কি বিচার হওয়া প্রয়োজন?

সু.কা. : নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দশ-বিশ বছর পরে সব জায়গায় হচ্ছে, এদের হবে না কেন? এতদিন হওয়া উচিত ছিল। হয় নি সেইটাই তো আশ্চর্য! কেউ তাদের ধরলো না, কেউ তাদের বিচার করল না! সব নিজের পদ বজায় রাখতে রাখতে বিশবছর-ত্রিশবছর কাটিয়ে দিল।

আ.আ. : আমাদের দেশে মুক্তবুদ্ধির লেখক-বুদ্ধিজীবীরা মাঝেমধ্যেই মৌলবাদী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ-বিষয়ে আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন। কিছুদিন আগে প্রথাবিরোধী মুক্তমন লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ ডক্টর আহমদ শরীফও এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার শিকার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধেও একটা মহল অপপ্রচার শুরু করে তাঁকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে– তাঁর ফাঁসি দাবি করে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

সু.কা. : জানি তো, একসাথেই তো আমরা তখন কাজ করতাম। একসাথেই কাজ করেছি। 'মুরতাদ' বলে তাঁকে ঘোষণা করেছে। এখন পর্যন্ত ওদের টার্গেট হয়ে আছেন। যেকোনো সময় হামলা করতে পারে। মাথার দামও ধরেছে। তো সেটাও আর হবে না। এইজন্য বলি যে, ঐ ওরা ভীরু– চিরকালই ভীরু, অপরাধী যারা তারা চিরকালই ভীরু থাকে। [অস্পষ্ট]।

আ.আ. : দেশবিভাগের আগে থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল– তাঁদের অনেককে আপনি কাছ থেকে দেখেছেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক কিংবা সোহরাওয়ার্দি, ভাসানী, নাজিমুদ্দীন এবং সেইসঙ্গে তো আরও কাউকে কাউকে জেনেছেন। মানুষ ও জননেতা হিসেবে এঁদের সম্পর্কে নিজের স্মৃতি থেকে কিছু বলুন।

সু.কা. : সেই যুগের যাঁদের নাম করলেন তাঁরা সবাই এক-এক দিক দিয়ে এক-একজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। সোহরাওয়ার্দি যেমন শেরে বাংলাও সে রকম। শেরে বাংলার হুঙ্কার সেদিন দরকার ছিল। শেরে বাংলার মতো ওরকম মানুষ আমি আর দেখি নি। সেদিক দিয়ে শেরে বাংলা অনন্য। তারপর সোহরাওয়ার্দি সাহেব বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে যে পরিচয় দিয়েছেন, সে-কথাও বলতে হয়। আমি তো অনেকদিন থেকে জানি। অবশ্য দু'জন এক-এক দিক দিয়ে তাঁদের তুলনার মধ্যে আছেন। তাঁরা যা করে গেছেন, সে-রকম আর হবে না।

আ.আ. : একটি কথা আমাদের খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনাদের কালে যাঁরা ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী– রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রেই – কিন্তু আজকে আর সেই ধরনের বড় মাপের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না– এর কারণটা কি?

সু.কা. : আমারও সেইটেই জিজ্ঞাসা! এই যে বাঙালি এরকম হয়ে গেল কেন? কিসের জন্য ? এই বাঙালি খালি হাতে ভাষা-আন্দোলনের সময় প্রাণ দিলো, ভাষা-আন্দোলন করল– দেশকে স্বাধীন করল। সেই বাঙালির আজকে এত অধঃপতন কেন? সেইটেই তো আমার জিজ্ঞাসা!

আ.আ. : ভাষা-আন্দোলনের প্রসঙ্গ তো অবশ্যই আমাদের আলোচনায় আসবে। ভাষা-আন্দোলনের সেই সময়ে আপনি ঢাকাতেই ছিলেন এবং এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সবকিছুই আপনার জানা। তো ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।

সু.কা. : ভাষার আন্দোলন যখন হয় তখন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তখন নিজের ভাষার জন্য সবাই যা করেছে আমিও তাই করেছি। বেশি কিছু কি করতে পেরেছি? আমার ভাষাটা আমি বজায় রাখবো এইটেই চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষা যাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টাই করেছি। আর কি করতে পেরেছি? যাঁরা বড় বড় মহলে আন্দোলন করেছে তাঁদের সাথে থেকেছি– এই পর্যন্ত।

আ.আ. : এবারে আমরা একটু সাহিত্যের কথায় ফিরে আসি। দেশবিভাগের আগে সামাজিক-পারিবারিক কারণে আপনার লেখালেখির ব্যাপারে নানা সমস্যা-বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করতে হয়েছে। তো সাতচল্লিশের দেশভাগের পর যখন ঢাকায় চলে এলেন, সেই সময় লেখালেখির ব্যাপারে কি একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা বা অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন?

সু.কা. : কলকাতাতেই তো আমরা অনেকদিন ছিলাম। তারপর ওখান থেকে চলে এলাম। লেখালেখির সুযোগ-সুবিধা কলকাতাতেই বেশি পেয়েছি। ওখানেই পেয়েছি বেশিরভাগ। ঢাকায় তো পরে এসেছি। ঢাকায় অনেক পরে এসেছি।

আ.আ. : আপনার সাহিত্যজীবনে কোন পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রেরণা বা আনুকূল্য পেয়েছেন, তাহলে সেই সম্পর্কে আপনার জবাব কি হবে?

সু.কা. : ঐ 'সওগাত'-যুগেই। ঐ যুগেই আমাদের একটা স্বর্ণযুগ ছিল– 'সওগাত'-যুগ। ঢাকায় এসে তো তখন এই নানান রকমের হাঙ্গামার মধ্যে পড়ি। ঢাকায় আসবার পর তো একটার পর একটা আন্দোলন চলেছে। কলকাতায় 'সওগাত'ই মুসলমানদের জন্য সাহিত্যচর্চার একটা প্রধান অবলম্বন ছিল।

আ.আ. : আপনার প্রিয় লেখক কে?

সু.কা. : সবাই আমার প্রিয় লেখক। যে ভালো লেখে সে-ই আমার প্রিয়।

আ.আ. : তবু যাঁরা আপনাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছেন– যাঁদের লেখা ভালো লাগে–

সু.কা. : সে তো রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। তারপর আর আমি কারো লেখার কথা বলতে পারবো না।

আ.আ. : বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলুন?

সু.কা. : এখনকার লেখার সঙ্গে আমাদের লেখার অনেক পার্থক্য। নিশ্চয় সবাই ভালো লিখছে। এখন জাফর ইকবালের সায়েন্স-ফিকশন পড়ি বুড়ো বয়সে। [*মৃদু হাসি*]। কোনো একটা সাহিত্যপত্রিকাও নেই, সাহিত্যচর্চাও নেই, কিছুই নেই।

আ.আ. : আপনি কি মনে করেন, ভালো সাহিত্যপত্রিকা নেই বলেই সাহিত্যের চর্চাটা তেমন হচ্ছে না?

সু.কা : হ্যাঁ, তাই মনে হয়। কোনো একটা সাহিত্যপত্রিকা নেই। কোনো একজন সাহিত্যিকের জন্য– আগেকার দিনে যেমন 'সওগাত' পত্রিকা একটা ছিল, ওখানে সবাই সমবেত হতো– এখানে কোনো কিছুই নেই। সব ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আ.আ. : আমাদের ভাষা-আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী। আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় বাংলা একাডেমীর ভূমিকার গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন। তো সেই বাংলা একাডেমী সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

সু.কা. : বাংলা একাডেমীতে আমি তো তেমন যাই না বহুকাল, কাজেই জানি না। বাংলা একাডেমীতে এখন প্রকাশনালয় হয়েছে, বইমেলা করে, আর কি হয় আমি জানি না।

আ.আ. : বাংলা একাডেমীর কাছে কি আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি ছিল?

সু.কা. : ছিল না? ওখানে– বাংলা একাডেমীতে আমাদের সব সাহিত্যিকেরা আসবেন-যাবেন। দেখাশুনা হবে, গবেষণা হবে। কি হয়? একটা পত্রিকা কি ভালো বেরুচ্ছে বাংলা একাডেমী থেকে? আমি জানি না।

আ.আ. : বাংলা একাডেমীতে এই যে আপনার না-যাওয়া, এর পেছনে কি কারণ?

সু.কা. : আমারই অসমর্থতা। আমি পারি না, এখন বয়স হয়ে গেছে। যখন এনামুল হক সাহেব ছিলেন, তখন আসতাম-যেতাম। তারপর এখন তো বহুকাল বাংলা একাডেমীতে আমরা যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন তো আমার এই বয়সে সম্ভবও না।

আ.আ. : আমরা এখন আপনার ব্যক্তিগত জীবনযাপন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনার বয়স পঁচাশি চলছে। আপনার প্রতিদিনের রুটিনটা এখন কেমন?

সু.কা. : এই তো বাড়িতে আছি। আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, নাতনি আছে। পড়াশুনা একটু করি। আমাদের মহিলা পরিষদ বলে একটা সমিতি আছে, কোনো সময় ওখানে কাজ করি, ওরা আসে। এই আপনারা আসেন। এই রকম করেই

দিন কেটে যাচ্ছে। দিন তো বসে থাকে না। তো আমি খুব অসুস্থ। এই কয়েকটা মাস, আমি তো চারমাস ছিলাম সিলেটে। একদম শয্যাগত হয়ে গিয়েছিলাম। খুব অসুস্থ ছিলাম। এখন তো এই কয়মাস আমি লেখাপড়া থেকেও একটু বিরত রয়েছি। মিটিং-এ কয়দিন একটু কম যাচ্ছি। আবার এখন একটু চলাফেরা শুরু করেছি। কিন্তু সেটা মানা। এই তো এতক্ষণ বসে আছি, সেটাও আমাকে ডাক্তার মানা করেছে,– 'এক ঘণ্টার বেশি বসবেন না।'

আ.আ. : এখন কি কিছু লিখছেন?

সু.কা. : না, এমন কিছুই লিখছি না। লেখাপড়া করতে পারছি না। চোখেও ভালো এখন দেখি না। প্রেশারের জন্য মাথাও তুলতে পারি না। বেশিক্ষণ বসতে পারি না।

আ.আ. : লেখার কাজে নতুন কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

সু.কা. : না, সেটা আমি জানি না। যখন আমার ইচ্ছা করবে, লিখবো। আগে কোনো পরিকল্পনা আমি করতে পারি না।

আ.আ. : আপনি আমাদের সমাজের প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের একটা জীবন্ত ইতিহাস। বনেদি সামন্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে বাঙালি মুসলমান সমাজের ওপরতলাকে জেনেছেন। আবার সাধারণ বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে নিম্নবর্গের নারীদের জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজকর্মের পাশাপাশি আন্দোলন-সংগ্রামেও শরিক হয়েছেন। সেই কৈশোর থেকে সম্পৃক্ত আছেন সাহিত্যচর্চার সঙ্গে। এই যে আপনার বিশাল-ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং আপনার কর্মময় জীবন। কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের একটা সবিনয় অভিযোগ, আপনার এই জীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস অপ্রকাশিতই রয়ে গেলো। আমরা চেয়েছিলাম, আপনি বড় পরিসরে একটা আত্মকথা লিখে যাবেন। কিন্তু 'একালে আমাদের কাল'– ক্ষুদ্র কলেবরের এই স্মৃতিচর্চাটিই আমাদের একমাত্র সম্বল হয়ে রইলো।

সু.কা. : আমি সেইটে চাইনে। তবুও মানুষ অনেককিছু লিখেছে, আমি সেইটেও পছন্দ করি নি। আমার কোনো ইচ্ছাও নেই। ইচ্ছা ছিলও না, এখনো নেই যে আমার জীবন নিয়ে কোনো আলোচনা হোক বা আমি কিছু লিখে যাই। মানুষ জোর করে বা এই যে আপনি বললেন, এত কথা তাই আমি বললাম। আমি তো এসব নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না। আমার জীবনী নিয়ে একটা কিছু লেখার শক্তিও এখন আর নেই। আপনারা বললেন, তাই ছাড়া-ছাড়াভাবে কিছু কথা বললাম। তো কিছু গুছিয়ে বলার মতো সাধ্যও আমার নেই। আর আমার জীবন নিয়ে আলোচনা হোক, এটাও আমি চাই না।

আ.আ. : আচ্ছা, এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ধর্ম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

সু.কা. : যার যার ধর্ম তার তার কাছে। মুসলমানের ঘরে জন্মেছি– রোজা আছে, নামাজ আছে,– তার যতটুকু পালন করতে পারি, পালন করব।

আ.আ. : আপনি কি নিজে এই ধর্মের আচরিক দিকগুলো পালনে আন্তরিক আগ্রহী?

সু.কা. : হ্যাঁ, আমি নামাজ-রোজা এটা করতে চাই। এটা আমার সংস্কার। আমি ছাড়তে চাই না। রোজা করি, নামাজ পড়ি। সবই করি। করব না কেন?

আ.আ. : আপনার বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাহলে ধর্মনিষ্ঠ হয়েও একজন মানুষ উদার-অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন, তাতে কোনো বিরোধ নেই।

সু.কা. : আমাদের ধর্মে কি আছে? কোরানে কি আছে? কোরানে আল্লাহতায়ালাও তো বলছেন যে, 'আমি যদি ইচ্ছা করতাম আমি সবই করতে পারতাম।' তাহলে আমি চারটে ফেরকা করলাম কেন? কোরান যারা পড়ে তাদের তো অর্থবোধ নেই– এরা ধর্মের নামে চিল্লায়। এরা কি কোরান পড়ে? বিশদভাবে পড়েছে? কোরানে কি আছে সেটা নিয়ে তো আমি বলেছিলাম তসলিমাকে, সেই কথা বলেছি– 'তুমি একজন ভালো লেখিকা তুমি এইগুলো লেখো যে কোরানের ভিতরে কি দিয়েছে।' তাহলে হজে কেন যায় মানুষ? মুসলমান মেয়েদের তো হজে যেতে মানা নেই। নবী কি বলেছেন ঘরে বসে থাকতে! [*অস্পষ্ট*]। আমরা কি চাই, আমরা কতখানি নিতে পারি, কতখানি আমাদের অধিকার আছে,– সেগুলো আমরা বুঝবো না?

আ.আ. : উত্তর প্রজন্মের কাছে আপনার বক্তব্য কি– প্রত্যাশা এবং বাণী কি?

সু.কা. : বাণী– তারা মানুষ হোক। মনুষ্যত্বের মর্যাদা নিয়ে তাদের নিজেদের মর্যাদায় তারা মানুষ হয়ে জেগে উঠুক। দেশের মানবসমাজের কল্যাণ হোক। সংসার সুশৃঙ্খলভাবে চলুক– এইটাই আমি চাই। কি চলছে আজকালকার দিনে? খালি খুনাখুনি মারামারি– বাঙালি হয়ে বাঙালির উপর অত্যাচার করছে– এই তো দেখছি খালি। অত্যাচারই দেখছি, মানুষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখছি না। নতুন প্রজন্ম সাহসী হোক তারা, সংগ্রামী হোক। তারা নিজের অধিকার বুঝে নিক। কি ছেলে কি মেয়ে সবাই তো নির্যাতিত হচ্ছে! শেষ কথা এই যে, দুনিয়া ভালো হোক। সারা দুনিয়ায় যে রকম চলছে আজকাল, যে অত্যাচার-অবিচার-সন্ত্রাস, সে থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে মুক্ত করুক। মানুষ মানুষের মতন যেন বেঁচে থাকে।

এরপর যা হবে

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আজ সকাল থেকে ওঠবোস করছে বদিউর। যেন ক্ষুব্ধ এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভেতরে নাড়াঘাঁটা খাচ্ছে তার মন। তার দড়ি পাকানো চেহারা মাঝে মাঝে টানটান হয়ে উঠছে। কপালের নীল রগ ফুলে উঠছে। গলার গুটলি ক্রমাগত ওঠানামা করছে। নাক টানছে মাঝে মাঝে। অথচ নাক শুকনো । মনা ব্যাপারির দোকানের সামনে ঘটছে ব্যাপারটা।

একসময় বদিউরের চেহারা দেখতে দেখতে মনার চোখ পচে গেল। বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, কি মিয়া, ঘটনা কি। গাঁজা কম খাতিছো নাকি আজকাল ?

মনা ব্যাপারির ধমক শুনে থমকে গেল বদিউর। যেন নিশ্চল হয়ে গেল । যেন সে একটা বাঁশের খুঁটি বা শুকনো চ্যালাকাঠ।

একটু পরে চোখের পাতা নড়ে উঠল তার। সচল হলো মন। সেইসাথে বিজবিজ করে উঠল রাগ। হ্যাঁ গাঁজা সে খায় বটে মাঝে মাঝে, এই গঞ্জে কোন শালা গাঁজা না খায় , তাই বলে আর দশজনের মতো সে তো কোনোদিন বেচাল কুচাল করে নি।

সকাল দশটায় গঞ্জ এখন সরগরম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দোকান পশরায় বেশ ভিড়। ভিড় ক্রমে বেড়ে উঠছে। গুঞ্জন চলছে চতুর্দিকে।

কামারশালা থেকে হ্যাচং হ্যাচং শব্দ উঠছে। গনগনে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে লোহা। দুমড়ে মুচড়ে পিটিয়ে লোহাকে করে তোলা হচ্ছে মনের মতো ; যেমন দা, কুড়োল, কাস্তে ।

রাগ পুষে রাখে না বদিউর। শ্রমিক মানুষের রাগ পুষে রেখে লাভ কি ! ওদিকে সূর্যের মেজাজ আজ সকাল থেকেই গরম। যত্রতত্র ছুঁড়ে মারা আলোর বর্শা দশদিক বড় ভয়াবহভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এত আলো এই মুহূর্তে চোখে দেখতে ভালো লাগছে না বদিউরের।

কিন্তু উপায় কী।

হঠাৎ কী ভেবে বদিউর মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মনা ব্যাপারির চোখে চোখ রেখে বলল, মনা ভাই, মেইয়ে মানসির জেদ হ'লি পরে কীভাবে সেইটা ভাঙতি হয় , বলোদিনি ?

বদিউরের প্রশ্ন শুনে হঠাৎ করে যেন চমকে গেল ব্যাপারি। বদিউরের চোখে চোখ রেখে কী যেন বোঝার চেষ্টা করল। গুড় রাখার জন্যে মাছি ভনভন করছে দোকানে। তার ভেতরেই হেসে উঠল মনা। হাসির দমকে গেঞ্জির নিচে ভুড়ি কাঁপতে লাগল। গালের চামড়া থিরথির করে উঠল।

পড়ে যাওয়া দাঁতের ফাঁকে রসালো লাল জিভ সাপের মত নড়েচড়ে উঠল।

মনার অবস্থা দেখে যেন আরও রাগ হলো বদিউরের। দড়ি পাকানো শরীরের পেশী আবারো টানটান হতে শুরু করল। এটা কি তার মনের সত্যি সত্যি রাগ নাকি অসহায়ত্ব, বদিউর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বিশেষ করে বোঝার ক্ষমতা তার এখন নেই। ভেতরের নানারকম জটিলতায় বদিউর এখন বিভ্রান্ত। হাসি শেষে লাল গামছায় মুখ মুছে মনা ব্যাপারি বলল, আরে মিয়া, তুমার চুলদাড়ি পাকতি লাগিল আর এখুন পর্যন্ত জানিলে না, মেইয়ে মানসির তেজ ক্যামোন কইরে ভাঙতি হয়। পিটোন রে দাদা, পিটোন। *মেইয়ে মানসির তেজ হ'লি পরে তা ভাঙার ওষুধ হতিছে পিটোন।* মনার কথা শুনে বদিউর যেন ভ্যাবলার মত তাকিয়ে থাকল। আর তার সেই চেহারা দেখে মনা বুঝল বদিউর একটা উজবুক ছাড়া আর কি হতে পারে। অধৈর্য হয়ে মনা বলল, পিটোন চিনো না মিয়া?

আমি তো আমার মেইয়ে মানুটারে পিটোনের উপর রাখি। মাসে একবার পিটোন না দিলি পরে তেজ বেইড়ে যায়। এত যে পিটোন খায়, তবু মাগির মুখ চালানো বন্ধ হয় না ! আর চ্যাঁচায় কি।

চ্যাঁচায়ে পাড়া মাথায় করে। ছয় বাচ্চার মা, এখুনও চুপ করে পিটোন খাতি শিখলো না।

বদিউরের চেহারা আপাতদৃষ্টিতে ভ্যাবলা দেখালেও সে আসলে সবকিছু বুঝতে পারছে।

মেয়েমানুষ পেটানো এমন কি আর কঠিন কাজ। কানা লুলাও তাদের মেয়েমানুষ পেটায়।

বদিউরও আগে হরদমই পারভীনকে পিটিয়েছে। এখনও মওকা পেলেই মাঝে মাঝে পেটায়। কিন্তু ইদানিং যেন সবকিছু কীরকম হাতছাড়া লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পেটালেও ঠিকমত কিছু যে হচ্ছে না। অথচ বদিউর তার বাবাকে দেখেছে বউ পিটিয়ে দিব্যি সুখের সংসার করে যেতে !

বাবার পিটোনেই মা সারাজীবন সোজা হয়ে সংসার করে গেছে। মুখে একফোঁটা রা কাড়ে নি। এবং এতসব পিটনি খেয়েও বদিউরের মা দিব্যি চল্লিশ বছরের মত বেঁচেছিল। মরার আগে অবশ্য তার মুখে একটাও দাঁত ছিল না। চোখেও ভালো দেখতে পেত না। একটা হাত সর্বক্ষণই থরথর করে কাঁপত , যেন কোনো একটা অবলম্বন খুঁজে বেড়াতো হাতটা। মরার আগে প্রায় সময় ঘরের আনাচে কানাচে কী যেন খুঁজে বেড়াত মা। একদিন বদিউর বিরক্ত হয়ে বলেছিল , এত কী খোঁজেন মা ?

উত্তরে মা বলেছিল, আমার যাতিখান খুঁজিরে বাজান। যাতিখান আমার কুথায় হারায়ে গেল। মায়ের কথা শুনে আরও বিরক্ত হয়ে বদিউর বলে উঠেছিল, কোন বাবার কালে আপনার যাতি ছেল বলেন তো মা ? সারাজীবন তো দেখিলাম, শিল নুড়া দিইয়ে পান সুপোরি ছেঁচে খাতি। পরবর্তী জীবনে বদিউরের একবার মনে হয়েছিল, তার মাকে একটা সুপোরি কাটার লোহার যাতি কিনে দেয়
।

কিন্তু তার আগেই তো মা মরে গেল।

বদিউর যখন আঠারো বছরের তখন একদিন সকালে গঞ্জের বাজারে ভুঁষো কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে শোনে তার মা মরে গেছে। তার আগে গঞ্জে কয়েক মাস ধরে কামলা খাটছিল বদিউর, মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে একদিনের জন্যে সে বাড়িতে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল সে জানে না। তার আর দু 'ভাই তো যায় নি। তারা যশোরের ফুটপাতে দোকানি করত।

সেদিন সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে বদিউর শোনে তার মা-কে বাঁশবাগানে কবর দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন খুব। গ্রামের প্যাঁচপেচে কাদার ভেতরে বদিউরের স্পঞ্জ বসে গিয়েছিল। স্পঞ্জ হাতে করে খালি পায়ে সে হাজির হয়েছিল বাড়িতে। আর ঠিক সে সময় তার চোখে পড়েছিল উঠোনে এক জোড়া কেঁচো *জড়াজড়ি করে পৈঠার নিচে শুয়ে আছে।*

বদিউরের ছোট বোনটা তাকে দেখে কেঁদে আকুল হয়েছিল। আরেকটা বোন শ্বশুর বাড়িতে ছিল বলে আসতে পারে নি। বদিউরের ক্ষিধে লেগেছিল খুব। কিন্তু দশ বছরের বোনের কান্না দেখে মুখ ফুটে বলতে পারে নি ভাত রান্না করে দিতে। মুড়ি খেয়ে রাত কাটিয়েছিল সে। তার বাবা বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বদিউর পরদিনই আবার খুলনায় ফিরে এসেছিল। তারপর আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে যায় নি। এর বছর দুই পরে এক মাটিকাটা ছেলের সাথে ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেলে বাবা আরেকটা বিয়ে করেছিল। বাবার সাথে আর সম্পর্ক থাকল না বদিউরের।

ছোটবোনের বিয়ের পরপরই বদিউর বিয়ে করেছিল তার মামাতো বোনকে। বিয়ের পর তারা চলে এল গঞ্জে। পারভীন বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। গঞ্জে এসেই সে বাস ধরে খুলনা শহরে যাতায়াত শুরু করল।

তারপর ফট করে একদিন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে তার কাজ হয়ে গেল। বদিউরের বংশে এর আগে কেউ কোনোদিন চাকরি করে নি। না কোনো পুরুষ, না কোনো নারী। শ্রমিক জাত তারা। সবসময়

নগদে তারা কাজ সারে। তার ভেতরে পারভীনের এই মাস মাইনের চাকরি অদ্ভুত এক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নিজের মামাতো বোন পারভীন, তবু চাকরি পাওয়ার পর পারভীনকে কেন যেন অচেনা মনে হতে লাগল। বিশেষ করে পারভীন যখন মোহাম্মদ ইলিয়াসের কথা বলত তখন মনে মনে বেশ ক্ষেপে যেত বদিউর। পারভীন একদিন বলল, ইলিয়াস সারে আমারে খুব ভালো চোখে দেখে। সগ্গলরে গালি দেয়, আমারে কোনোদিন গাল দেয় না। বলে আমার হাতের কাজ নাকি ভালো। তোর দিকি তালি বদ নজর আছে ইলিয়াস সারের।

বদিউরের কথা শুনে সেদিন রেগে গিয়েছিল পারভীন। এক ছেলের মা সে, তাকে জড়িয়ে এসব কী কথা ! চোখ পাকিয়ে সে তাকিয়েছিল সেদিন বদিউরের দিকে।

কিন্তু সেসব দৃশ্য এখন দূরে। মাসের শেষে মাইনের পুরো টাকাটা যখন হাতে তুলে দিত পারভীন, তখন দুনিয়াটা বড় সুন্দর হয়ে চোখে লাগত তার। তার বাবা জীবনে যা করে নি, তাই করতে ইচ্ছে হতো। অর্থাৎ স্ত্রীকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করত।

কিন্তু সম্পর্কে মড়ক লাগল যখন তাদের ছেলে শফিউর স্কুলে যাওয়া শুরু করল। এখন আর টাকার মুখ চোখেও দেখে না বদিউর। সবটাকা এখন পারভীন ব্যাংকে রাখে। স্বামীকে আর বিশ্বস্ত মনে হয় না।

কী ভয়ঙ্কর কথা ! স্বামী, যার পায়ের নিচে মেয়েমানুষের বেহেস্ত, তাকে অবিশ্বাস? বদিউর এবার আপন মনে দোকানের চারপাশে ঘুরছে। কপালে তার অজস্র চিন্তারেখা ইলিবিলি হয়ে আছে। মনা ব্যাপারি খদ্দের ঠেকাতে ঠেকাতে একসময় বলে উঠল, ব্যাপারডা কি বলোদিনি মিয়া, টাকাপয়সা তুমার হাতে আর এনে দেয় না ?

উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়ল বদিউর। তখন তার চেহারাটা বড় করুণ ও ক্রোধান্বিত দেখাল। মনা অবস্থা বুঝে বলল, তা'লি আর ঘরের বউরে বাইরি পাঠায়ে তুমার লাভ কি হলো? তারপর বলল, কি আর ক'বো তুমারে, আমার ঘরনিডাও বায়না তুলিল, গার্মেন্টে কাজ করতি যাবে বলে। তো একদিন তারে ধইরে এ্যামুন পিটোন দিছি যে গাল ফুলে ঢোল। তিনদিন কথা বলতি পারে নি! তারপর এক্কেবারে মরা মাগুর মাছের মতন ঠান্ডা। টাকা হাতে তুইলে না দিলি গার্মেন্ট বন্ধ কইরে দ্যাও।

উত্তরে আবছা মাথা নাড়ল বদিউর। যদিও জানে নদীর পানি গড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে। এখন আর এসব সম্ভব নয়। এখন নিজের স্ত্রীকে সে চেনে না। এখন পারভীন সরকারি ব্যাংকে হিসাব খুলেছে, কথায় কথায় তর্ক করে। নিজেরই মামাতো বোন অথচ তার ভেতরে বদিউরের মায়ের কোনো ছায়া নেই। আশ্চর্য !

এই গঞ্জের বাজারটা নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলের। নাকি কয়েক'শ বছরের পুরোনো। কথাটা দোকান সমিতির মিটিংয়ে একদিন শুনেছে বদিউর। তখন যে রকম অবস্থা ছিল এখনও নাকি বাজারের অবস্থা অনেকটা সেরকম। একটা বাজার পর্যন্ত শত শত বছর ধরে একরকম থাকে আর একটা সামান্য মেয়েমানুষ সামান্য একটা গার্মেন্টে কাজ করতে গিয়ে কেমন পাল্টে যায়, অচেনা হয়ে যায়, এর মানে ঠিক বুঝতে পারে না বদিউর।

বদিউর আপন মনে এবার বাজার ঘুরতে লাগল। জুতোপট্টি, কামারপট্টি, সোনাপট্টি, কাপড়পট্টি, মনোহারীপট্টি ,গুড়পট্টি, ফলপট্টি, কত রকমের যে পট্টি আছে এই গঞ্জে, তার কোনো হিসেব নেই। তারওপর কাঁচা বাজার তো আছেই। আজ আর বদিউরকে কেউ কাজে ডাকছে না। কোনো কোনেদিন এরকম হয়। আবার কোনো কোনোদিন কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। আজ বদিউরের কপালে যেন মঘা লেগেছে। ঘুরতে ঘুরতে বদিউর আবার সোনাপট্টিতে ফিরে এল। মোহনবাবু কর্মকারের সোনার দোকানটা এই এলাকায় বেশ বড় দোকান। দোকানের কাচের বাকসে থরে থরে সাজানো আছে দুল, কানপাশা, নাকফুল, বাচ্চাদের হাতের বালা।

একটুক্ষণ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কী ভেবে বদিউর দোকানের পেছনে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখল একটা অন্ধকার খুপরি ঘরে বাতি জ্বালিয়ে নিতাই কর্মকার আপন মনে কাজ করছে। সোনার নকশা তৈরিতে নিতাইএর বেশ নাম আছে গঞ্জে। অনেকদূর থেকে মানুষ এসে এখান থেকে গহনা গড়িয়ে নিয়ে যায়। বদিউর সেখানে বসে উবু হয়ে নিতাইয়ের কাজ দেখতে লাগল। কাজ করতে করতে একসময় মুখ তুলে নিতাই বলল, কী বদিউর, আছ কেমন ?

আমি ভালো আছি দাদা, আপনি ভালো ?

বদিউর ভক্তির সাথে গদগদ হয়ে বলল।

আছি একরকম। এই দিন চলে যায়। তা তুমি যখন এসে গেছ, এট্টু বসো, আমি এট্টু মুতে আসি।

কথা শুনে আবারো ভক্তিভরে মাথা নাড়ল বদিউর, যেন কত ভালো একটা কথা বলেছে নিতাই। নিতাই বেরিয়ে যেতে বদিউরের বুকের ভেতরে ধুকপক, ধুকপুক শুরু হল। শুধু ধুকপুক, ধুকপুক আর হ্যাঁ না, হ্যাঁ না। ধুকপুক, ধুকপুক, হ্যাঁ না, হ্যাঁ না।

নিতাই দোকানের পেছনে কেটে রাখা চওড়া ড্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছরছর করে মুত সারতে লাগল, অনেক পেসাব জমেছিল পেটে , তাই পেট খালি হতে সময় লাগল।

পেসাব সারা হলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিতাই তার হাত-পায়ের ভাঁজ বার কয়েক খুলল আবার বন্ধ করল। সকাল থেকে একনাগাড়ে কাজ করার জন্যে নিতাইএর হাতপা ধরে গিয়েছিল।

একটু পরে দোকানে ঢুকে নিতাই বলল, আজ তুমার কোনো কাজকাম নেই?

উত্তরে কথা না বলে মাথা নাড়ল বদিউর। তখন তার মুখের চেহারা বড় বিব্রত দেখাল। একটু পরে উসখুস করে উঠে বদিউর বলল, এখুন তালি যাই দাদা, কী বলেন ?

বদিউর এবার ঘুরতে ঘুরতে অশত্থ গাছের ছায়ায় বসল। ভাবতে লাগল। এরপরে সে কী করবে তাই ভাবতে লাগল। এখন কিছু কাজ আছে তার। কাজটা মুন্সিয়ানার সাথে করতে পারলে সবকিছু ঠিক হয়। এখুনি বাড়ি ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা তাও ভাবতে লাগল। সাধারণত সন্ধ্যের সময় সে বাড়ি ফেরে। তার একটু আগে ফিরে আসে পারভীন। এসেই সে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর ছেলেকে গোসল করায়। তার জামাকাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। পারভীন চায় তার ছেলে সুন্দরভাবে

ফিটফাট হয়ে স্কুলে যায়।

বদিউরদের ভাড়া করা ছাপরা ঘরের আশেপাশে আরও অনেক ছাপরা ঘর আছে। একেকটা ঘরের ভাড়া মাসে ছ' শ টাকা করে। তবে বদিউরদের ছাপরা ঘরের সামনে এতটুকু এক খালি জমিতে বড় মজবুত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিমগাছ।

নিমগাছ উপকারী। তাই তাকে ধ্বংস করার জন্যে কারও শ্যেনদৃষ্টি এখন পর্যন্ত পড়ে নি। পারভীন কতদিন নিমপাতা ছিঁড়ে শুকনো খোলায় ভেঁজে বদিউরকে খেতে দিয়েছে।

এই নিমগাছের মগডালে কিছুদিন আগে একটা শকুন বসেছিল। নিমগাছে কোনোদিন শকুন বসতে দেখে নি বদিউর। নিমগাছের ডাল শকুনের শরীরের ভারে নুয়ে পড়েছিল মাটির দিকে। সবুজ পাতাগুলো থরথর করে কাঁপছিল বিয়ের রাতে কুমারী মেয়েদের কাঁপুনির মতো। শকুন দেখে পাড়ার বউঝিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করেছিল পারভীন। চিৎকার করে বদিউরকে বলেছিল, এখুন হবেনে কী ? ও আল্লা, আমাগের বাড়িতি শকুন বসেছে এখুন হবেনে কী ? নিমগাছে কি কোনদিন শকুন বসে ? এ কীসির আলামত ?

পারভীনের চিৎকার চেঁচামেচি শুনেই একটু পরে বিশাল শকুনটা তার আঁশটে ডানা বাতাসে ছড়িয়ে দূরে উড়ে গিয়েছিল।

সেদিন চার রাকাত নফল নামাজ পড়েছিল পারভীন। নামাজ পড়ে ছেলের মাথায় ফুঁ দিয়েছিল। আর সে দৃশ্য দেখে মনে মনে হেসেছিল বদিউর। বদিউর জানে ছেলের জন্যে পারভীনের মাথায় ভীষণ এক চিন্তা। এরকম চিন্তা তার মাকে কোনোদিন করতে দেখে নি বদিউর। ছয় বছরের শফিউরকে পারভীন দিনের বেলা পঞ্চাশ বছরের এক বুড়ির হেফাজতে রেখে দেয়। তাকে মাসে মাসে দুশো টাকা করে দেয় পারভীন। বুড়ি সকাল আটটায় বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসে আবার দুপুর একটায় তাকে স্কুল থেকে ফিরিয়ে এনে নিজের কাছে রেখে দেয়।

বদিউর কি এই কাজটা করতে পারত না? খুব পারত। তাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধও করেছিল পারভীন। কিন্তু বদিউর কোনো ভেড়ো স্বামী নয় যে স্ত্রীর কথা শুনে চলবে।

আর তাছাড়াও কথা আছে। কথাটা হলো, ছেলের সাথে বদিউরের সখ্য কম। সব বাবার তাদের ছেলেদের সাথে সখ্য থাকে না। একদিন তো ছেলে তাকে বলেই ফেলেছে, না, আপনার কাছে যাবো না, আপনার গায়ে গন্ধ ! আপনি গন্ধয়ালা সিগারেট খান কেন ?

গতকাল রাতে এই ছেলের জন্যেই পারভীনের সাথে বদিউরের অনেক বচসা হয়েছে। ছেলে বুড়ির সাথে বাইরে যাবে, তবু বদিউরের সাথে যাবে না। ছেলেকে চড় উঠিয়ে মারতে যেতে পারভীন তার হাত ধরে ফেলে বলেছে, দেখ, যখন তখন ছেলের গায়ে হাত দেবে না। তাহলে বড় হয়ে ছেলে তুমারে একেবারে মানবে নানে।

একথা শোনার পর চড়টা সে পারভীনের গালে মেরেছে। আর মার খেয়ে পারভীন রেগে গিয়ে বলেছে,

খোদার কসম, আর আমি তুমারে কোনো পয়সাকড়ি দেব না। তোমার গাঁজা খাওয়ার পয়সা তুমি নিজেই যোগাড় করবা।

গাছের নিচে বসে বসে মানুষের স্রোত দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল বদিউর। গাঁজা খাওয়ার জন্যে সে কোনোদিন পারভীনের কাছে পয়সা চায় না। গাঁজার টাকা সে নিজেই জোগাড় করে।

তাই বলে রোজগারের সব টাকা পারভীন তার নিজের কাছে রেখে দেবে এটা কীরকম কথা। গতকাল পারভীনের কথা শুনে মাত্র একটা চড় মেরেছিল সে। আরও চড় মারার দরকার ছিল। কয়েকটা চড় আর কয়েকটা ঘুষি মারার দরকার ছিল। কিন্তু তার সাহস হয় নি। ইদানিং পারভীনের সামনে তার সাহস কীভাবে যেন হারিয়ে যাচ্ছে সে অনুভব করে। এরকম অনুভব পুরুষ মানুষের জন্যে ভালো না। বরং খুব খারাপ। থাকতে না পেরে সে তাই বলে উঠেছিল, এই জন্যেই মানষে কয় মেইয়ে মানুষরে ঘরের বার করবা না। তালি পরে তাগের সাহস বেড়ে যায়। আর স্বামীর কপালে দুগ্গতি নেইমে আসে।

একথা শুনে রেগে গিয়েছিল পারভীন। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, এত সন্দেহ করলি পরে মেইয়ে মানুষরে বাড়িতি বসায়ে খাওয়াও না ক্যান ? আমি কি সখে কাজ করতিছি ? ছেইলেডারে মানুষ করবেনে কিডা ? তুমি তো গেঁজেল বিটা। আমার শফি কি তুমার মতন হবেনে ? ব্যস এরপরে আর কথা চলে না, চলে মার। কিন্তু সেখানেও বাধা।

মনে পড়ল ক'দিন আগে রাত দশটার পর বাড়ি ফিরেছিল পারভীন। কিন্তু তার চোখে মুখে ক্লান্তির কোন ছাপ ছিল না। বরং রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করতে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেছিল, আজ আমি ওভারটাইম করিলাম। একজনের অসুখ, তার কাজ আমি করিলাম। সামনের মাসে অনেক টাকা বেশি পাওয়া যাবেনে।

কিন্তু তার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে নি বদিউর। কারণ পারভীনের শরীর দিয়ে এমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল যেটা সুখি মানুষের গায়ের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল বদিউরের। মনে হয়েছিল যেন পারভীনের সারা শরীরে চিনি মাখিয়ে দিয়েছে কে! যেন জিভ দিয়ে চাটলে তখুনি পারভীন আদরে সোহাগে একেবারে গলে পড়বে।

তবু সে ব্যাপারটা সহ্য করে নিয়েছিল। তারপর কী হলো ? তারপর সেই ওভারটাইমের টাকা কি বদিউরের হাতে এনে দিয়েছিল পারভীন ?

না, বরং ব্যাংকের এ্যাকাউন্টে সব টাকা জমা করে দিয়ে এসেছিল। এরকম মেয়েছেলে নিয়ে বদিউর কী করতে পারে ? ভাবতে গিয়ে কেন যেন বিতৃষ্ণায় বদিউরের মুখ লাল হয়ে উঠল। ইচ্ছে হয়, বাড়ি ফিরে সবকিছু ভাংচুর করে ফেলে। পারভীনকে এমন শাস্তি দেয় যেন সে জীবনে কোনোদিন বদিউরের দিকে চোখ গরম করে তাকাতে না পারে।

রাতের বেলা লুঙ্গির কোঁচা দোলাতে দোলাতে গঞ্জ থেকে বাসায় ফিরল বদিউর। দেখল পারভীন বারান্দায় তোলা চুলোয় ডাল চাপিয়েছে। টগবগ করে ফুটছে ডাল। বিদ্যুৎ নেই তাই মোমবাতি জ্বালিয়েছে পারভীন। সে আলোয় পারভীনের শ্যামল মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। এরকম কোনো মুখের মেয়েকে বদিউর চেনে না। অথবা চেনে? অথবা তারই স্ত্রীর মুখ এরকম টলটল করছে মোমের আলোয় ?

ব্যাপারটা একটু যেন গোলমেলে মনে হল বদিউরের কাছে। সে সময় বস্তির চারপাশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের রান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে সকাল বা দুপুরের চেয়ে রাতেই রান্না-খাওয়ার পাট বেশি।

তাকে বাসায় ফিরতে দেখে মাত্র একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকাল পারভীন। কিছু বলল না। আজ সারাদিনে তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় নি। কারণ পারভীনের মোবাইল থাকলেও বদিউরের মোবাইল নেই। পারভীন তার মোবাইল গলায় ঝুলিয়ে রাখে। এটা যেন তার তাবিজ। তার জীবনে বিলাসিতা বলতে এই মোবাইল। কিন্তু কালেভদ্রে সে মোবাইল বেজে ওঠে। যাকে মোবাইল করা যায় বা যার কাছ থেকে মোবাইল আশা করা যায় সে বদিউর । কিন্তু গত বর্ষার মৌসুমে বদিউরের মোবাইল চুরি হয়ে গেছে।

পারভীন অবশ্য চুরির কথা বিশ্বাস করে নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস মোবাইল বেচে গাঁজা ভাঙ খেয়েছে বদিউর। তবে পারভীনের কথা সর্বাংশে সত্যি নয়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভাঙের সরবত খায় বটে বদিউর তবে সেটা কালেভদ্রে। এরপরেও সে আশা করেছিল পারভীন তাকে আরেকটা মোবাইল কিনে উপহার দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পারভীন সেটা করে নি? কেন করে নি? সে কি সত্যি সত্যি জানে মোবাইলটা বদিউর টাকার জন্যে বিক্রি করে দিয়েছিল ?

রাতের বেলা ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে বসে পেট ভরে ভাত খেল বদিউর। পারভীন রান্না করে ভালো। ঠিক খাবার সময় দপ্ করে জ্বলে উঠল বাতি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলতে লাগল ফ্যান। চলতে লাগল টেলিভিশন। এ সবই অন্ করা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। তারপর আর সুইচ অফ করা হয় নি। তখন টিভির পর্দায় বিজ্ঞাপন চলছিল, এ্যাসিড ছুঁড়বেন তো মরবেন। ভাত খেতে খেতে সেই বিজ্ঞাপন হা করে তাকিয়ে দেখল পারভীন। আর সেই মুহূর্তেই গলায় ভাত আটকে গেল বদিউরের। সে কেশে, হেঁচে, পানি খেয়ে একাকার করে ফেলল।

শফিউরের পা ব্যথা করছিল সন্ধ্যে থেকে। সে মায়ের কাছ থেকে ব্যথার ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল । তার জন্যে ভাত মাখিয়ে রেখেছিল পারভীন কিন্তু সে তা খায় নি।

আজ বদিউর সকাল থেকে গাঁজা স্পর্শ করে নি। মাথার ভেতরটা তার তখন পর্যন্ত পরিষ্কার ও ঝকঝকে ছিল। যেন একটা কাঁসার থালা কেউ তেঁতুল দিয়ে মেজে তার মাথার ভেতরে বসিয়ে দিয়েছিল। এখন বদিউর তার সংসারের দিকে তাকিয়ে সবকিছু খুবই পরিষ্কার চোখে দেখছে। এই তার সংসার ! একজন রমণী ও একটি সন্তান। রমণী দুষ্ট ও বিপথগামিনী এবং সন্তান জেদী ও একরোখা।

একবার পারভীনকে লাঠিপেটা করতে গেলে শফিউর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। এরকম খারাপ কাজ বদিউর কোনোদিন তার বাবার সঙ্গে করে নি। শুধু তাই নয় সেদিন শফিউর আঁচড়ে কামড়ে এক করেছিল বদিউরকে।

তার পরদিন পারভীনকে পেটানোর লাঠিখানা বাসা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বদিউরের তাতে বেশি অসুবিধে হয় নি। লোডশেডিং-এর দেশে হাতপাখারা বন্ধু। বড় বড় দু'টো হাতপাখা আছে বাসায়। মেলা থেকে সখ করে কিনেছে পারভীন। লাল রঙ দিয়ে নকশা করা পাখা দুটোর গায়ে। একটা পাখার ডাঁটি খুব মজবুত। সেটা দিয়ে পিঠের ছালচামড়া অনায়াসে তুলে ফেলা যায়। ভাত খাওয়ার পর কলাইকরা মগে পানি নিয়ে মুখ কুলুকুচু করল বদিউর। কুলির পুরো পানিটা সে ফেলল নিমগাছের গোড়ায়। নিমগাছটা তার ঘরের লাগোয়া।

ঘরে পাতা ছিল দুটো খাট। একটা উঁচু খাট। সেখানে বদিউর আর পারভীন। আর নিচু খাটটাতে সাত বছরের শফিউর বা শফি।

একটু পরে ঘর অন্ধকার করে পারভীন তার শরীর থেকে শাড়ী খুলে ফেলল। শরীর থেকে ব্রা খুলে ফেলল। পেটিকোট আর জামার ওপরে জড়িয়ে নিল পাতলা ফিনফিনে ওড়না। তারপর চিৎ হয়ে সে শুয়ে পড়ল বিছানায় ।

বদিউর বিছানায় উঠে আগে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো । তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে পারভীনের শরীরে হাত রেখে বলল, এত রাগ কীসের, হ্যাঁ ? সারাদিনের খাটাখাটুনির পর পারভীন ক্লান্ত। সে মুখ তুলে বলল, কী চাও ? বদিউর উত্তরে বলতে পারত, তোমাকে।

কিন্তু এত কথায় দরকার কী? সে সোজাসুজি কর্মে লিপ্ত হল। আশ্চর্য, অন্যসময় হলে পারভীন একটু গাইঁগুই করত। আজ সেসব কিছু করল না। এমন হতে পারে হয়ত সে খুব ক্লান্ত ছিল। অথবা বদিউরের ব্যাপারে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্ধকারে একসময় পারভীনকে ছেড়ে সে সরে এল। তারপর একটা বিড়ি ধরালো। এ এলাকায় বিড়ির চল আছে বেশ। আর পারভীন নিঃসাড়ে পড়ে থাকল। একটু পরে জোরে জোরে শ্বাস ছেড়ে ঘুমের সাগরে তলিয়ে গেল সে।

বদিউরের মনে এতক্ষণ পরে একটা খটকা লাগল। মনে হল হয়ত সঙ্গমের পুরো সময়টা পারভীন ঘুমিয়েছিল। কারণ তার শরীরে কোন সাড়া ছিল না।

এতখানিই মূল্যহীন সে পারভীনের কাছে ? কথাটা ভেবে বদিউরের মন তিক্ত হয়ে উঠল। সে জোরে জোরে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আস্তে করে বিছানা ছাড়ল। অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়ে লুঙি পরে নিল। এরপর ছেলের খাটের নিচে মাথা ঢুকিয়ে বের করে আনল কাগজে মোড়ানো শিশিটা। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আরও একটু। একটা কাক এইসময় পাখা ঝাপটে উড়ে গেল বাইরে।

এতরাতে কাক ওড়ে কেন, ভাবল বদিউর। তারপর হাতের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খাটে উঠল, খুব নিঃশব্দে খাটে উঠল যেমন নিঃশব্দে শেয়াল মুরগি ধরার আগে উঠোনে ঢোকে ।

এবার ভালো করে সে মুখ দেখল পারভীনের। আজ সন্ধ্যে থেকে পারভীনের কী যেন হয়েছে। কথা বলে না। গম্ভীর সঙ্গমের সময় অচেতন। এভাবে কি জীবন চলে? এখন মুখের ওপর ওড়না বিছিয়ে শুয়ে আছে সে। ফ্যানের বাতাসে ওড়না মৃদু মৃদু উড়ছে।

বদিউর ধীরে সুস্থে তার মুখ থেকে ওড়না সরালো ।

এরপরে কি হবে তা জানত বদিউর। কিন্তু পারভীন সেটা জানত না। পারভীন তখন পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল।
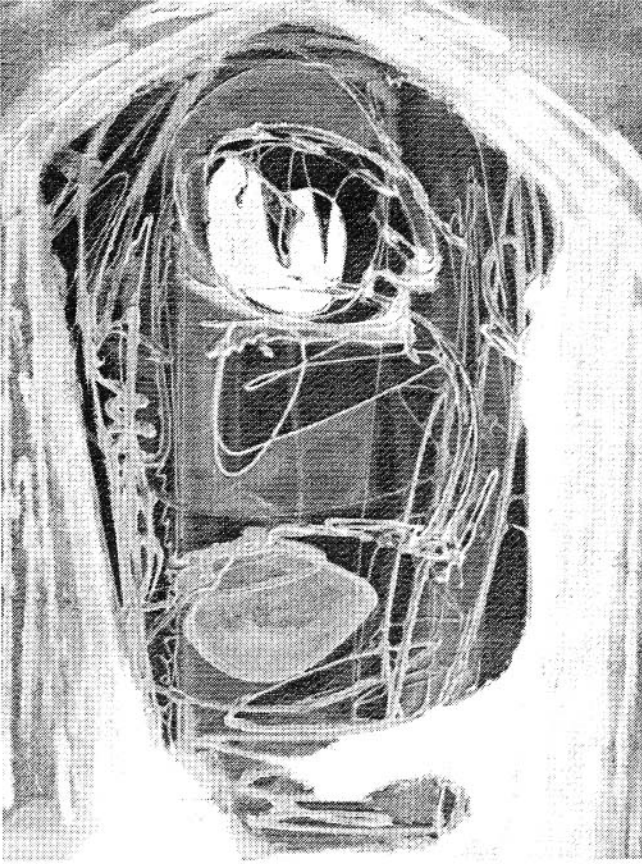
আঁধার

পারভেজ হোসেন

মধ্যরাতে হওয়ার জন্যে নড়েচড়ে ওঠে শিশুটি। আগলে রাখা জরায়ুর মজবুত দেয়ালও কমে-বেড়ে যত চাপই তৈরি করুক না কেন, মাথা ঘুরিয়ে ঘুমের ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসার মুখে ওর অপেক্ষায় মায়ের খিঁচুনি বেড়ে যায়, দম আটকে আসে। কোমর থেকে ছিঁড়ে আলগা হতে চায় নিম্নদেশ। প্রথম ধাপের ব্যথা যা শুরু হয়েছিল গতরাতে ঝুপড়ি ঘরে, ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় ধাপের ব্যথাও। আর এখন এখানে দীর্ঘস্থায়ী সে প্রসব যন্ত্রণা যেন আর সইতে পারে না মেয়েটি। যোনি বেয়ে গোলাপি জলের ক্ষীণ ধারায় পরনের কাপড় চুঁইয়ে ভিজে গেছে নিচের চাদর। প্যাচপ্যাচ করছে, ঘিন ঘিন করছে। বদলে দেবে বা মুছে দেবে তেমন কেউ নেই। জরায়ুর মুখ এখন যতটুকু খুলে গেলে বের হয়ে আসা যায় ততটুকু আর খোলে না কিছুতেই। বেরোতে না পেরে তখন হয়ত বা অভিমান হয় শিশুটির অথবা একটা গোয়ার্তুমি নিয়ে পৃথিবীতে ছায়া ফেলার আগেই একেবারে জানে মেরে ফেলতে চায় মাকে। দাঁতমুখ খিঁচে মেয়েটি তখন প্রাণ ফাটিয়ে মা মা করে ওঠে। চকচকে শক্ত শানে কিছু না পেয়ে পিঠের তলার চাদর, মাথার নিচের বালিশ খাবলে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে কোঁৎ দেয়, গোঙায়, কাতরায়, ওকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে, নিজেকেও নিস্তার দিতে চায়। কিন্তু এ-সব বৃথা ভেবে বা মায়ের কষ্ট বুঝতে পেরে কিনা কে জানে ; এমন দাপাদাপির পর ও যখন নিস্তেজ হয়, পুরোনো ঘুমের মধ্যে ডুব দেয়; তখন ওর মা যে কিছুতেই বিয়োতে পারছে না– চোখ মুদে, হাত-পা ছড়িয়ে থম ধরে থাকে কিছুক্ষণের জন্য।

ব্যথা যখন মারমুখী হয়ে শুধু বাড়তেই থাকে, প্রসব হওয়ার

কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না; এমন ভোর তখন– ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো নেভে নি। যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে গেলে ঝুপড়ি ঘর থেকে ধরাধরি করে মেয়েটাকে ভ্যানে তুলে শমসের চোখের পিচুটি ঘষে কড়া ঘুম তাড়ায়। যত দ্রুত সম্ভব চালিয়ে আসতে চায়। কিন্তু চাইলেই কি হয়? গলি পার হয়ে রাস্তায় পড়েই তো দফারফা। সুয়ারেজের পাইপ বসাবে বলে পাশাপাশি দুটো রিকশা চলতে পারে না এমন রাস্তা খুঁড়ে, মাটি তুলে, ইট-বালু ফেলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে রেখেছে। ওর মধ্যে ময়লা আর আবর্জনা মেশা পানি জমে জগাখিচুড়ি অবস্থা। প্যাডেল থেকে নেমে টেনে-টেনে ভ্যান নিয়ে যাচ্ছে তবুও চাকা খামি আঁটে আর এত লাফায় যে, রাস্তাই না প্রসব হয়ে যায় বা মেয়েকে শক্ত করে ধরে থাকা থেকে যদি পড়ে যায় বুড়িমা সে ভয় শমসেরের। নিজের সাথে বোঝাপড়া আর খানা-খন্দের সাথে যুদ্ধ সেরে বড় রাস্তায় উঠে নিরাপদে হাসপাতালে পৌঁছায় সে। রুটি-কলা বোতলে পানি দিয়ে নার্সদের ডাকাডাকি করে। এরপর একরকম নিরুপায় হয়ে সে যখন যায় ডিউটির ডাক্তাররা তখনো কেউ আসে নি। আত্মীয় বান্ধব কেউ নয়, তবুও কম করে নি ছেলেটি। ভ্যান নিয়ে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে হবে, বিকেলে আসার কথা দিয়ে তাই যেতে হলো ওকে। বলল,আপাগো কইয়া গেলাম, বড় ডাক্তার আইলেই একটা ব্যবস্থা করবোনে। মেয়েটির নাকের চারপাশে এখন ফিনাইল আর ডেটলের ঘ্রাণ। কানে আসে নার্সদের ছোটাছুটি। হাতের নাগালের মধ্যে বুড়ি মা' দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাথার কাছে পোটলার মতো পড়ে আছে। বিস্তর বয়স বুড়ির। কুঁচকে ঝুলে যাওয়া চামড়া ফুঁড়ে ভোতাভোতা হাড়-হাড্ডি এমনভাবে উঁচিয়ে আছে ভাবতে কষ্ট হয় না সে কতটা প্রাচীন। চোখেও ছানি তাই তার ঠিক ঠাহর হয় না সব।

হাসপাতালের দীর্ঘ বারান্দা জুড়ে এভাবে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে কতজন। কারো কারো চেতনা নেই। স্ট্যান্ডে ঝুলানো স্যালাইন পাইপ দিয়ে টিউবে পড়ছে টপটপ না হলে বোঝার উপায় কী বেঁচে আছে না মরেছে। দেখারই বা আছে কে? বারান্দার রোগীদের কোনো জাত আছে? সব বেওয়ারিশ।

পরপর দুটো দালানের মাঝে বিরাট ফাঁকা। সেখানে সবুজ ঘাস। নানা জাতের ফুলে কত রং। লম্বা কাঁচি দিয়ে ছাঁটা ঘাস আর গাছগুলো মন ভোলানোর মতো পরিপাটি। বুড়ির ওতে মন নেই। বারান্দা দিয়ে সাদা এ্যাপ্রন পরা কাউকে যেতে দেখলেই সে ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা কয়, একই সুরে বকে, বাবাগো... মা জননী... মাইয়াডা যে মইরা যাইতেছে... এট্টু দেহোনাগো...। এসব শুনে শুনে এদের এমন অভ্যাস হয়েছে– ফিরেও তাকায় না কেউ। বুড়ি তবুও বকে। বকে বকে স্বর ভোতা করে।

ডাক্তার যখন এল, ততক্ষণে অন্তত একটা হিল্লে হয়েছে মেয়েটির। ভেজা কাপড় আর পেটিকোট বদলে পলিথিনে মুড়ে রেখে আর একটা পরানো হয়েছে। চাদর পাল্টে কাঁথা পেতে স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কোনোমতে ঠেকানো গেছে তখন।

নার্স-ছাত্রছাত্রী-অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে ডাক্তারের পুরো একটা দল ঘুরে ঘুরে বারান্দার রোগীদেরও এক এক করে দেখে নিচ্ছে। পরামর্শের মাঝে শেখানোর কাজটাও সারা হলে দোষ কী? হয়ত বা এটাই নিয়ম।

অনেকক্ষণ ধরে টিপে-টুপে দেখলেন তিনি। স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বাচ্চার হার্ট রেট দেখে নিলেন। মেয়েটির প্রেসার চেক করলেন। কিন্তু প্রশ্ন যে করবেন রোগীকে, তার উপায় কী? রা করার মতো হুঁশ যে নেই ওর। বুড়ি মা আছে, তিনিই এখন ভরসা। মেয়ের হাত চেপে ধরে ডাক্তারের মুখের দিকে ঝাপসা চোখে অপলক চেয়ে থেকে আল্লাকে জপছে বুড়ি। ভাবছে– এ কোন জমানায় আনল খোদায়। চাইর-চাইরটা বাচ্চা বিয়াইলাম, কই এ্যামোন তো হয় নাই। ব্যথা উইঠ্যা ব্যথা বাড়ে, বাড়তে বাড়তে বিষের দলার মতো সুরুত কইর‍্যা বাইর হইয়া যায়। ডাক্তার বৈদ্য কাউরে লাগে নাকি? খালা-ফুপুরা ধরাধরি করছে। প্যাট খালাস হয়োনের লগে লগে আহা কী শান্তি! দিলে দুনিয়ার সব সুখ মুহূর্তে আইসা ভর করে। নাইলে বার বার বিয়াবার ভার কে বয়?

বুড়ির ভাবনা ছিন্ন হয় ডাক্তারের ডাক শুনে,

এই যে খালা রোগিনী কী হয়?

ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট খসখস করে প্যাডে লিখছে তখন। বাকিরা চারদিক আগলে হুমড়ি খেয়ে স্যারের কথা শুনছে।

আমার মাইয়া বাবা।

শেষ কখন খেয়েছে বলতে পারেন?

কাইল রাইতে।

কতটা খেয়েছে, আপনি ছিলেন কাছে?

কী আর খাইব। খাওয়া কি আর জোডে কপালে। ব্যথা উডোনের আগে দুই চাইর দলা ভাত খাইল বাইলা মাছ দিয়া। কয়, আমার বমি লাগে মা। আর খামু না। এরপর পানি ছাড়া আর কিছু খায় নাই বাছায় আমার।

সাথে কে আছে আপনার, পুরুষ মানুষ কেউ নাই? জিজ্ঞেস করেই সঙ্গীদের ইশারা করেন ডাক্তার। বলেন, বেবির পজিশান অলরাইট। বাট নট ইন প্রোগ্রেস। মে বি ওয়েট করতে হবে। একটা ইনজেকশান দাও, লেবারটা হালকা হবে। নার্স, স্যালাইন লাগাও। ইটস্ সো লেইট ইউ নো। এই মেয়ে, বলে এক ছাত্রীকে কাছে ডাকলেন ডাক্তার। বললেন, তোমার স্টেথোস্কোপ লাগাও, বাচ্চার হার্ট রেট নাও দেখি।

মেয়েটি তার দু'কানের ফুটায় নল গুঁজে হাঁটু মুড়ে বসে রোগীর পেটের বাঁ দিকে নিবিষ্ট মনে ঠাণ্ডা চাকতি চেপে ধরে।

কি পাচ্ছ? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন। বলেন,

প্রত্যেক প্রসূতির লেবার পেইনটা টোটালি ডিফারেন্ট, আশ্চর্য তাই না? আমরা ঠিক জানি না এটা কতক্ষণ স্থায়ী হয় আর এর
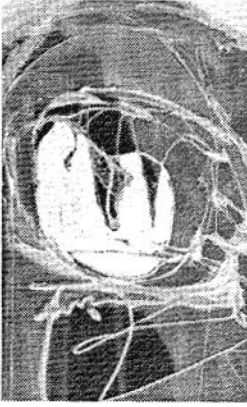
সঠিক শুরুটাও না। কেসটা অন্যদের মতো নয়। সম্ভবত অনেক সময় নেবে। অপুষ্টিতে ভোগা রোগী। এরপর নার্সকে নির্দেশ দেন, একে বেডে ট্রান্সফার করা যায় কি-না দেখো।

হাতের জোড়া নল গলায় ঝুলিয়ে মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এবার হাঁটু মুড়ে বসা অবস্থায়ই বৃদ্ধার দিকে ঘোরেন,

হ্যাঁ, বলেন তো খালা কে কে আছে আপনার?

কেউ নাই বাবা। গলির মুখে পান সিগারেট বেচত জামাই। গাঁজা-হেরোইন বেচে কইয়া পুলিশে ধইরা নিল। কত চেষ্টা করল মাইয়ায়। থানায় টাহা-পয়সা দিল, দারোগার হাতে পায়ে ধইরা কান্নাকাটি করল, ছাড়াইতে পারল না। বিনা অপরাধে পোলাডা এ্যাহন হাজত খাডে।

ডাক্তার আর তার দল এসব শোনে কি শোনে না কে জানে। নার্স স্যালাইন জুড়ে দিতে গলদঘর্ম হচ্ছে । ইনজেকশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্যজন। এদিকে বুড়ির ফিরিস্তি আর ফুরায় না। বুড়ি বলে– শ্যাষে আর কি করি... ভাত তো চাই। মাইয়ায় এই প্যাট লইয়াই দোকান চালায়। মাঝে মইধ্যে গিয়া বই। তয় বইয়া লাভ কি? চোহে দেহি না, হিসাব-পাতি বুঝি না, খালি খুডি অইয়া বইয়া থাহা! ওদিকে পুলিশ আওনের খামতি নাই। খালি দাবরানি দেয়, এরে ধরে, ওরে মারে। দেখতে দেখতে নাতিন অওনের টাইম অইয়া আইলো। একটা পোলা আছে পাশের ঘরে থাহে, শমসের। ও-ইতো এত কিছু করল। কাইল থাইক্যা মাইয়ায় কি কষ্টই না পাইতে আছে, কিছুতেই খালাস অয় না বাজান।

শিরায় ইনজেকশনের পর স্যালাইন পেয়ে মেয়েটি একটু যেন থিতু হয়েছে। পুচপুচ করে বের হওয়া খানিকটা গোলাপি পানিতে এখন আর কাপড় ভিজতে পারছে না বলে ঘিনঘিনানিটা আর নেই। ওখানে কিছু তুলা চেপে দিয়েছে নার্স।

দলবল নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে পুরো বারান্দা জুড়ে শুনশান নীরবতা। একমনে বুক উজাড় করে কথা বলে বলে বুড়িও মাথা নিচু করে ঝিমাচ্ছে এখন। কিন্তু এই ঝকঝকে মধ্য দুপুরে যত নীরবতাই থাক শিশুটির বোধ হয় ঘুম ভেঙে যায়। নড়েচড়ে একদিকে একটু কাত হয়ে আবারও তৎপরতা... পথখোঁজা... বাইরের অজানা আলোর ইশারায় জঠরের অন্ধকার গহ্বর শনাক্ত করে যেন, যেখানে একটা দানার মতো জন্মে আজ এত বড়টি হয়েছে সে। ওকে ঘিরে থাকা জলতরল ফোঁটায় ফোঁটায় কমে যেতে থাকলে জরায়ুর কোমল অথচ মজবুত দেয়ালে পর্দার মতো আবরণের স্পর্শ পায় শিশুটি। এসময় অকস্মাৎ তন্দ্রাছোটা ব্যথাহত মেয়েটি মা, মা, মা, বলে বুড়ির কোমরে গোঁজা শাড়ির দলা খুবলে নিতে চায়। কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে– আল্লারে ডাক মা, আল্লারে ডাক। এই তো হইয়া যাবে বলে বার বার মেয়ের মাথায় হাত বুলায় বুড়ি। বলে, ও নাতিন মায়রে এতো কষ্ট দিতাছো ক্যান আ...? বাইর অইয়া আও মানিক। আমার মাইয়ারে আছান দেও।

ষোল-সতেরো ঘণ্টা কেটে গেছে। লেবার পিরিয়ডের জন্যে এটা কম সময় নয়। নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও প্রসব বেদনা চলতে থাকার একটা মাত্রা তো আছে। ডাক্তার যাবার পর বুড়িমা বুকে বল পেয়েছিল, আর চিন্তা নাই। আস্থা পেয়েছিল, কি ফেরেশতার নাহান মানুষ, কতো কথা শুনল, দেখল। কিন্তু বিকেল ঘনিয়ে এলেও শমসের কেন আসে না? ডাক্তার বেড

ভেতরে যত পানি ছিল গড়িয়ে গড়িয়ে শাড়ি কাঁথা চুপসে মেঝেতেও নেমেছে। জরায়ুর মুখ যতখানি খোলা তাতে মাথা ঠেকিয়ে চাইলেই বেরিয়ে আসা যায় কিন্তু মায়েরও তো তেমন সাড়া নেই। আর কোথায়ই বা আসবে ও। বাইরের বদ্ধ বাতাসের চেয়ে জঠরের অন্ধকার ঢের ভালো ভেবে অন্যদিকে ঘুরে যায় শিশুটি

দেবে বলার পরও কই আর তো কেউ খোঁজ নেয় নি। চিন্তায় পড়ে বুড়ি, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তার, অস্থির লাগে, সেই সকাল থেকে একবার পেসাব করতেও যায় নাই। উঠে যে যাবে সে সাধ্য তো নেই, উদ্‌ভ্রান্তের মতো খালি প্যাঁচাল পাড়ে শুধু আর টানা আছাড়ি বিছাড়ি। তিন-তিনডা ছাওয়াল আর সোয়ামিরে বুকের মধ্যে বিষের তাবিজের নাহান গাইথা থুইছি। মরণ আমারে দেহে না কেন্? বিষবৃক্ষ অইয়া বাইচ্চা রইছি কেন্?

আল্লা-রসুল গো, ভাবলাম চান্দের টুকরা হইব, কোলে লমু, সেই টুকরার দিকে চাইয়া ভুলমু সব। তয় কি আমার বেবাকই মিছা, বলেই এসময় এমন একটা শ্বাস ছাড়ে বুড়ি যেন কলজে ফেটে পাঁজর ঠুকে তিনপুরুষের বদ্ধবাতাস বেরিয়ে এল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখন। পাউরুটি আর গলা দিয়ে নামল না বলে বোতলের পানিতে বুক ভিজিয়ে মেয়ের পাশে একটু শুয়ে বুড়ির চোখ মুদে এসেছে মাত্র। মেয়েটাও অনেকক্ষণ বেঁকেচুরে কাতরে প্রবল বেদনার ভার সয়ে সয়ে নিশ্চুপ নিথর।

নিরানন্দের বিকেল আচমকা উথলে ওঠে। কাউকে কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে দমকা হাওয়ার তীব্রতায় সাইরেনের মর্ম চেরা আর্তনাদে দিগ্বিদিক বিদীর্ণ করে গোটাকয় অ্যাম্বুলেন্স এসে ডানা গুটানো বাজের মতোন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু একী? ওগুলোর দরজা খুলে যেতেই উৎসুক সকলের নাকে আসে পোড়াপোড়া ঘ্রাণ আর নজরে পরে তাজা রক্তে মাখামাখি কতগুলো মাংশের স্তূপ যেন– সবাই ধরাধরি করে টেনে, হিঁচড়ে, আছড়ে যে যেভাবে পারছে ঠেলেঠুলে ইমার্জেন্সির মেঝেয় ফেলছে শুধু। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। পিলপিল করে আসা মানুষে মানুষে তিল ঠাঁই আর নাই। কে কাকে দেখে! কে শোনে কার কথা! ডাক্তার-নার্স-আয়া যে যেখানে ছিল সবাই বেঁহুশের মতো অসংখ্য হতাহতের এই আকস্মিক আগমনে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, কতক্ষণ, আধ ঘণ্টা হবে– বাইরের পরিপাটি সবুজ লন, তারও ওপারের বিস্তৃত রাস্তা পরপর সাজানো বেডের সারিতে আর চোখে পড়ে না। রক্ত সংগ্রহের একটা ফার্ম যেন। সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মানুষ, কে কার আগে রক্ত দেবে। দেখতে দেখতে বাইরের ভিড় আর হল্লা, ভেতরের হৈহুল্লোড় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলায় ডুবে গেল। এরই মধ্যে কোনোমতে ভিড় ঠেলে কেউ রিকশায় কেউবা ভ্যানে, কারো কব্জি নেই, কারো পায়ের গোড়ালি খসে ঝুলে আছে, কারো মুখের এক পাশ হাড়মাংশ থেতলে রক্ত-ধুলায় জবজবে– এরকম আহতদের নিয়ে যার যতটুকু সাধ্য একের পর এক হাজির। এদের মধ্যে একটি শিশু কোন আপনের কোলে কে জানে, হাত-পা-মাথা নেতিয়ে পড়েছে তার। প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। রক্ত ওর জামা চুঁইয়ে এখনো টপটপ করে ঝরে পড়ছে।

আকাশ কাঁপানো চিৎকারে, আহাজারিতে, আতঙ্কে পুরো হাসপাতাল চত্বর যেন এক বীভৎসভূমি। যে চোখে দেখে নি তার কল্পনার অতীত সে পৈশাচিকের স্রোত ততক্ষণে এই বিশাল ভবনের কোনো রন্ধ্রে প্রবেশ আর বাকি নেই।

শমসের যখন এসে এই হট্টগোলের গোলকধাঁধায় ওদের খুঁজে পায় তখন সেও উদ্‌ভ্রান্ত। গেট দিয়ে ঢোকার আগে রিকশা থেকে কাউকে নামাতে গিয়ে ওর শার্টও যে রক্তে ভিজে গেছে সে খেয়াল তার নেই। কি করে থাকবে? মুষড়েপড়া স্বজনহারাদের বিষণ্নতায়, আর্তনাদে শ্বাস আটকে যাওয়ার মতো ঘন হয়ে আছে বাতাস। বুড়ি কাছে পেয়ে অকুলে ভেসে চলা স্রোতে খড়কুটার মতো শমসেরকে জাপটে ধরে, আইছো বাজান? কি হইছে, কি বেত্তান্ত কিছুই তো বুঝি না। সবাই খালি কয় বোমা-গেনেট– আর এ্যাতো মানুষ, এ্যাতো মানুষ! কোনহানে কি হইছে বাপ?

কি উত্তর দেবে শমসের ভেবে পায় না। এদিকে মেয়েটি কুমড়ার মতো পেট উঁচু করে যেভাবে নিশ্চুপ চিৎ হয়ে আছে, দেখে ভয় পেয়ে যায় সে। মেয়ের নীরবতা আর পুরো পরিস্থিতিতে বুড়ি বুঝি হুঁশ হারিয়েছিল। এবার ধড়ে প্রাণ পেয়ে মেয়ের জন্য মরা কান্না জুড়ে দিল সে,

বাপ জেলে গিয়া মাইয়াডার সর্বনাশ করছে। আবার তুমি জালিম আমার বুক খালি করলা কিনা কে জানে। ওরে নাতিন রে... আমার পোড়াকপাইল্লা রে... বলে বলে বুক চাপড়ায় আর কান্দে বুড়ি।

শমসের কখন যে উঠে গেছে ডাক্তারের খোঁজে সে খেয়াল করতে পারে নি। চিৎ অবস্থায়ই বারকয়েক মোচড়ায় মেয়েটি। গোঙানির অস্ফুট একটু আওয়াজও কি পাওয়া যায়? বৃদ্ধা মা'র হাড়ভাঙা আর্তির তলে তার আর হদিস মেলে না।

এমন বিপন্নতার কালে টিভি ক্যামেরা, সাংবাদিক, পুলিশ, রাজনীতিবিদ, আমলায় ঠাসা জনারণ্যে বারান্দার কোণে পথের পাতার মতো পড়ে থাকা প্রসূতির খোঁজ কে নেবে? তবুও জোঁকের মতো লেগে থাকে শমসের।

ভেতরে যত পানি ছিল গড়িয়ে গড়িয়ে শাড়ি কাঁথা চুপসে মেঝেতেও নেমেছে। জরায়ুর মুখ যতখানি খোলা তাতে মাথা ঠেকিয়ে চাইলেই বেরিয়ে আসা যায় কিন্তু মায়েরও তো তেমন সাড়া নেই। আর কোথায়ই বা আসবে ও। বাইরের বদ্ধ বাতাসের চেয়ে জঠরের অন্ধকার ঢের ভালো ভেবে অন্যদিকে ঘুরে যায় শিশুটি। ঘৃণা আর ক্রোধে কিনা কে জানে বা, পায়ে নাড়ি পেঁচিয়ে ধীরে ধীরে যে পথে প্রথম আলো দেখবে বলে কত কষ্টই না দিল সে, সে পথে পাছা ঠেকিয়ে মায়ের সাথে সাথে পুরোনো তন্দ্রায় ডুবে যায়।

জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিষ্ণু দে : এক আভাঁ গার্দ

মহীবুল আজিজ

ঈশ্বরগুপ্ত পরবর্তী বাংলা কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে তেমনি নবতর ভাবভঙ্গির সৃজন ঘটান। মধুসূদন যদি বাংলা কবিতাকে মুক্তির সন্ধান দেন, বিষ্ণু দে তাকে দেন স্বাধীনতার আস্বাদ। তিরিশের কবিগণ অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব সকলেই কোনো না কোনো গুণে বিশিষ্ট এবং পাশ্চাত্য সংস্পর্শে তাঁরা আবার একে অন্যের সন্নিহিত। কিন্তু বিষ্ণু দে তারপরেও স্বতন্ত্র এবং এঁদের সকলের চাইতে আলাদা। কেউ কেউ বলতে পারেন জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতন বিষ্ণু দে-ও নির্জনতার বন্দনা গেয়েছেন। কিংবা বিষ্ণু দে-ও সুধীন দত্তের মতন সন্ধান করেছেন ধ্রুপদী সংহতির। জীবনানন্দ নির্জনতাকে সংরক্ষিত রেখেছেন নির্জনতাতেই, বিষ্ণু দে নির্জনতাকে একদিকে রেখেছেন নির্জনে, অন্যদিকে একে নিয়ে গেছেন জনতার দিকে। সুধীন দত্তের মতন তিনিও ধ্রুপদী সংহতির অন্বেষক, আবার তাতে লোকায়ত জীবনের চেতনাকেও তিনি সংযোজন করেন। পৌরাণিক সংবাদেরও তিনি বাহক কিন্তু তাঁর পুরাণ সমকালীনতায় ভাস্বর। কখনও-কখনও তত্ত্বের পটভূমিতে ও তাঁর কবিতাকে দেখা চলে, যদিও বিষ্ণু দে'র কবিতা তত্ত্বাক্রান্ত নয় বরং তত্ত্বসমূহকেই তিনি করে তুলেছেন কবিতাক্রান্তে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের পৌরাণিক সংযোগ থেকেই বিষ্ণু দে'র স্বাতন্ত্র্য সূচিত। ১৯৩৩-এ প্রকাশিত সে-কাব্যগ্রন্থের (উর্বশী ও আর্টেমিস) সমকালীন পটভূমি সঙ্গে রাখলে দে'র এ-প্রচেষ্টার

মাহাত্ম্য স্পষ্টতর হয়। একি তবে সমকালীন বিশৃঙ্খলা এবং উপনিবেশিক অবরুদ্ধতা থেকে একটু মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার ইকারুসিয় অবকাশ ! বাস্তবের সব জানালা যখন একে-একে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন কবিতার ঘরের সব দরজা মেলে যাচ্ছে একের পর এক। কিন্তু এই 'অবকাশ'কে কোনোভাবেই পলায়ন বলে চিহ্নিত করা যায় না। বহু চোরাবালি পেরিয়ে ফেরেন তিনি সন্দীপের চর-এ, দাঁড়ান স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে। পৃথিবীর বিখ্যাত কবিগণ এবং ভারতীয় কিংবা বাংলা সাহিত্যের কবিরা ও তাঁদের কাব্যে পুরাণের ব্যবহারে যথেষ্ট পারঙ্গমতার ছাপ রেখে গেছেন। বিষ্ণু-পূর্ববর্তী অন্তত একজন কবির দৃষ্টান্ত থেকে বলা চলে যে তাঁর পুরান পশ্চাদপসরণ নয় বরং তীব্রভাবে তা সমকাল-আভিমুখ্য। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর মূল সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'র পৌরাণিক পটভূমি যে বাস্তবের বিনির্মাণ তা খানিকটা গবেষণাতেই ধরা পড়ে। এ-কাব্যে মধুসৃষ্ট দেবতালোক আসলে ব্রিটিশ সরকার, যাদের কলকাজা ছড়ানো ছিল নানা প্রশাখায়-কমন্স-সভায় ও ব্যক্তিত্ব বিভায়। রাম ও তদীয় বাহিনী হচ্ছে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যারা একদিন সনদ (চার্টার) পাবে রাবণ-রাজ্য শাসনের। রাবণ, বলাবাহুল্য 'ডিফেন্ডার অব দ্য আর্থ'-প্রতিরোধযোদ্ধা। রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ হলেন ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বিষ্ণু দে চেয়েছেন সমকালীন ঔপনিবেশিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি– তাই ইংরেজি বা ইউরোপীয় পুরাণ নয় তাঁর অম্বিষ্ট হলো গ্রিক পুরাণ। গ্রিস এক অর্থে প্রাচ্য-ই। অনন্তর নানা-দেশীয় পুরাণ-প্রক্ষেপনে অক্লান্ত বিষ্ণু দে। সমপরিমাণেই চলে তার স্ব-ঐতিহ্যিক পুরাণেরও উৎকলন। বিষ্ণু দে'র পুরাণ এক স্বপ্নলোক যেখানে একেকটি চরিত্র, একেকটি অনুষঙ্গ নতুন-নতুন দরজা খোলার চাবি– পুরাণ তাঁর জন্যে অন্যতম প্রধান ও প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

বিষ্ণু দে'র অবরুদ্ধতার পরিবেষ্টনী চরাচর-পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বসমর এবং কলকাতার সবটাই এক ধরনের চোরাবালি-র ইশারা। কোথাও কোনো প্রসন্নতা নেই–"এ ঘন প্রহরে। ইশারা বিছায় পথে কোন ধ্রুবতারা ! উদভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা। নির্মিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।" (বিভীষণের গান', পূর্বলেখ, ১৯৪২) নগরে ভিড় অথচ নগর নিঃসঙ্গতায় ভরপুর। অতৃপ্তি, অশান্তি প্রতিমুহূর্তের যন্ত্রণা। আমাদের মনে পড়বে বিষ্ণু দে'র সহযাত্রী বুদ্ধদেব বসু'র নায়ক সৌমেন (নির্জন স্বাক্ষর– এ) আত্মহত্যা করেছিলেন এই কলকাতা শহরেই। শুধু এ– শহরই নয় সারা পৃথিবী-ই প্রতিফলিত হয় উদ্ধারহীনতার চিত্রকল্পে– "পার্থ যে তোমার। অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গান্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার। আজ দেখি অসাধ্য যে তার !" (' পদধ্বনি', পূর্বলেখ, ১৯৪২) ফলে "লুব্ধ যাযাবর'-দল চতুর্দিকে মাতে 'ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে' অবাধে। বৈশ্বিক প্রতিরোধের পটভূমিই কি শেষ পর্যন্ত কবির চিত্তে দোলা দিল নতুনের উন্মুখতায় ! যুদ্ধশেষের বাস্তবতায় পুনর্গঠনের দৃশ্যপটে চলে অন্য এক আয়োজনের প্রস্তুতি– ১৯৪৭-এ ঔপনিবেশিক শাসকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচেছ এবং এ বছরেই প্রকাশিত হচ্ছে বিষ্ণু দে'র 'সন্দীপের চর'। অতঃপর আর কোনো রূপক-আড়াল নেই, সবটাই প্রভাতময়–

"ওদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান।"
('মৌভোগ', সন্দীপের চর, ১৯৪৭)

অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির অবকাশ এনে দেয় তাই সন্দীপের চর। এটি কবি'র এক স্বপ্নবসতি যেটির সৃজন-প্রক্রিয়ায় স্পৃষ্ট নব জীবনের গান। এ-চর আশা ও আশ্বাস যেমনটি আমরা দেখেছি প্রায় এক যুগ আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে– 'পদ্মানদীর মাঝি'র ময়নাদ্বীপে। ময়নাদ্বীপ-ও ছিল তেমনি এক স্বপ্নবসতি । তীব্র সংবেদনাময় সংগ্রামশীল যোদ্ধার নিজস্ব বৃত্তের বিকল্প নেই– সেই বৃত্ত তার অস্তিত্ব, সেই বৃত্ত তার স্বাধীনতার আস্বাদের জগৎ। একজনের দ্বীপ এবং অন্যজনের চর।

নগরের সংকীর্ণতা থেকে উন্মুক্ততার দিকে এ-যাত্রা। এভাবেই নির্জনতাকে বিষ্ণু দে নিয়ে যান জনতার দিকে। উভয়কে মেলান তিনি আশ্চর্য ভঙ্গিমায়। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একমাত্র তিনিই এমন ঘোষণায় ত্যাগ করেন কলকাতাকে। করেছিলেন আরও একজন– জীবনানন্দ দাশ, কিন্তু গোপন রেখেছিলেন সে-সংবাদ। তাঁর মৃত্যুর পরেই জানা গেল বস্তুত গোটা বাংলাতেই তিনি পর্যটনরত। আর এই বাঁক এবং এই মোড় সম্পন্ন করে বিষ্ণু দে যথেষ্ট দূরে সরে যান এলিয়ট থেকেও। বিষ্ণু দে'র এলিয়টমুগ্ধতা শুধু সমালোচক সংবাদ নয়, কবির স্বীকরণও এক্ষেত্রে সহায়ক সূত্র এলিয়টের তিনি অনুবাদকও। অনেক সমালোচকই বিষ্ণু দে'র ওপর এলিয়টের প্রভাব অন্বেষণে ব্যয় করেছেন অশেষ শ্রম। গভীরভাবে দেখলে বিষ্ণু দে এবং টি এস এলিয়ট দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা এবং বিষ্ণু দে'র এলিয়টমুগ্ধতা'র হেতু অন্যত্র নিহিত।

এলিয়ট ছিলেন গোঁড়া ধার্মিক, রোমান ক্যাথলিক বাদে দৃঢ় আস্থাশীল। তাঁর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যের এপ্রিল মাস নিষ্ঠুরতম মাস কেবল গরমের জন্যে নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাইবেলীয় অনুষঙ্গও। নিজের ক্যাথলিকতা প্রকাশে এলিয়ট বেশ আগ্রহী-ই ছিলেন এমনকি তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাঁর ইহুদীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশে। কেবল একা নন মেজর ডগলাসের সঙ্গে মিলে তিনি মননশীলতার জায়গায় দাঁড়িয়েই চাবুক হাঁকান ইহুদিদের দিকে। অন্যদিকে বিষ্ণু দে গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন না বরং উল্টোটাই সত্য– ধর্মবিরোধী বলে কথিত মার্কসবাদে ছিল তাঁর আস্থা ও উৎসাহ। আবার সমকালীন মার্কসবাদীরা বিষ্ণু দে'কে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ভাবতেন তাঁর

এলিয়ট প্রীতির কারণে। এসব মার্কসবাদীর ধারণা এলিয়টের জগৎ সমাজ থেকে দূরবর্তী, তা বাস্তবকে আড়াল করে, জটিল করে– ভাবভঙ্গির নামে নৈরাজ্য সৃষ্টিই তাঁর কাজ। বিষ্ণু দে মুগ্ধ হয়েছিলেন এলিয়টের প্রতিভা, ক্ষমতা ও শক্তিতে যা দিয়ে তিনি ইংরেজি কবিতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেন আমূল। প্রচলনবিরোধী, সমকাল ও জীবনকে দেখবার সম্পূর্ণ এক নতুন কাব্যকৌশলের আবিষ্কর্তা এলিয়ট। ইংরেজি কবিতাতে বাঁক-ফেরানোর এলিয়টীয় অনুপ্রেরণাকে বিষ্ণু দে কাজে লাগান বাংলা কবিতাকে নতুন স্রোতোবর্তী করবার ক্ষেত্রে। এলিয়টের প্রেমবার্তাবাহক প্রুফককে বিষ্ণু খুঁজে পান সমকালীন পরিমণ্ডলে-একেকজন প্রুফক বিচ্ছিন্নতার আত্মদ্বীপে বন্দী। এলিয়টের কবিতার জগতের ভেতর দিয়ে নিজের সময়কে দেখেছেন বিষ্ণু দে। এটাও মনে রাখা দরকার প্রথম মহাসময়ের পরে বিশ্বের জাতসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে কমে যায় এবং অনেকক্ষেত্রেই একটি দেশের স্থানীয় বাস্তবতা এর বিশ্বের বাস্তবতার মধ্যে ফারাক থাকে কম। ফলে যুদ্ধ পরবর্তী তিরিশের মন্দা ইঙ্গ-মার্কিনীদের জন্যে যেমন তেমনি ভারতীয় বা বাঙালির জন্যেও সত্য। যুদ্ধপূর্ব-যুদ্ধকালীন-যুদ্ধোত্তর কলকাতার বিষ্ণু দে কৃত কাব্যিক চিত্রায়ন সামনে রাখলে সেটা বোঝা যাবে। তিরিশের দশকেই কবি কলকাতায় নিঃসঙ্গ-নির্জন, ভিড়ের মধ্যে একা। চল্লিশের শেষদিকে যুদ্ধের পরেকার দিনগুলোতে দেখছেন "ধ্বনিকে বণিকে গলাগলি/ সরকারি দরকারি ঢলাঢলি"। এভাবে পঞ্চাশের মাঝামাঝি এসে দেখেন "চোরাই মুখে ছেয়ে গেল" কবির শহর। 'কীটদষ্ট কূটরাষ্ট্রে বাণিজ্য ভূষারে' তিনি আঘাত করতে চান অথচ সেসবের কার্যকারিতা ফলহীন। এই অদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাব্যে প্রাণস্পন্দিত করতে চান তিনি এলিয়টের সংহতি, সংগীতময়তা এবং শক্তি দিয়ে। ফলে এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর দ্বার-উদ্ঘাটনের সঙ্গে-সঙ্গে যে-মৃতদেহটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, বিষ্ণু দে এক লাফে তাকে ডিঙ্গিয়ে যান। এলিয়টকে দেশের কথা না ভাবলেও চলে কিন্তু বিষ্ণু দে'কে ভাবতে হয়। কারণ–

"উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাইনি মাথা দেশ শাসনে,
বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভাব এ-ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই।"
(কাসান্দ্রা)

এলিয়ট হয়তোবা ব্যক্তির বিবিধ তৎপরতার ভেতর দিয়ে তাঁর সময়কে ধরবার চেষ্টা চালান, অন্যদিকে বিষ্ণু দে ব্যক্তি থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকেন সমষ্টির দিকে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির এই যৌথতা বাংলা কাব্যের জগতে বিষ্ণু'রই অবদান। আমরা কাজী নজরুল ইসলামকে হাতে রেখেই একথা বলি। নজরুলের উপনিবেশ বিরোধিতা বিদ্রোহ-সংক্ষোভের একরৈখিকতার চাইতে বিষ্ণু দে'র সংঘ-সমষ্টির জয়গান, সম্মিলিত সংগ্রামের তাৎপর্য চরিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নজরুলের নৈরাজ্য বিষ্ণুতে এসে সুস্থিত, সুপরিকল্পিত এবং কুশলী–

"আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে
সমুদ্রে ধরেছি হাল, পাহাড়ের ঘাড়
নামিয়েছি হালের মুঠিতে
সূর্যকে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকে রাতে শত শত হাতে
বসিয়েছি কতো না শহর গ্রাম আবাদায় বাঘের জঙ্গলে
আমরাই দলে দলে –"
('১৪ই আগস্টে', অন্বিষ্ট)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির প্রথম ও শেষ পংক্তির দুই 'আমরা'তে মনোনিবেশ করলে আমরা তাঁর কবিতায় আরও-আরও 'আমরা'র দেখা পাই। তখন বুঝতে পারি বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে'-কেন্দ্রিক পরিস্থিতিকে কী চমৎকারভাবেই না অনুভব করেন দেবেশ রায়,

"বাংলা কবিতার দুর্মর 'আমি'-কে ভুলতে এই 'আমরা'র সমষ্টিকে নিজের কাব্যকর্মের অঙ্গ করে নিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার বাহুমাত্রিক অর্থের এক বাস্তব উৎসে পৌঁছতে চান। কবিতায়-কবিতায়, বা একই কবিতার স্তবকে-স্তবকে 'আমি' 'তুমি'-র অর্থ বদলে-বদলে যায় এতই বেশি, যে তা থেকে বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রকৃত দুর্বোধ্যতা শুরু হয়। এ-ও তো শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির ব্যক্তিগত আর সংলগ্ন সমাজের ভেতর সম্পর্কে এক কৌতুককর দ্বৈত– যখন বিষ্ণু দে ব্যক্তির 'বিলয়' ঘটান সামাজিকের সমগ্রে তখনই তিনি প্রকরণের জটিল থেকে জটিলতরে চলে যান।"
('চৈতন্যের সহোদর ঃ 'পরিচয়' ও বিষ্ণু দে', পরিচয়, ৪৮ বর্ষ। ১০-১২ সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৯)

কিন্তু 'আমি'-ও বিষ্ণু দে'-তে উপেক্ষিত নয়। 'আমি'-কে ক্রমশ তিনি নিয়ে গেছেন নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে। আর সেই নৈর্ব্যক্তিকতা বিবিধ তৎপরতা ও প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ। কাব্যের আভিজাত্য বজায় রেখেই তিনি হৃদয়ান্তপুর থেকে চলে গেছেন মানববৈচিত্র্যের বিপুলত আঙিনায়। সমকালীন জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, আন্দোলন, সংগ্রাম, ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাকার বিচিত্র উপাদানের আশ্রয়ে গড়েছেন এক নিজস্ব স্বদেশ প্রতিমা। স্বাদেশের শক্তিকে আবিষ্কার করেছেন নিকট-সুদূরের বিদেশি চৌম্বকীয় আবেশ দিয়ে। স্বদেশের মানুষ, ঋতুবৈচিত্র্য, রাত্রি-দিন, রোদ-বৃষ্টি আনন্দ -বেদনা সবকিছুতেই বিষ্ণু দে'র মধ্যে এক জীবনবাদী সাড়া। তাঁর আত্মা মগ্নতায় নিঃশেষ না হয়ে সমষ্টির আত্মআবিষ্কারে পরিণতি পেয়েছে–

"ভাবতে অবাক লাগে, এত দেখে এত ঠেকে শিখে
কেন যে অনেকে আজও পশ্চিমার দু'তিন শতকে ভাবি
সভ্যতার আদি আর শেষ !"
(বরিস্ পাস্তেনাক-কে)

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কবি এসে পৌঁছান 'রবিকরোজ্জল নিজদেশে'। হয়ে ওঠেন তিনি বাংলা ও বাঙালির কবি।
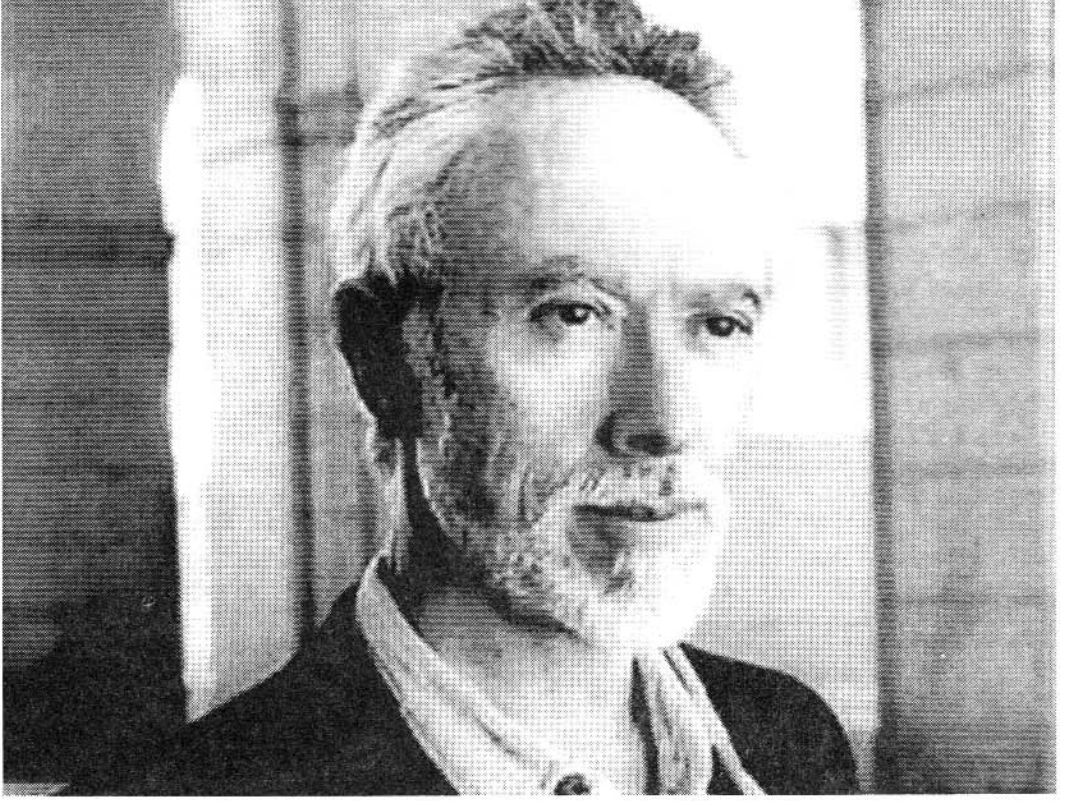
নোবেল বিজয়ী জে.এম. কোয়েৎজি ও তাঁর

যৌবনের গল্প

কবীর চৌধুরী

জে.এম. কোয়েৎজি ১৯৪০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশোনা করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয় ছিল কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব।

কোয়েৎজি নানাদিক থেকে একজন ব্যতিক্রমী শক্তিশালী সাহিত্যিক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কাহিনি নির্মাণের কৌশল, চরিত্রের মনোজগতের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, স্বল্পকথনের মধ্যে সংলাপের দ্যুতিময়তা এবং আবহ সৃষ্টির দক্ষতা কোয়েৎজির উপন্যাসাবলির প্রধান গুণ। কিন্তু তাঁর রচনায় এসবের বাইরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসাধনচর্চিত মুখোশপরা নৈতিকতাকে কোয়েৎজি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সমস্যাদির একরৈখিক 'হ্যাঁ-না' উত্তরে তাঁর আস্থা নেই। তাঁর বৌদ্ধিক সততা তাঁকে কোনো সহজ সমাধানে পৌছাতে দেয় না। তাই বলে অমানবিক স্বৈরাচারী শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো দোদুল্যমানতাকেও তিনি প্রশ্রয় দেন না।

কোয়েৎজি যেভাবে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের চিত্রিত করেন তার ভেতর দিয়ে তাঁর মানবিকতাবোধ, ঔচিত্যজ্ঞান, নিঃসঙ্গ

মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং চরম বিপর্যয়ের মুখে একা মানুষের সাহস, ধৈর্য ও টিকে থাকায় অবিনাশী শক্তির যে চিত্র তিনি আঁকেন তা তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্যতম আকর্ষণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ডাস্কল্যান্ডস' (১৯৭৪)-এই আমরা ভাগ্যবিড়ম্বিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি লেখকের মমতা ও সহানুভূতি লক্ষ করি। আমরা লক্ষ করি কত সহজে তিনি তাদের কর্মকর্তা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটি অব্যর্থ পদ্ধতি আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেন। এমন একটা সময়ে তিনি ওই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিজীবন ধ্বংসের মুখে। এই উপন্যাসে কোয়েৎজি দু'টি প্রবণতাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। একটি হলো মানুষের প্রতি তিক্ত বিদ্বেষের মনোভাব, মির্জাঁথ্রপি, অন্যটি হলো অতি আত্মম্মন্যতা, মেগালোম্যানিয়া। কোয়েৎজির পরবর্তী উপন্যাস 'ইন দি হার্ট অব দি কান্ট্রি' (১৯৭৭) এবং 'ওয়েটিং ফর দি বারবেরিয়ানস' (১৯৮০) তাঁকে ব্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। প্রথম উপন্যাসে আমরা পাই মনোবৈকল্যের চিত্র। দুশ্চিন্তা পীড়িত, অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের, অবিবাহিতা এক কন্যা তার বাবার সঙ্গে বাস করে। পরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে এক তরুণী কৃষ্ণাঙ্গ দাসীর সঙ্গে তার বাবার প্রণয়লীলা পর্যবেক্ষণ করে। সে মনে মনে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে, দু'জনকেই সে খুন করে ফেলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয়, সে নিজেই তাদের গৃহভৃত্যের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তার মধ্যেই স্বস্তি খুঁজবে। ঘটনাবলির প্রকৃত ধারাক্রম সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না, কারণ পাঠকের একমাত্র উৎস ওই কন্যার কিছু নথি, যেখানে সত্য এবং মিথ্যা, কুরুচি ও পরিশীলিত মার্জিত উচ্চারণ পাশাপাশি উপস্থিত। তার একক উচ্চারণে আমরা ইংরেজি সাহিত্যের এডওয়ার্ডিয়ান রচনাশৈলীর সঙ্গে বর্তমান আফ্রিকান পরিপার্শ্বের নিসর্গচিত্রের বিচিত্র এক মিশ্রণের ফলে এক আকর্ষণীয় ঐকতান সৃষ্ট হতে দেখি। কোয়েৎজির এই উপন্যাস দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়।

কোয়েৎজি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'ওয়েটিং ফর দি বারবেরিয়ানস' (১৯৮০)-এ উপনিবেশবাদের ঘৃণ্য ঐতিহ্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। কেউ কেউ এই রচনাকে রাজনৈতিক থ্রিলার বলে অভিহিত করেছেন। সমালোচকরা এর মধ্যে জোসেফ কনরাডের দৃষ্টিকোণ ও রচনাশৈলী লক্ষ করেছেন।

কোয়েৎজির পরবর্তী উপন্যাস 'দি লাইফ এ্যান্ড টাইমস অব মাইকেল কে' (১৯৮৩) বুকার পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। এর পটভূমি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা। এ উপন্যাসের হিরো, আসলে এ্যান্টিহিরো এক অসাধারণ চরিত্র। তার বৃদ্ধ মা পায়ের ব্যথা ও অসুস্থতার জন্য হাঁটতে পারেন না। মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা কেপ টাউন ছেড়ে তিনি তাঁর আদি গ্রামাঞ্চল তাঁর পূর্বপুরুষদের ভূমিতে চলে যাবেন, সেখানেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাবেন। মাইকেল কে মায়ের জন্য নিজের হাতে একটা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে নেয়। ওই গাড়িতে তুলে সে মাকে ঠেলে নিয়ে যায়। ওই ম্যারাথন ভ্রমণপথে নানা ঘটনা ঘটে। ঘটনা নয়, আসলে নানা অঘটন এবং এক পর্যায়ে মাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মাইকেল কে'র মা দারিদ্র্যপীড়িত ও অসুস্থ হলেও, বিত্তশালী পরিবারে দাসীর চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করলেও, তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং একটা বিরল মর্যাদাবোধ। মাইকেল কে-র মধ্যেও আমরা তা লক্ষ করি। তা ছাড়াও মাইকেলের মধ্যে ছিল বিস্ময়কর রকম উদ্ভাবনী কল্পনা ও তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা। সে অবিনাশী এক ধরনের রোমান্টিকতাও লক্ষ করি, যা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় গৃহযুদ্ধের সময় স্বৈরাচারবিরোধী বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর কতিপয় পাহাড়ি সদস্যের প্রতি তাঁর সপ্রশংস ও সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

মাইকেল কে তাঁর মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। মৃত্যুর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার মায়ের মৃতদেহ চুল্লিতে দাহ করে। মাইকেল কে একটি পাত্রে সংরক্ষিত তার মায়ের ভস্ম নিয়ে মায়ের জন্মস্থানে উপস্থিত হয় এবং সেখানকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ওই ভস্ম ছড়িয়ে দেয়। এই উপন্যাসে আরও নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা আছে, তবে এ উপন্যাসকে স্মরণীয় করে রাখে ঘটনা নয়, মাইকেল কে'র জীবনদর্শন এবং তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি। এটা সবসময় উপস্থাপিত হয়েছে নিচু লয়ে, কখনো উচ্চ কণ্ঠে নয়, কখনো গালভরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বা ভঙ্গিতে নয়। 'মাইকেল কে'র জীবন ও কাল' একটি অসামান্য জীবনবাদী উপন্যাস। পাঠককে এটা পরিশুদ্ধ করে তোলে। বাংলা অনুবাদে আমরা উপন্যাসটির নামকরণ করেছি "অবিস্মরণীয় মাইকেল কে।"

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের 'ফো' বা শত্রু উপন্যাসটি। এবার কোয়েৎজি একদিকে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের ভিন্নতা ও অমিল, অন্যদিকে সাহিত্য ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই দু'টি মৌল বিষয়কে উপজীব্য করে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। এর কাহিনী বর্ণনা করেন এক মহিলা। তিনি হয়ে উঠতে চান কাহিনির মুখ্য চরিত্র কিন্তু নিতান্ত একটি গৌণ চরিত্রের বেশি কিছু তিনি হয়ে উঠতে পারেন না। 'শত্রু' উপন্যাসটিকে ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিসন ক্রুসো'র একটি ভিন্নধর্মী বিচিত্র রূপায়ণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও কোয়েৎজির আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'বাল্যকাল' (১৯৯৭) একটি আকর্ষণীয় রচনা। তিনি চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধও রচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো : 'গিভিং অফেন্স : এসেজ অন সেন্সরশিপ' (১৯৯৬) এবং ' দি লাইভস অব এ্যানিলস' (১৯৯৯)। এই সময়ে রচিত তাঁর আরেকটি

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলো 'ডিসগ্রেস' (১৯৯৯)। এ উপন্যাসের জন্য তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বুকার পুরস্কার লাভ করেন।

'ডিসগ্রেস'-এর পটভূমি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের অবসানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতি। ওই পরিস্থিতিতে একজন খ্যাতিচ্যুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁর নিজের ও তাঁর কন্যার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেন তাই এ উপন্যাসের উপজীব্য। কোয়েৎজির সব রচনাতেই একটি মুখ্য প্রশ্ন উচ্চারিত হতে শোনা যায়। এখানেও আমরা তা শুনি। সে প্রশ্ন হলো: ইতিহাসকে কি কখনো পাশ কাটিয়ে চলা যায়? ইতিহাসকে কি কখনো এড়ানো সম্ভব?

কোয়েৎজির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দস্তয়েভস্কির জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত 'দি মাস্টার অব পিটার্সবুর্গ' নামের একটি কৌতূহলোদ্দীপক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপন্যাস।

এই লেখকের রচনাবলির বৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। তাঁর কোনো দু'টি গ্রন্থই একরকম নয়। তাঁর সার্বিক সাহিত্যকর্মের অনন্যসাধারণ গুণাবলির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার এই শক্তিমান লেখক জে. এম. কোয়েৎজিকে ২০০৩ সালে 'সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার'–এ ভূষিত করা হয়। নিঃসন্দেহে যোগ্যপ্রাপ্তি। ২০০৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত দক্ষিণ আফ্রিকার এই লেখক সম্পর্কে দেশের আরেকজন নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক নাদিম গর্ডিমার বলেছেন : "জে.এম. কোয়েৎজির অন্তর্দৃষ্টি অস্তিত্বের স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে হানা দেয়। তিনি সেখানে যা আবিষ্কার করেন বেশির ভাগ মানুষ নিজেদের সম্পর্কে তা জানতেই পারে না এবং তিনি তাঁর ওই আবিষ্কারকে অসামান্য শিল্পীর পারঙ্গমতা নিয়ে টানটান উত্তেজনা ও শোভন সৌকর্য সহকারে পরিবেশন করেন।"

আমি ইতঃপূর্বে কোয়েৎজির 'ওয়েটিং ফর দি বারবেরিয়ানস' এবং 'দি লাইফ এ্যান্ড টাইমস অব মাইকেল কে' বাংলায় অনুবাদ করেছি। দুটি অনুবাদই প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। এখন আমি অনুবাদ করলাম লেখকের 'ইয়ুথ' উপন্যাসটি, 'যৌবনের গল্প' নাম দিয়ে। কোয়েৎজির এ-উপন্যাস তাঁর অন্য দুটি গ্রন্থের চাইতে ভিন্ন ধারার, ভিন্ন প্রকৃতির।

'যৌবনের গল্প' নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ এবং নানা পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বর্ণনার ঐশ্বর্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। গল্পের কথক দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৫০-এর দশকের এক শ্বেতাঙ্গ যুবক। ছাত্র তখনো। 'যৌবনের গল্প' তার গল্প। স্বদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃসহ পরিবেশ দেখে সে দীর্ঘদিন ধরে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার অধীত বিষয় ছিল অঙ্ক এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান। সে কবিতা পড়ে, টাকা জমায়, স্থির করে যে সঠিক স্থানে গিয়ে যখন উপস্থিত হবে তখন সে জীবনকে তার সকল রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তৈরি থাকবে। আর তখন সে ওই জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিল্পে রূপান্তরিত করবে।

অবশেষে ১৯৬০-এর দশকে সে লন্ডনে এসে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে তার স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে না। তার মনে কবিতা জেগে ওঠে না, তার জীবনে রোমান্সের দেখা মেলে না, সুখ ও বিত্ত তার অধরা থেকে যায়। তার একঘেঁয়ে নিরানন্দ জীবন কাটে কম্পিউটার-প্রোগ্রামার হিসেবে। মাঝে মাঝে যে আবেগবর্জিত সাময়িক যৌন মিলনের স্বাদ সে লাভ করে তা তাকে আনন্দ দেয় না। কারও সঙ্গে সে সহজ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না।

এ উপন্যাস কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বা চরিত্র বর্জিত নয়। এখানে ১৯৬০-এর দশকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ব্রিটেনে পারমাণবিক গবেষণার কথা আছে। এ উপন্যাসে আমাদের নায়কের মতো আরেকজন কম্পিউটার কর্মীর কথা আছে। গণপতি নামের এক ভারতীয়। প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও সেও হতাশাক্রান্ত, জীবনের কাছে পরাজিত এক ক্লান্ত পথিক। অধিকন্তু সে ব্যাধিগ্রস্ত।

'যৌবনের গল্প'-এর নায়ক, কাহিনির কথক, নানা দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী যুবক। তার পড়াশোনার পরিধি ব্যাপক। আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্ক ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সে টি.এস.এলিয়ট, ডি.এইচ.লরেন্স, কনরাড, কাফকা, রিলকে, হোল্ডারলীন, র‍্যাবো প্রমুখের রচনা পড়েছে। প্রাচ্যের কিছু সেরা চলচ্চিত্র ও সংগীত তাকে মুগ্ধ করেছে, যেমন, সত্যজিৎ রায়ের অপুকে নিয়ে নির্মিত তিন পর্বের চলচ্চিত্র এবং ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের সেতার বাদন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যুবকের পড়াশোনা, বুদ্ধিমত্তা, কল্পনার সম্ভার, সাংস্কৃতিক রুচিবোধ, সবকিছু চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার সামনে মুখ ব্যাদন করে থাকে শুধু অনিবার্য মৃত্যু। আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কয়েকটি চরণ:

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে পথের শেষে।

... ...

আজ ভাবি মনে মরীচিকা অন্বেষণে হায়
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই মনে ভয় জাগে সেই
হালভাঙ্গা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে॥

কোয়েৎজির মতো বড়ো মাপের একজন লেখকের পক্ষেই সম্ভব যৌবনের নষ্ট আশার মধ্যে এইরকম স্বচ্ছতা, সাবলীলতা ও স্থৈর্যের সমাহার ঘটানো। 'যৌবনের গল্প' নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য সাহিত্যকর্ম।

আমার এই লেখার শেষ পর্বে এসে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য দিই। 'যৌবনের গল্প'-এ আমরা ঔদাসীন্যের ছবি দেখি। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং ভিন্ন সময়ে আমরা লন্ডনের এই ঔদাসীন্যের চিত্র পাই সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি উপন্যাসে। একটি হল আমান্ডা ক্রেইগ-এর 'হার্টস এ্যান্ড মাইন্ডস', আরেকটি হল মণিকা আলীর 'ইন দি কিচেন।'

ধা রা বা হি ক
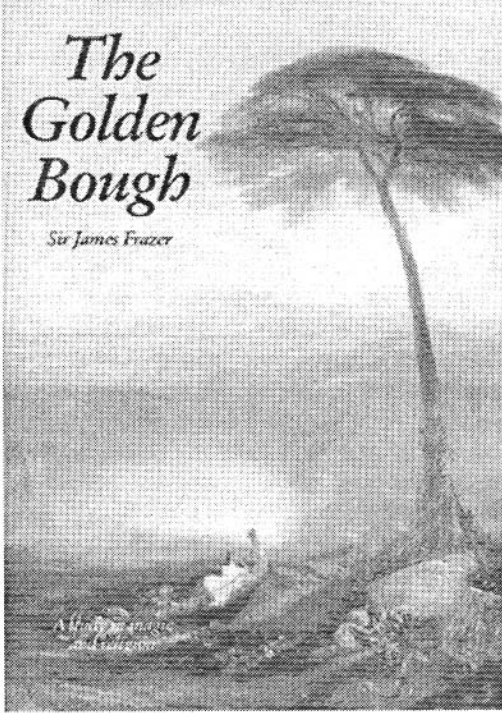
গোল্ডেন বাউ

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার

অনুবাদ : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

ডায়নার পুরোহিত অরণ্যরাজ ও ভার্জিলের স্বর্ণশাখা

সন্তরাজা

আমরা এখন মূলত দুটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। এক, নেমিতে ডায়নার পুরোহিত অরণ্যরাজকে কেন তার পূর্বসূরী হত্যা করতে হতো ? দুই, এই কাজটি করার আগে তাকে কেন একটি বিশেষ গাছের ডাল ভাঙতে হতো– যে গাছটিকে আগেকার দিনের মানুষ ভার্জিলের গোল্ডেন বাউ বা স্বর্ণশাখারই নামান্তর বলে মনে করত?

আমাদের আলোচনার প্রথম বিষয়টি ছিল পুরোহিতের উপাধি। পুরোহিতকে অরণ্যরাজ নামে কেন ডাকা হতো ? আর কেনই বা তার উপবনকে বলা হতো রাজ্য? প্রাচীন ইতালি আর গ্রিসে পুরোহিত আর রাজার উপাধি ছিল সমার্থক। রোম এবং ল্যাটিন অঞ্চলের অন্যান্য শহরে এক ধরনের পুরোহিত ছিল যাদের বলা হতো বলির রাজা বা পূতাচারের রাজা। এই পুরোহিতের স্ত্রীর উপাধিও ছিল পূতাচারের রাণী। আবার এথেন্স প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বার্ষিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপাধিও কিন্তু ছিল রাজা। আর স্ত্রীকেও সম্বোধন করা হতো রাণী বলে। দু'জনের কাজই ছিল ধর্মীয়। গ্রিসের অন্য অনেক নগররাজ্যে একজন করে নামকাওয়াস্তে রাজা থাকত। যতদূর জানি এদের দায়িত্বও ছিল পুরুত ঠাকুরের এবং

সে দায়িত্ব রাজ্যের সর্বজনীন মণ্ডপেই সীমাবদ্ধ থাকত। কোনো কোনো নগররাজ্যে আবার এ ধরনের একাধিক রাজা একই সময় ওই পদে আসীন থাকত। রাজতন্ত্রের অবসানের পর রোমে এমন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে যে, তখন থেকে পশুবলি সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করা হতো একজন বলির রাজা। এই কাজটি আগে রাজারাই করত। গ্রিসেও পুরুত-রাজার উৎস সম্পর্কিত ধারণা ছিল একই রকম। এমনিতে এই ধারণা কিন্তু অসম্ভব নয় মোটেই, কেননা স্পার্টার দৃষ্টান্তে এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। অথচ এই স্পার্টাই সম্ভবত একমাত্র খাঁটি গ্রিক রাষ্ট্র যেখানে ঐতিহাসিক যুগেও রাজকীয় সরকার বহাল ছিল। স্পার্টার রাষ্ট্রীয় সব বলিদানের অনুষ্ঠান দেবতার বংশধর হিসেবে রাজারাই পরিচালনা করত। স্পার্টার দু'জন রাজার একজন জিউস ল্যাসেদেমনের এবং অন্যজন স্বর্গীয় জিউসের পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করত।

রাজার কর্তৃত্বের সঙ্গে পুরোহিতের দায়িত্বের এই যোগাযোগের কথা জানত সবাই। যেমন, এশিয়া মাইনর তো ছিলই বিভিন্ন প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজধানী। এখানে বাস করত হাজার হাজার পুণ্যাত্মা ক্রীতদাস। শাসন কাজ চালাত ক্ষমতাধর পুরোহিতেরা। মধ্যযুগের রোমের পোপের মতো এরা একাধারে কায়িক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ফলাত। এমন পুরুত-অধ্যুষিত দু'টি নগর হলো জেলা এবং পেসিনাস। সে কালের পৌত্তলিক যুগে টিউটন রাজারা এমন ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলেই মনে হয়। চীনের সম্রাটরাও রাষ্ট্রীয় বলিদানের অনুষ্ঠান পরিচালনা করত নিজেরাই। ওদের ধর্মীয় গ্রন্থে এই অনুষ্ঠান পরিচালনার বিস্তারিত নিয়মকানুন লেখা থাকত। মাদাগাস্কারের রাজা ছিল সে অঞ্চলের প্রধান পুরোহিত। নববর্ষের মহান উৎসবের সময় যখন দেশের মঙ্গলের জন্য ষাঁড় বলি হতো তখন রাজা বলির উপর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা পরিচালনা করত, নানা রকমের শোকরগোজারি করত। ওদিকে রাজার সাঙ্গপাঙ্গরা তখন গরুটাকে বধ করত। পূর্ব-আফ্রিকার গ্যালাদের রাজতান্ত্রিক দেশগুলো এখনো স্বাধীন রয়েছে। তো এইসব দেশে রাজা পর্বতশীর্ষে উঠে বলিদান করে আর মানুষ বলির নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করে। ঐতিহ্যের ধূসর আলোয় দেখতে পাই, মধ্য আমেরিকাতেও কায়িক ও আধ্যাত্মিক রাজা এবং পুরোহিতের মিলনের এমন ধারা চালু ছিল। এই অঞ্চলের রাজারা এই দুই ভূমিকাই পালন করত। ওদের রাজধানী আজ চাপা পড়ে গেছে বিষুবীয় অরণ্যের নিচে। কিন্তু ওদের বিভিন্ন শহরে আজও দেখা যায় মেক্সিকোর প্যালেক্সিদের চমকদার এবং রহস্যময় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।

পুরাকালের রাজারা সাধারণত পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করত– এ কথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, তাদের আর কোনো ধর্মীয় কাজ ছিল না। তখনকার দিনে রাজার চারপাশ ঘিরে থাকত স্বর্গীয় আবহ। এ তো শুধু কথার কথা নয়, একেবারে বাস্তব সত্য এবং লোকে রীতিমতো বিশ্বাসও করত তা। বহু ক্ষেত্রে রাজাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা হতো কেবল পুরোহিত হিসেবেই নয়– অর্থাৎ মানুষ এবং দেবতার মাঝে মাধ্যম হিসেবেই নয়, একেবারে খোদ দেবতা হিসেবেও। এমন দেবতা যে প্রজাপাটের উপর, কি পূজারিদের উপর সে রকম আশীর্বাদই আনতে পারত যা সাধারণভাবে মনে করা হতো যে মরণশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এই সব আশীর্বাদ কেবল অতিমানবিক এবং অদৃশ্য কারো কাছে প্রার্থনা ও পশুবলির মাধ্যমেই চাওয়া যায়। এইভাবে প্রায়শই মনে করা হতো যে, রাজারা যথাসময়ে বৃষ্টি নামাতে, রোদ উঠাতে, শস্য ফলাতে পারে। এখন এরকম ধারণা আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের চিন্তাভাবনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে এমন ভাবনা দারূণ ব্যাপার ছিল বৈ কি। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিকে সাধারণভাবে যে পার্থক্য করা হয় তা অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর মানুষ যেমন ধারণ করতে পারে, একজন আদিম মানুষ তেমন পারত না বললেই চলে। তার কাছে তো বিশ্ব বিপুলাংশে পরিচালিত হতো অতিপ্রাকৃতিক সব শক্তিদ্বারা অর্থাৎ এমন শক্তি যা তার মতোই প্রবৃত্তির বশে কাজ করে এবং যা তার মতো প্রার্থনার চাপে মানুষের সুখ-দুঃখ, ভয়ভীতিতে সাড়া দেয়। বিশ্বসৃষ্টিকে এভাবে মনে স্থান দিয়ে সে মনে করতে থাকে যে, প্রকৃতির ধারাকে নিজের সুবিধাজনক কাজে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বোধ হয় তার অপরিসীম। প্রার্থনা করা, মানত করা, কি ভয়ভীতি দেখানোর ফলে হয়ত ভালো আবহাওয়া পাওয়া যাবে এবং দেবতাদের জন্যে পর্যাপ্ত গমও জুটবে। আর মাঝে মাঝে সে এমন বিশ্বাসও করত যে, যদি ঘটনাক্রমে এক দেবতা তার উপর ভর করে তাহলে তাকে আর কোনো উচ্চতর শক্তির কাছে আপিল করতে হয় না। সে তো আদিমানব, সে নিজের এবং সঙ্গীসাথির মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি নিজের ভেতরেই ধারণ করতে পারে।

এই একভাবে নরেশ্বরের ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু না, আরেকটি উপায় আছে। পৃথিবীটা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে ভরা– এমন বিশ্বাস তো আদিম মানুষের ছিলই, কিন্তু এছাড়াও ভিন্ন এবং সম্ভবত আরও আগেকার একটা বিশ্বাসও তার ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রকৃতি ঘটে যাওয়া অবধারিত ঘটনাপুঞ্জের একটি সমষ্টি– এই আধুনিক মতবাদের বীজও কিন্তু আদিম মানুষের বিশ্বাসে পাওয়া যায়। এই যে বীজের কথা বললাম– এর সাক্ষাত মেলে তখনকার, যাকে বলে, সমমর্মিতার জাদু বিশ্বাসে। অধিকাংশ কুসংস্কারে এই বিশ্বাস এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আদিম সমাজে রাজা একাধারে জাদুকর এবং পুরোহিত। বাস্তবিকই, রাজা ক্ষমতায় বসতো প্রধানত এই কালো বা সাদা জাদুকৌশলের বলেই। এজন্যে রাজার রাজাগিরির বিবর্তন এবং সাধারণ বুনো বা আদিম গোত্রের চোখে তার পবিত্র চরিত্র বুঝতে হলে জাদুর নীতিমালা সম্পর্কে কিছু জানাটা খুবই দরকার। সেই সঙ্গে দরকার পুরোনো কুসংস্কার পদ্ধতি যে মানুষের মনে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল সবযুগে, সব দেশে– সে সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা। এজন্যে তাহলে আসুন এবার জাদুর তাত্ত্বিক বিষয়টা একটু নেড়েচেড়ে দেখি।
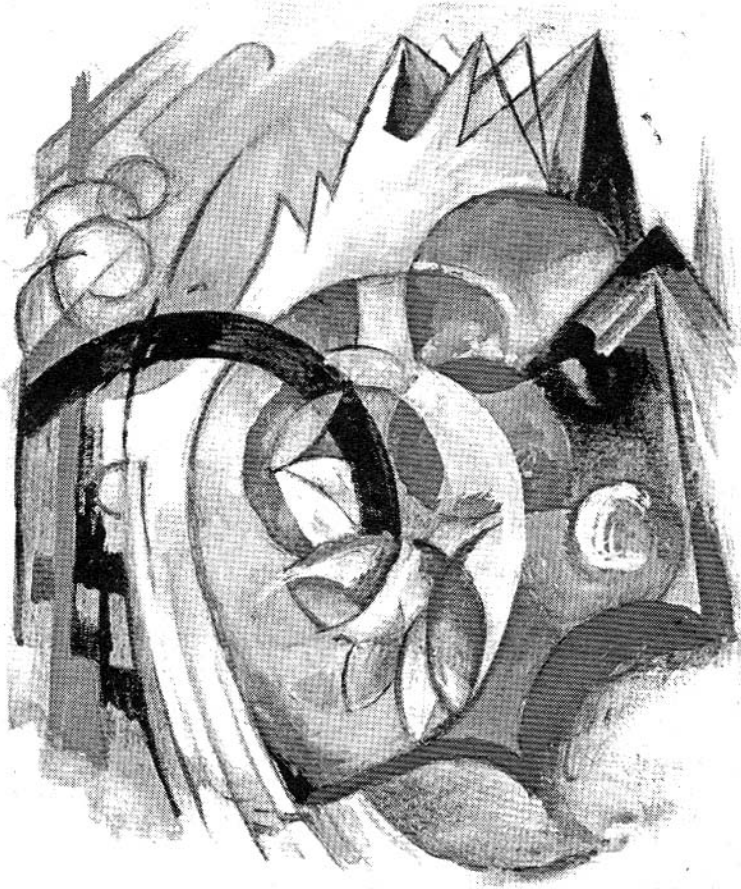
অরুণোদয় থেকে অস্তাচলের পথে

আলী যাকের

পর্ব - ২

কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে এসে কয়েকদিন মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে যেত যেন। মায়ের আশে পাশে ঘুর-ঘুর করতাম। এই সময় দিদি, আমাদের সবার বড়োবোন, আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। দিদি মা'র কাছ থেকে খুব মজার-মজার রান্না শিখেছিলেন। সেইসব খাবার হৈ-হৈ করে রান্না করা হতো। আমরা ভাইবোনেরা সবাই একসাথে বসে মহা-আনন্দে খেতাম। কিন্তু কেবল খাদ্যেতো হৃদয় ভরে না। মন চলে যেত উড়ে উড়ে কলকাতা শহরে। তবে কিছুদিনের মধ্যে আবার সব গা সওয়া হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, আবার কুষ্টিয়াকে ভালো লাগতে শুরু

করে। কেবল ভালো নয়। আবার বনে বাদাড়ে, গড়াইয়ের ধারে বুনো উন্মাদনা আমাকে মাতাল করে। কেবল দুপুর বেলায় যখন ঢাকা মেইল নামের লাল ট্রেনটা তীব্র হুইসেল বাজিয়ে কুষ্টিয়া স্টেশন থেকে ভুস্-ভুস্ করতে করতে কলকাতার পথে রওয়ানা হতো তখন যেখানেই থাকি না কেন দৌড়ে রেল লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম কাশবনের মাঝে। সামনে একেবারে কাছেই রেল লাইন দিয়ে বিশাল আওয়াজ করে ট্রেনটা চলে যেত। চোখদুটো কী চিক্-চিক্ করে উঠত তখন ? কে জানে ? আমার সাথে এই সময় আমার ছোট বোন ঝুনু সঙ্গী হতো। পরে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীতে অপু-দুর্গার কাশফুলের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখার দৃশ্যটি যখন দেখেছি তখন আমার মনশ্চক্ষে কুষ্টিয়ায় আমাদের ঢাকা মেইল দেখার দৃশ্য ভেসে উঠেছে।

একটু আগে আমার দিদির কথা বলছিলাম। আমাদের জীবনে দিদির অবস্থান ছিল এক অনিবার্য আনন্দের ফল্গু ধারার মতো। মিতবাক দিদি যেন আমাদের চোখের দিকে তাকিয়েই আমাদের মনের কথা জানতে পারতেন। কত যে আনন্দঘন সময় কেটেছে দিদির সান্নিধ্যে। এ বিষয়ে আসব পরে। কুষ্টিয়ায় মিল পাড়া বলে একটি জায়গা আছে যেখানে মোহিনী মিল নামে একটি সুবৃহৎ কাপড়ের কল ছিল। ছিল বলছি এই কারণে যে দু'বছর আগে যখন কলটি দেখেছিলাম তখন আমার বাল্যকালে দেখা মোহিনী মিল-এর কংকাল দেখতে পেয়েছি মাত্র। মনে হয়েছে বিধ্বস্ত একটি শিল্পনগরী পড়ে আছে। জীবন্ত মিলটির আর কোনো চিহ্নই নেই । সেই পাকিস্তানি আমলের গোড়ার দিকে আমাদের নব্য স্বাধীন পাকিস্তানিরা মোহিনী মিল্স-এর কর্ণধার মোহিনীমোহন বাবুকে বড্ড জ্বালাতন করেছে। অবশেষে তিনি কলকাতায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে গিয়ে শুনতে পাই, তার ব্যবসা বিস্তার লাভ করেছে। মোহিনী বাবুর এক ছেলে সুধীর চক্রবর্তী একসময় খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন। এমনকি পূর্ব-পাকিস্তান দলের হয়েও খেলেছিলেন। তবে ততদিনে আমরা ঢাকায় চলে এসেছি। মোহিনী মিলে পূজার সময় খুব ধুমধাম হতো মনে আছে। সেই ষষ্ঠি থেকে শুরু করে বিজয়া পর্যন্ত। সেসময় কুষ্টিয়ার হিন্দু মুসলমানরা এক হয়ে যেত। ঈদেও হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশেই ঈদ করত সবাই। মোহিনী মিলের পূজায় একটা বড় আকর্ষণ ছিল ওদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সে সময় কোনো এক সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে সব বড় বড় শিল্পী কুষ্টিয়ায় আসতেন। সেইখানে একেবারে সামনে থেকে বসে গান শুনেছি হেমন্ত, সন্ধ্যা, মানবেন্দ্র, আল্পনা , শ্যামল মিত্র , সতীনাথ এই তাবড় তাবড় শিল্পীদের।

আমরা কুষ্টিয়ায় থাকার সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে আমাদের প্রাণপ্রিয় গড়াই নদীকে নিয়ে। আমার ভাইয়ার সাথে গড়াই নদীর সখ্যের কথা আগেই লিখেছি। ভাইয়া প্রায় প্রত্যেকটি ছুটির দিনে গড়াই নদীতে চলে যেতেন এবং ঘন্টা, দু'ঘন্টা সেই নদীর সাথে কাটিয়ে বাড়িতে ফিরতেন। বাবা কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। সব খবর রাখতেন না। মা ভাবতেন, আহা ছেলেটা পানি ভালোবাসে, থাক না একটু নদীর কাছে। এইভাবে বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ কোনো বর্ষাকালের এক রবিবারে আমরা সবাই বাড়িতে, খবর এলো ভাইয়াকে দেখা গেছে গড়াইতে ভাস্তে ভাস্তে চলেছেন ভাটির দিকে। শেষ দেখা গেছে গড়াই নদীর ওপর যে রেলের ব্রিজ আছে তার নিচ দিয়ে ভেসে চলেছেন। মনে হচ্ছে তার দেহে প্রাণ নেই। গড়াই নদীর ব্রিজ আমাদের বাড়ি থেকে কম করে হলেও পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে। তার প্রিয় গড়াই তাকে নিয়েছে। এই কথা শোনা মাত্র দিদি, মা, ঝুনু, আমি আমরা সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলাম। বাবা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমাদের বাড়িতে একটি মস্তবড়ো কালো ফোন ছিল। সেই ফোনে বাবা এস.পি সাহেবকে বললেন। ঐ সময়ের মফস্বল শহরে যত শীঘ্র সম্ভব পুলিশ বাহিনী তার কাজে লেগে গেল। ইতোমধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে একটা ভিড় লেগে গেল। সবার চোখেমুখে প্রবল উৎকণ্ঠা। অনেকের চোখে পানি। বাবা স্থানুর মত বসে আছেন একটা চেয়ারে। চোখ অর্ধনির্মিলিত। আর বাড়ির ভেতরে আহাজারি তো চলছেই। এমন সময় শোনা গেল গুঞ্জন। ভাইয়াকে পাওয়া গেছে। বস্তুতপক্ষে তাঁকে হেঁটে আসতে দেখা গেছে শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গদ গদ চিত্তে বাবার কাছে এসে বললেন, 'স্যার ছোট সাহেবকে পাওয়া গেছে। তাঁর কিছু হয় নি। তিনি পায়ে হেঁটেই বাসায় আসছেন। তাঁকে এত করে বললাম, তিনি কিছুতেই আমাদের জীপে উঠলেন না।' বাবা নিজেকে সংযত করলেন, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালে ঝোলানো তাঁর চামড়া মোড়ানো ব্যাটন্টা তুলে নিলেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তখন কান্না ভুলে গেছি। মা-দিদি আর ঝুনু তখনও কেঁদেই চলেছে। বাবাকে দেখে আমার মনে হয়েছে একটা বড় দুর্যোগ সমাসন্ন। ভাইয়াকে সাবধান করে দেয়ার জন্য রাস্তার দিকে দিয়েছি দৌড়। পথের মধ্যেই তাকে বলতে হবে সমূহ বিপদের কথা। বাবার হাতে লাঠি সহজে ওঠে না। আর উঠলে যার উদ্দেশ্যে তা ওঠে তার পিঠে প্রায় স্থায়ী দাগ হয়ে যায়। কোনোমতে আমাদের বাড়ির সদর ফটকের কাছাকাছি তাকে ধরলাম। ভাইয়া দিব্যি ভেজা হাফপ্যান্ট পরা , কোমড়ে বাঁধা গামছাটা এখন কাঁধের ওপর, পেয়ারা চিবাতে চিবাতে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে উত্তেজিতভাবে বললাম, 'ভাইয়া তুমি বাড়িতে ঢুকো না, বাবা তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবে।' ভাইয়া নির্বিকার । হাতে একটা এক্সট্রা পেয়ারা ছিল। হাসতে,হাসতে আমার দিকে পেয়ারাটা ছুড়ে দিয়ে বললেন,'নে, খা'। তারপর সামনের দিকে বীর দর্পে এগিয়ে গেলেন। তখন তার চারপাশে তাকে ঘিরে ছিল তার ভক্তরা। আমি ভয়ে হিম হয়ে গেলাম। ভাইয়ার পেছনে পেছনে বাড়ির আঙিনায় ঢুকলাম। তখন আমাদের আঙিনার ভেতরে লোকে লোকারণ্য। শুধু বাড়ির ভেতর থেকে তখনও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাবাকে দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে আসতে। ভাইয়া বাবাকে

দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। বাবা ব্যাটন হাতে ভাইয়ার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভিড়ের গুঞ্জন থেমে গেছে। বাড়ির ভেতর কান্নাও স্তব্ধ। ওপরে তাকিয়ে দেখি মা, দিদি, ঝুনু বারান্দার রেলিং-এর ওপার থেকে আকুতিভরা চোখে তাকিয়ে আছেন নিচের দিকে। বাবা ব্যাটন হাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন ভাইয়ার কাছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ ব্যাটন ফেলে দিয়ে ভাইয়াকে বুকে টেনে নিয়ে অনুচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন। চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা ঝরতে লাগলো অঝোরে। ভাইয়াও তখন কাঁদছে। পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করে দু'জনেই হাপুস নয়নে কাঁদছে, এই দৃশ্য সবাইকে স্পৃষ্ট করল। সকলের চোখ ভিজে এল। আমি কিছু না বুঝেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। এখন আমারও পুত্র, কন্যা আছে। উভয়ে আজ পূর্ণবয়স্ক। আমি বুঝতে পারি পিতা এবং সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা এবং পারস্পরিক বোধের চরিত্রটি কেমন হতে পারে।

কুষ্টিয়ায় থাকতে আরও দুটি ঘটনা ঘটে। একটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তেমন ছোঁয় নি সেই বয়সে। এটি ছিল ভাষা আন্দোলন। যেদিন গুলি চলল সেদিন বাবা অফিস থেকে দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে আসলেন না। মাকে সেই বড়ো কালো ফোনে কি যেন বললেন, মা একটা টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার পিওন সিরাজ ভাইয়ের কাছে শুনলাম যে ঢাকায় বাংলাভাষা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে। গুলি চলেছে। অনেক ছাত্র মারা গেছে। তারপর সিরাজ ভাই আমাকে সাবধান করে দিলেন একথা যেন বাবাকে না বলি। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার বাবা মুসলিম লীগকে সমর্থন করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পাকিস্তান না হলে এই উপমহাদেশের সকল মুসলমানের জন্য চরম বিপদ। বলাই বাহুল্য যে আমাদের সংসারে বাবা যা বলতেন সেটাকেই সবার সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হতো। অতএব আমরা সবাই বিষয়টা নিয়ে চুপচাপ ছিলাম। পরের দিন সকালে দেখলাম আমাদের পেছনের বারান্দায় বসে বাবা, মা চা খাচ্ছেন। কেন যেন ইচ্ছে হলো শুনি তাঁরা কি নিয়ে কথা বলছেন। এরকম কৌতূহল আমার মধ্যে কখনও ছিল না, সেই প্রথম। পেছনে বসবার ঘর। সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনলাম বাবা ঢাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্বন্ধে বলছেন। ততক্ষণে তাঁর বলা শেষ হয়েছে। মা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর অস্ফুটে বললেন,'এত মায়ের বুক খালি করে ছেলেগুলোকে একেবারে মেরে ফেলার কি দরকার ছিল'? বাবা বললেন,'যা হবার তা হয়েছে, বাবলু যেন আগামী দুই একদিন স্কুলে না যায়'। বাবলু আমার বড় ভাইয়ের নাম। তখন ভাইয়া বোধহয় ক্লাস টেন-এ পড়েন। তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। সেইসব বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরবর্তীকালে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কালের আবর্তে দূরে ছিটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, এখন প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ, যাঁর সঙ্গে আমার এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই দেখা হয়। আমার বাবারা ছিলেন সত্যিকারের পাকিস্তানি প্রজন্ম। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্কে প্রায় পীরের মতো জ্ঞান করতেন। ভাবতেন, তিনি ঈশ্বর প্রেরিত কোনো বিশেষ মানুষ। খুবই বুজুর্গ মুসলমান। যদিও জিন্নাহ্ সাহেব সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করলেই জানা যায় যে তিনি খুবই প্রতীচ্য স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ইসলামি তরিকার জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। যদিও সরকারি আমলা হিসেবে রাজনীতি থেকে দূরত্বে থাকতে হতো বাবাকে, তবুও মুসলিম লীগের এবং জিন্নাহ্ সাহেবের ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। এহেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে জিন্নাহ্ এবং মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্য থাকলেও বাবা বোধহয় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্র দ্বিজাতি তত্ত্বে তেমন কট্টর বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহলে তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু , সত্যিকার বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সেইরকম দুই প্রাণের সখা হিন্দু হতে পারতো না। এঁরা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন রায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা। বাবার সাথে এঁদের বন্ধুত্ব সেই বাবা যখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন তখন থেকে। তবে বাংলা ভাগের পর তাঁরা কলকাতাবাসী হলেও বাবার সাথে নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলতো। আমরা এবং মা কলকাতায় গেলে তাঁদের বাসায় যাওয়া-আসা ছিল অনিবার্য। ধীরেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, যাকে আমরা ধীরু কাকা ডাকতাম। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কাকা। বাবার সঙ্গে তাঁর কাকার এই সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি সাহিত্যের সাবসিডিয়ারি ক্লাসের পর তিনি আমাকে একান্তে ডেকে আমাদের পরিবারের নানা খবরাখবর নিতেন। এ ছাড়া দিদিরও অনেক হিন্দু বন্ধু ছিলেন। আমরা কলকাতায় বেড়াতে গেলে তাঁদের বাড়িতে যেতেই হতো। এঁদের মধ্যে দিদির সবচেয়ে প্রিয় যে বন্ধু ছিলেন তাঁকে আমরা ডাকতাম বিজুদি বলে। বিজুদি আমৃত্যু তাঁর স্নেহে নিমজ্জিত করে রেখেছেন আমাদের। কলকাতায় গেলেই বিজুদির ওখানে যাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল। দিদির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব দিদির বাল্যকাল থেকে। তখন বাবা চাঁদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমার তখনও জন্ম হয় নি। ফিরে আসি কুষ্টিয়ায়।

আমার জীবনে যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটির অভিঘাত আমাকে সেই বয়সে সবচেয়ে আন্দোলিত করে তাহলো আমার দিদির বিয়ে। এর আগে আমাদের পরিবারে একবারই বিয়ে নামক অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল । আমার এক মামার বিয়েতে মায়ের সাথে আমরা সব ভাইবোন ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে মহা হৈ চৈ হয়েছিল মনে আছে। তবে মফস্বল থেকে গিয়ে সেই হৈ চৈ আমার তেমন ভালো লাগে নি। আমি ছিলাম মফস্বল শহরের একটা ছোট্ট ছেলে। ধানের ক্ষেত, সবুজ বন, গরু চড়ে বেড়ানো বিস্তীর্ণ মাঠ, কলকাকলি যা শোনা যায় তা পাখির গলায়। সেখান থেকে গিয়ে ঢাকায় বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ আমাকে দারুণ ঘাবড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দিদির বিয়ের সময়, কুষ্টিয়া শহরে, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে বেশ ভালোই

লেগেছিল। এখন একান্তে বসে ভাবলে বুঝি যে মানুষের জীবনে স্বীকৃতির মূল্য কতখানি। আমার আপন বড় বোনের বিয়ে হচ্ছে। অতএব আমার দাম বেড়ে গেল ম্যালা গুণ। সকলের কাছে আমার দাম দিদির থেকে কোনো অংশে কম নয়। সব ব্যাপারেই ছোটলুর ডাক পড়ে। ছোটলু আমার ডাকনাম। কলকাতা থেকে আমাদের সব আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। আমার দুই খালা, খালাতো ভাইবোনেরা ও আমার নানা। সেইবারই বোধহয় তাঁর প্রথম এবং শেষবার পাকিস্তান আসা। তিনি পাকিস্তানে মেধার সংকট নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতেন। আমি নিজেই তাঁর মুখে শুনেছি তিনি বলতেন, যে দেশে খাজা নাজিমউদ্দিনের মতো একজন বোকা লোক গভর্নর জেনারেল হতে পারে, সেদেশের কোনো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না। উনিশ শ বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি যখন ভাষাসৈনিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয় সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব ছিলেন আজিজ আহ্‌মেদ। ইনি ছিলেন ঘোর বাঙালি বিদ্বেষী। আমার নানা যখন কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অব বেঙ্গল-এর রেজিস্ট্রার জেনারেল ছিলেন, তখন এই আজিজ আহ্‌মেদ আমার নানার অধীনে ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল ছিল। আজিজ আহ্‌মেদকে নানা দু'চোখে দেখতে পারতেন না। কারণটা আমাদের ঠিক জানা ছিল না। তবে আজিজ আহ্‌মেদ-এর প্রসঙ্গ উঠলেই নানা বলতেন,"পাকিস্তানের এই অবস্থা নাকি ? খালি মাথার আজিজ আইজ চীফ সেক্রেটারী হইয়া গেছে"? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে নানা কলকাতায় থেকে গেলেও আমাদের কলকাতার নানাবাড়িতে কিন্তু কুমিল্লার ভাষাতেই কথাবার্তা বলা হতো। কলকাতায় আমার বাঙাল হিন্দু বন্ধুরা বেশ অবাক হয়ে যেত। ভাবতো, মুসলমানরা তো উর্দু ভাষায় কথা কয়, তারা আবার বাঙাল ভাষা কয় কেমনে? কলকেত্তিয়া মুসলমানদের দেখেই তাদের এমন ধারণা হয়ে থাকবে। আমার নানা বৃটিশ প্রদত্ত খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একবার ঠাট্টা করতে গিয়ে বকা খেয়েছিলাম। আমি নজরুলের সেই বিখ্যাত ছড়াটা বলেছিলাম তাঁর সামনে, 'কানকাটা হয় খান বাহাদুর– রায় বাহাদুর নাক খুইয়ে'! নানা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন । বলেছিলেন,'বেশি বাড় বাড়ছোস'?

যাই হোক, দিদির বিয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কেবল কলকাতা নয়,ঢাকা,ফরিদপুর,চট্টগ্রাম এমনকি আমাদের গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রতনপুর থেকেও অনেকে এসেছিল ঐ বিয়েতে। দিদি ছিল আমাদের বংশের ঐ প্রজন্মের প্রথম সন্তান যার বিয়ে হচ্ছে। অতএব, কুষ্টিয়ার মতো ছোট শহরটিতে ধুমধাড়াক্কা লেগে গিয়েছিল। আম্মার খুব শখ ছিল যে দিদির বিয়েতে খুব ভালো ব্যান্ডপার্টি আসবে। আমাদের কুষ্টিয়া শহরে কাড়া-নাকাড়া বাজানো সিনেমার পারলিসিটি করার মতো ব্যান্ড ছিল কিন্তু পুলিশ কি মিলিটারি ব্যান্ডের মত কোনো কিছু ছিল না। নানা কলকাতা থেকে একটা ব্যান্ড পার্টি নিয়ে এসেছিলেন। ভাগ্যিস তখনও পাসপোর্ট ভিসা চালু হয় নি , হবো , হবো করছে। এদেরকে কেন যে ব্যান্ডপার্টি নামে ডাকা হতো তা আমি আজও উদ্ধার করতে পারিনি। আসলে 'ব্যান্ড ' শব্দটির অর্থ অনেক ভিন্ন আজ। এখন ব্যান্ড হলো কিছু তরুণের সাংগীতিক সম্মিলন। এই শব্দ পরে পার্টি প্রয়োগ করে বোধহয় এটাই বোঝানো হতো যে আনন্দ বিতরণের নিমিত্ত সংগীত। আমি নিশ্চিত যে 'ব্যান্ড পার্টি' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শব্দ। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে কিছু বিশেষ ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হতো যা খোদ বৃটেনে প্রচলিত ছিল না। আমি এসব শব্দের ওপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংকলিত একটা বিশেষ ইংরেজি অভিধান সংগ্রহ করেছিলাম যেটার নামটাও মজার 'হবসন জবসন'। ঐ অভিধানেও ব্যান্ড পার্টির কোনো উল্লেখ পেলাম না। কলকাতার সেই ব্যান্ডপার্টি ধোপদুরস্ত পোশাক পরে নিরন্তর আধুনিক বাংলা গান এবং হিন্দি সিনেমার গান বাজিয়ে উপস্থিত সকল অতিথিকে আমোদ জুগিয়েছিল প্রায় তিন-চার দিন। আমার দিদির বর, সিরাজুল ইসলাম ভূইঞা, তখন কুষ্টিয়াতেই থাকতেন। তিনি কুষ্টিয়ার জেলা কৃষি অফিসার ছিলেন। ঢাকার মনিপুর ফার্মে অবস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে তিনি ঐ সরকারি চাকরি নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা নিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়েছিলেন। তবে সেতো আরও পরের কথা।

আমরা বিয়ের দিনের অপেক্ষায় এমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম যে বিয়ের দিনটা পেরিয়ে যাবার পরে কেমন লাগবে একথা মনেই আসে নি। শেষ পর্যন্ত দিদির বিয়ে হয়ে গেল। বেশ ধুমধাম করেই হলো। বিয়ের দিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ভাইয়ার নেতৃত্বে আমরা সব শ্যালক, শ্যালিকারা ফরাসের ওপরে জামাইয়ের দিকে পেছন ফিরে বসেছিলাম। তখন মফস্বল শহরে টেবিল চেয়ারের চল হয় নি। আমাদের বাড়ির পাশে মাঠের ওপর বিশাল সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল। তার নিচে মাটিতে শতরঞ্জি পেতে তার ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে ফরাস করা হয়েছে। সেখানে আমাদের দুলাভাই তার দিকে পেছন ফিরে বসা শালা-শালীদের দঙ্গলের কাজকর্ম দেখে মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে হাসতে শুরু করেছেন। তারপর হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই উচ্চস্বরে আমার নাম ধরে ডেকে উঠলেন। এতজন থাকতে আমার নাম কেন ? আমি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। লজ্জায় রাঙাও বুঝি বা। আমার এক জ্যাঠাতো ভাই বললেন, 'যাও ছোটলু, দুলাভাই ডাকছেন'। আমি লজ্জায় কাঠ হয়ে গেলাম। তারপর কিছু বুঝি ওঠার আগেই দিদির বিয়ে হয়ে গেল। দিদি ফুল সাজানো গাড়িতে উঠে আমাদের বাড়ি ছেড়ে তার নতুন ঠিকানায় চলে গেলেন। পেছনে পড়ে রইলো তার চিরচেনা পৃথিবী। ভাই, বোন, মা, বাবা সবাইকে কান্নায় ভাসিয়ে আমার দিদি আমাদের ছেড়ে চললেন তাঁর নতুন ঠিকানায়। তখন তাঁর চোখেও নেমে এসেছে অশ্রুর বন্যা।

উত্তর আমেরিকায়
হাসনাত আবদুল হাই

পাঁচ

লং আইল্যান্ড সার্থক নাম। অন্ততঃ আকারের দিক দিয়ে। ভেতরে ঢুকে টের পাওয়া যায় না, কোথায় শুরু কোথায় শেষ। নবাগতদের তাই হয়; যারা পুরোনো বাসিন্দা বা এখানে মাঝে মাঝে আসে তাদের কাছে এর রহস্য জটিল নয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে একে এখন আর আইল্যান্ড বলা যায় না। কেননা ১৮৮৩ সালে ব্রুকলিন ব্রিজ নির্মাণের পর ম্যানহাটানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল ভূখণ্ডের এককে করে তার বিচ্ছিন্নতার ছেদ ঘটে। এরপর অবশ্য আরো ৬টি ব্রিজ লং আইল্যান্ডকে ম্যানহাটানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ১৮৮৩ এর আগে লং আইল্যান্ড থেকে ম্যানহাটানের যাবার একমাত্র যোগাযোগ ছিল ফেরি। ফেরি টার্মিনালে ছিল লং আইল্যান্ড রেল রোড যার সাহায্যে ম্যানহাটান হয়ে ব্রুকলিন এবং জ্যামাইকায় যাওয়া যেত। লং আইল্যান্ডের পশ্চিম অংশ ব্রুকলিনের কিংস কাউন্টি এবং কুইন্সের কুইন্স কাউন্টির অন্তর্ভুক্ত হলেও লং আইল্যান্ড বলতে এখন কেবল বোঝায় নাসাউ এবং সাফোক কাউন্টি। ব্রুকলিন এবং কুইন্স কাউন্টিকে ধরা হয় রাজনৈতিকভাবে নিউইয়র্ক সিটির অংশ হিসেবে।

লং আইল্যান্ড অভিজাত এবং ধনীদের আবাসস্থল। নিউইয়র্কে এমন সাবার্ব কমই আছে বলে শুনেছি। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এর দশকের ভিতর লং আইল্যান্ডের গ্রামীণ চরিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। রেলরোড এবং এক্সপ্রেসওয়ে হওয়ার ফলে

ধনী এবং অভিজাত শ্রেণীর অনেকেই লং আইল্যান্ডে এসে বাড়িঘর তৈরি করে সাবারবান জীবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লং আইল্যান্ডের বাসিন্দাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। এই সময় এখানে লেভিট টাউন নামে এলাকায় বড় আকারের বাড়ি ঘর নির্মিত হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে যে সব অভিবাসী আসতে থাকে তারা লং আইল্যান্ডকে বেছে নেয় তাদের বাসস্থান হিসেবে। বর্তমানে লং আইল্যান্ডে ইটালিয়ান-আমেরিকান,আইরিশ-আমেরিকান এবং জুইশ-আমেরিকান পরিবারের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকান পরিবারদেরও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। আর কিছু বাঙালী সুন্দর ছিমছাম বাড়িঘর, পথের দুপাশে বড় বড় গাছ ছায়া ছড়ায় সারা দিন। নানা আকারের বড় বড় বাড়ি, সামনে মানানসই গাড়ি, একটা নয়, একাধিক। কোথাও হৈ চৈ নেই, যেন কেউ কাজ করছে না, অথবা ঘুমোচ্ছে, এমন নির্জন নিশ্চুপ চারিধার। খুব কাছে থেকে দেখলে চোখে পড়ে বসবার ঘরে টেলিভিশন দেখছে স্বামী-স্ত্রী, পেছনের ব্যাকইয়ার্ডে সুইমিং পুলে স্নানের নামে লাফালাফি করছে ছোট ছেলে-মেয়ে। কদাচিৎ পোষা কুকুর এসে উঁকি দিয়ে দেখছে কোন গাড়ি এল, কোনটা যাচ্ছে। তারা এত ভদ্র এবং মার্জিত যে একবারের জন্য হাক দেয় না। বেশ অবমাননাকর এই উপেক্ষা। মানুষই মনে করে না নাকি।

লং আইল্যান্ডে নাসাউ এবং সাফোক কাউন্টির মধ্যে প্রথমটিতেই বসতি বেশি এবং সেটি আধুনিকতায় অগ্রসর। সাফোক কাউন্টিতে এখনো গ্রামীণ দৃশ্য এবং ক্ষেত-খামার দেখা যায়। যদিও সাফোক কাউন্টিতে মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে, এর পুব দিকের অংশে গ্রামীণ প্রকৃতির এবং কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম, যেমন– আঙ্গুর চাষ জনপ্রিয়। এখানে গ্রীষ্মকালে পর্যটকদের ভিড় হয় বেশি, খালি জায়গা থাকার জন্য। এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পী জ্যাকসন পোলেকের বাড়ি আর স্টুডিও দেখতেও আসে অনেকে।

ফজলু গাড়ি থেকে নেমে বলল, কিরে সবাই হলিডে করতে গিয়েছি নাকি? রাস্তা সব ফাঁকা, লোকজন নেই। শব্দ পাচ্ছি না। জামশেদ বলল, এখানে এমনই। ভেরী কোয়ায়েট। এর জন্যই তো এর যত নাম আর দাম। আমরা এরপর বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম গ্যারাজ দিয়ে, শরীরে তখনো গাড়ির গতির রেশ। গ্যারাজে চরম বিশৃঙ্খলা, নানা রকমের যন্ত্রপাতি, গ্যাজেট, পুরোনো কাপড় চোপড়। দেখে ভালো লাগল, যাক দেশের একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে হিউমান টাচ। ফজলু বসবার ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, এত শৃঙ্খলা, সাজানো-গোছানো আমার ভালো লাগে না। লং আইল্যান্ডে হাসপাতাল হাসপাতাল ভাব। সাবধানে হাঁটো, আস্তে কথা বলো, যেন এইসব নির্দেশ ঝুলছে চারদিকে। জামশেদ বলল, অপেক্ষা করো। নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে নিয়ে যাব। দেখবে একেবারে বাংলাদেশ। তখন কিছুই মিস্ করবে না। না শব্দ, না রঙ, না গন্ধ। জ্যাকসন হাইটসে গিয়েছো এর আগে? ফজলু বলল, ছাত্রজীবনে নিউইয়র্কে এসেছি কম। জামশেদ বলল, তখন জ্যাকসন হাইটস বাঙালি অধ্যুষিত হয় নি। কৃষ্ণাঙ্গদের দখলে ছিল। এখন সেটা লন্ডনের বাংলা টাউনের মত। নিউইয়র্কের ব্রিক লেন।

যে ঘরে আমার ব্যাগ, বইয়ের প্যাকেট আর সুটকেশ রাখা হলো সেখানেই থাকব আমি, আগামী এক সপ্তাহ। ঘরটা মাঝারি সাইজের, জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিক দেখা যায়। সবুজ লনের মাঝখানে একটা বার্ডস ওয়াটারিং পোল, যেখানে বাটিতে রাখা পানি খেতে আসে আশেপাশের পাখি। পোষা নয়, বুনো, কিন্তু পানি খাওয়ার সুবাদে তাদের এ বাড়ির সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে মনে হলো। লনের শেষে বড় বড় গাছপালা দাঁড়িয়ে, ছোটো-খাটো অরণ্যের মতো। এই উডল্যান্ডও জামশেদের বাড়ির অংশ। প্রায় সব বাড়ির পেছনেই রয়েছে এ ধরনের গাছপালা। একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে চারিদিকে। বাড়িগুলো প্রকৃতির অংশ হয়ে থাকার জন্য সব রকমের চেষ্টা করছে। প্রত্যেকটাই 'ছায়া সুনি-বিড় শান্তির নীড়' হতে চাইছে।

ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখি বিছানায় চাদর পাতা যেখানে সবুজ পাতা, সাদা ফুল আঁকা, যেন বাইরের দৃশ্য এনে সাজানো হয়েছে। কিন্তু ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠি, বালিশে মাথা দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একজন। সাদা-কালো রঙের এক বেড়াল। চাদরের অলংকরণ বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। নড়ে-চড়ে উঠতেই টের পেলাম সে এই ঘরের বাসিন্দা, তাকেই স্থানচ্যুত করে থাকব আমি। বেড়ালটা উঠে আড়মোড়া ভেঙ্গে আমার দিকে তাকালো। তার চোখে শুধু প্রশ্ন লেখা নেই, তাকে মোটেও প্রসন্ন মনে হলো না। লেনর এসে বিড়ালকে ডাক দিয়ে হাতে তুলে নিল, তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, ইওর ফ্রেন্ড। এ ঘরে থাকবে। আপত্তি নেই তো? বিড়ালের মুখে অসন্তুষ্টি তখনো লেগে আছে। সে আমাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, যেন জরিপ করছে। লেনর তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ট্রিট হিম ওয়েল। হি ইজ ইওর বয়ফ্রেন্ড। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হার নেইম ইজ ক্যাথি। ওকে ম্যানহাটানের এক রাস্তায় পরিত্যক্ত দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছি। তারপর আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, না। বুনো স্বভাবের না। মনে হয় কারো পোষা ছিল। রেখে গিয়েছে। অবশ্য এসপিসিএতে রাখা উচিৎ ছিল। সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু এনিমাল। ঢাকায় নেই? আমি বললাম, মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা দমনের জন্য ছোট-খাটো হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন হয়েছে। পশু-পাখির জন্য হতে এখনো অনেক দেরি। লেনর বলল, হবে। নিশ্চয়ই হবে। এটা আন্তর্জাতিক মুভমেন্ট। প্রোগ্রাম। বাংলাদেশ এর বাইরে থাকবে কী করে? আমার ঘুম পাচ্ছিলো, কথা বাড়ালাম না। লেনর ক্যাথিকে নিয়ে চলে গেল। আমি কাপড় পাল্টে চাদর বদল করে বিছানায় শুলাম।

ঢাকা ছাড়ার পর এই প্রথম আমার দুচোখ ভরে ঘুম এল। যখন ঘুম ভাঙলো তখনো বাইরে রোদ, যদিও ঘড়িতে সাতটা বাজে। এদের এখন ডে লাইট সেভিং চলছে। ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিচে ব্যাক ইয়ার্ডে বেশ কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। নর-নারীর মিশ্রিত আলাপ। কৌতূহলী হয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি লনের শেষ প্রান্তে কালো বার্বেকু চুলার সামনে এ্যাপ্রন পরে জামশেদ হ্যামবার্গার আর চিকেন গ্রিল করছে। পাশে মস্ত বড় প্লাস্টিক ব্যাগে গোল গোল রুটি রাখা। আর টমাটো এবং মাস্টার্ডের বড় বড় প্লাস্টিক বোতল সাজানো। মাঝে মাঝে সে তেল জাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিচ্ছে গ্রিলে, তখন ছ্যাক ছ্যাক শব্দ হচ্ছে, ফুটন্ত তেলে বেগুন দিলে যেমন হয়। আগুনের আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে গ্রিলের ভেতর থেকে। বেশ কিছু অতিথি লনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা। প্রায় সবাই পৌঢ় বয়সের, অল্প বয়সীদের মধ্যে শুধু জামশেদের মেয়ে আলিয়া আর একটি তরুণকে দেখা যাচ্ছে। তার ছেলে রেজা নেই। লেনরকেও দেখা গেল না। পাশের ঘরে ফজলু ঘুম থেকে উঠে কাপড় পড়ছে। তাকে বললাম, এত লোক এল কোত্থেকে? খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আমাদের উপলক্ষে? ফজলু বলল, আজ ফোর্থ অফ জুলাই। ওরা সেলিব্রেট করছে। বন্ধুদের ডেকেছে। চল, আমরাও যাই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন ঘুম হলো? আমি বললাম, ভয়ে ভয়ে। ফজলু বলল, কেন? ভয়ে ভয়ে কেন? আমি বললাম ক্যাথি নামের গার্ল ফ্রেন্ডের ভয়ে। তারপর তাকে খুলে বলতে সে হো হো করে হাসলো। বুনো না পোষা, তোয়াক্কা করে না। সবারই একটা বাতিক থাকে না? লেনরের হলো বেড়াল এনে রাখা। চল্ নিচে যাই।

নিচে গিয়ে দেখা গেল লেনর কিচেনে ওভেনে খাবার তৈরি করছে। টার্কি রোস্ট তার পোশাকের ওপরও একটা এ্যাপ্রন। ডানের ঘর থেকে টোয়াং টোয়াং আওয়াজ শুনে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি রেজা গিটার বাজাচ্ছে। ঘরের ভেতর ভায়োলিন, ব্যাঞ্জো, সিনথেসাইজার, নানা সাইজের ড্রাম। দেয়ালে জিমি হেনড্রিক্স, জ্যানেট জ্যাকসন, অলসন ব্রাদার্স, টুপাস শাকুর, বব ডাইলানের পোস্টার বেশ একলেকটিক টেস্ট। লং আইল্যান্ডের খ্যাতনামা গায়ক বিলি জোয়েল, প্যাট, বেনাটার (যাকে পাঙ্ক রকের গডফাদার বলা হয়), পল সাইমন, জনি রেমন, ডেবি গিবসন, এডি মানি, এদের পাশাপাশি নিউ এজ গায়ক জন টেস, পাবলিক এনিমি, মারিয়া কারি, আশান্তি, বুস্তা রাইম এবং লোক সংগীত গায়ক অসকার ব্র্যান্ড, হেরি চাপিন, ডিলা সোল, স্ট্রে ক্যাটস (লেনরের পোষা বেড়াল থেকে নেয়া নাম?) এদের সঙ্গে ডেথ মেটাল ব্যান্ড এই সিরিজের সাফোকেশন, চাক ডি, ফ্লেবার ফ্লাই, ব্লু অয়েস্টার, নাইন ডেজ এবং ভ্যানিলা ফাজ এদের নাম ও পোস্টারও দেখা গেল। এক নজর দেখে নিয়ে বললাম, মিউজিক নিয়ে পড়াশুনা করছো বুঝি? রেজা বলল, না। বাবা পড়তে দেয়নি। বলেছে চাকরি হবে না, খেতে পাবো না। বিবিএ পড়েছি। কিন্তু এখনও চাকুরি পাচ্ছি না। বিবিএ পড়ে কি হলো তাহলে? পেছন থেকে লেনর বলল, হ্যাভ ইউ লুকড এ্যাট ইওর জিপিএ? টু পয়েন্ট সেভেন। লুকস লাইক ইউ হ্যাভ টেকেন টু মানি ভ্যাকেশনস। তোমার একাডেমিক রেকর্ড দেখেই বাদ দিয়ে দেয়। কিপ অন ট্রাইং। বিবিএ'র চাহিদা আছে। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবে। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরে কেন? বাইরে যাও অতিথিরা এসেছে। আলিয়াকে দেখছি একা ঘুরছে। তুমি ঘরে কেন। রেজা বলল, এতক্ষণ ছিলাম। নাউ আই এ্যাম ওয়েটিং ফর মাই গার্ল ফ্রেন্ড। শুনে লেনর বলল, দি সেম ওয়ান? বদলাতে পারলে না। ওর ফ্যামিলি খুব ভালো না। রেজা না শোনার ভান করে গিটার বাজাতে থাকল। মুখ না তুলেই বলল, মম্ ওয়ান্ট্ টু চুজ এভরিথিং ফর মি। এডুকেশন, ড্রেস, মিউজিক, গার্ল ফ্রেন্ড! আমি বললাম, কোন গান পছন্দ তোমার? রেজা বলল, পাঙ্ক জাজ। শুনে চুপ করে থাকি। পাঙ্কের নাম শুনেছি জাজ তো অনেক দিনের পুরোনো। কিন্তু দুটো মিললো কবে? ফলাফলটা কী দাঁড়িয়েছে? জিজ্ঞাসা করলাম না। কি দরকার? রেজা বলল, সেই সঙ্গে হিপ হপও। হিপহপ যন্ত্রের সঙ্গে র‍্যাপ মেশানো। শুনে আমার মাথা ধরে যায়। পাছে সে বাজিয়ে শোনায় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে যাই। লেনর বলল, হি হ্যাজ এ ট্যালেন্ট ফর মিউজিক। দিনরাত ফিউশন করছে। ওর একটা ব্যান্ড দল আছে। মাঝে মাঝে জ্যাম সেশন করে। মনে হয় মিউজিক পড়লেই ভালো করত। আমি বলি, হ্যা। তাইতো মনে হচ্ছে। খুব ইনোভেটিভ। ওর মিউজিক রেসিপি বুকে অনেক ধরনের মেন্যু। হ্যা। নিঃসন্দেহে ট্যালেন্টেড। লেনর বলল, মিউজিক ভালবাসে বলেই গার্লফ্রেন্ড জুটে যায় ওর। দুঃখের বিষয় তাদের ফ্যামিলি আমার পছন্দের হয় না। তারপর ওভেন খুলতে খুলতে বলে, সব কিছু দেখতে হবে না সম্পর্ক গড়তে গিয়ে ? আমি মনে মনে বলি, তুমি কি অত বাছ-বিচার করেছিলে বিড়াল নিয়ে আসার আগে? জেনেছো তাদের পেডিগ্রি ?

বসবার ঘর থেকে বেরুতেই কাঠের প্লাটফর্ম, সেখানে লাল-নীল রঙ ছাতার নিচে গোল করে কাঠের বেঞ্চ পাতা। খোলা আকাশের নিচে প্লাস্টিকের ফোল্ডিং চেয়ারও আছে। অর্ধেক চেয়ার খালি, কেননা অর্ধেক অতিথি লনে দাঁড়িয়ে আছে অথবা ঘুরছে। জামশেদ যে এ্যাপ্রন পড়েছে তার ওপরে নিউইয়র্কের স্কাইলাইনের ছবি, নিচে লেখা 'লং আইল্যান্ড'। বোঝাই যায় নিউইয়র্ক নিয়ে যেমন এদের গর্ব, লং আইল্যান্ডের অধিবাসী হবার জন্য একই আভিজাত্যবোধ সদা জাগ্রত। আমেরিকানদের জন্য এ দুটোই গর্বের বিষয়, বাঙালির জন্য তো হবেই। জামশেদের বৈষয়িক সাফল্যে আমরাও গর্ববোধ করি। জামশেদ আমাদের দেখে বলল, ক্ষিধে পায় নি ? পার্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। কী পছন্দ ? হ্যামবার্গার না চিকেন গ্রিল ?

দুটোই তৈরি হচ্ছে। লেনর ওভেনে তৈরি করছে টার্কি রোস্ট। ফোর্থ অব জুলাই এ আমরা প্রতি বছরই আমাদের বাড়িতে পার্টির আয়োজন করি। বন্ধুদের ডাকি। মিট দেম। সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। আমেরিকান স্টাইল জানেনই তো।'

আমি আর ফজলু কাগজের প্লেটে গ্রিল করা মুরগীর রান, সাউয়ারক্রট আর গোল রুটি নিয়ে লনের মাঝখানে পোতা পোলের ওপরে বাটিতে রাখা পানি খেতে ব্যস্ত পাখিদের দেখি। এত মানুষ দেখে তাদের একটুও ভয় বা চিন্তা নেই। তারাও ফোর্থ অব জুলাই উদযাপন করছে মহাফূর্তিতে, মনে হলো।

দেখা গেল শুধু প্লেট না, খাবার পানির জন্যও রয়েছে পেপার গ্লাস। এটাই নিয়ম। লেনর বলল, খুব হাইজেনিক। একজন খেয়ে ফেলে দেয়, অন্যকে ব্যবহার করতে হয় না।

জামশেদ বলল, বাট গ্লাস হ্যাজ ক্যারেক্টার। লেনর বলল, কাচের গ্লাস বারোয়ারী। সবাই ব্যবহার করে। হোয়ার ইজ দা ক্যারেক্টার ? ইট ইজ লাইক এ প্রমিসকুয়াস উওম্যান। বুঝলাম গ্লাসের ব্যাখ্যায় লেনর অনেক দূর যেতে পারে। গ্লাস তার কাছে শুধু পানি খাওয়ার আধার না। একটা মেটাফর। কিন্তু এই যে পেপার গ্লাস ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া, এই ব্যাপারটার মধ্যে কী সম্পর্কের ভঙ্গুরতা অথবা ক্ষণস্থায়ী অনুভবের ইঙ্গিত নেই ? প্লেটে মুরগি শেষ হয়ে যাওয়ায় দার্শনিক চিন্তা বাদ দিয়ে জামশেদের বার্বেকিউ চুলোর দিক যাই। কালো জালিরর ওপর হলুদ রঙ মসলা মাখা হ্যামবার্গার, মুরগির ড্রামস্টিক, ব্রেস্ট, এইসব ঝলসাচ্ছে। গন্ধ উঠছে বাতাসে মশলার আর বাটার ওয়েলের। ক্ষিধে চনমনিয়ে উঠছে সেই গন্ধে। অথচ সারা পথ খেতে খেতে এসেছি। বিমান কী এমন পার্টির কথা ভেবেই আমাদের অভ্যস্ত করে তুলেছিল ধীরে ধীরে ?

কাঠের প্ল্যাটফর্মে একপাশে সোনালি চুল, পাজামা-স্যুট পরা এক আমেরিকান মহিলা বসে খাচ্ছেন। পাশে এক বাঙালি। দেখতে মহিলার চেয়ে খর্ব, রঙও বেশ গাঢ় বাদামি। চুল সাদাপাকা, খনখনে গলায় কথা বলছেন ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলা চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছেন, এক হাত বাড়িয়ে পরিচয় করালাম নিজেকে এবং পরিচিত হলাম। ভদ্রলোক ডাক্তার, ভদ্রমহিলা তার স্ত্রী। আবার তাকালাম। ভদ্রমহিলা পৌঢ়ত্বের কাছাকাছি পৌঁছেছেন কিন্তু মুখ এখনো সুশ্রী, এককালে সুন্দরী ছিলেন বোঝাই যায়। পরে শুনলাম নার্স ছিল। হ্যাঁ, এমন হওয়ারই কথা, প্রায় ক্ষেত্রেই এভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তারপর বিয়ে হয়। নার্সের অভিলাষ ডাক্তার বিয়ে করে সমাজে ওঠা, স্ট্যাটাস পাওয়া। সাদা পাওয়া না গেলে বাদামি রঙে আপত্তি থাকে না। ডাক্তার তো ! আর ডাক্তার যিনি, সুন্দরী আমেরিকান মহিলা বিয়ে করতে পেরে খুশি। সমতাবোধ আমেরিকান সমাজের ভিত্তি, সেই ফাউন্ডিং ফাদারসদের সময় থেকে। তবু নীল রক্ত, আভিজাত্যের গর্ব এবং সচেতনতা যে নেই তা নয়। *এমন যারা তারা প্রতাপশালী কিন্তু বর্তমানে সংখ্যা লঘিষ্ট।*

জামশেদ এসে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে বলল, হি ইজ এ গ্রেট রাইটার। হি ইজ গোয়িং টু রাইট এ বুক এবাউট দিস্ ট্রিপ। টেল হিম এবাউট ইউ। ইউ উইল বি ইন হিজ বুক। ইয়া। শুনে ভদ্রমহিলা একটুও উৎসাহিত বোধ করলেন না। বোঝা গেল বাংলাদেশের এক লেখকের বইতে তার নাম থাকল কি থাকল না তা নিয়ে মোটেও কৌতূহল নেই তার। বেশ বিব্রত হলাম, হেসে বললাম, হি ইজ জোকিং। দেয়ার উইল বি নো বুক। জামশেদ লনে বার্বেকু চুলোর দিকে যেতে বলল, দেয়ার উইল বি এ বুক। আই নো ইট। মাই গাট ফিলিং টেলস মি। টেল হিম এবাউট ইউ। এতে ও মহিলার ভাবান্তর হলো না। চুপচাপ বসে থাকলেন। বোঝা গেল কোনো বইতে চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের বাসনা তার নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের একটা বইতে তার নাম এবং কথা থাকল কি থাকল না তাতে তার কিইবা আসে যায় ? তাও ইংরেজিতে লেখা হলে কথা ছিল।

পার্টিতে এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। চুপচাপ বসে আছেন। কালো রঙ, মাথায় সাদা চুল, কিন্তু বয়স বেশি বলে মনে হলো না। নাম ইলিয়াস কবির। জামশেদের ছোট বোন রানীর স্বামী। একটা কম্পিউটার স্কুলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। তার স্ত্রী রানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার বড় বোন মুন্নী। মুন্নী জামশেদের বাড়িতেই থাকে। ডিভোর্স অথবা বিধবা হওয়ার পর এখানে চলে এসেছে। জামশেদ পার্টনারশিপে একটা গ্যাস স্টেশন এবং সংলগ্ন কনভেনিয়েন্স স্টোর দিয়েছে লং আইল্যান্ডের কাছেই। মুন্নী সেখানে কাজ করে। ভাইয়ের বাড়িতে থাকছে কিন্তু গলগ্রহ হয়ে নেই। রানীও কাজ করে নিউইয়র্কে তবে তার সমাজ সেবার জন্যই সময় যায় বেশি। সোসাল ওয়ার্কের জন্য সে কাউন্টি কাউন্সিল থেকে এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। বেচারি গুরুতর ডায়াবেটিক রোগী। কিডনি কাজ করছে না। ডায়ালাইসিস নিচ্ছে। দেখলে মনেই হয় না এত গুরুতর অসুখ তার। হাসি-খুশি মুখ, সবার সঙ্গে মিশছে। কথা বলছে। সহজেই আপন করে নিচ্ছে। জামশেদের কাছেই পরে জানা গেল এস্টোরিয়ায় বোহেমিয়ান পার্কে এবারে যে তৃতীয় উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন হচ্ছে রানী তার অন্যতম উদ্যোক্তা।

এক আমেরিকান ভদ্রলোক খাকি সর্টস আর টি সার্ট পড়ে ঘুরছেন। হাতে বিয়ারের বোতল নিয়ে জামশেদের কাচে প্লাস্টিক চেয়ার টেনে বসে বলল, হাউ আর ইউ ডুয়িং ? জামশেদ চুলার ধুঁয়া হাত দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে বলল, ফাইন। ডুয়িং ফাইন। তারপর যে ভদ্রলোককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, মিট এ গ্রেট রাইটার। হি ইজ গোয়িং টু রাইট এ বুক অন অল অফ আস্। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নো কিডিং ? এ হোল বুক? এ্যান্ড আই উইল বি দেয়ার ? গস্ ! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সুট ? আসক্ মি এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু নো। আই এ্যাম গেম।

ওয়াও ! এ রাইটার ! তারপর বিয়ার হাতে বসে থাকলেন মুখে হাসি নিয়ে। যেন পোজ দিচ্ছেন ক্যামেরায়। উৎসাহ নিয়ে বললেন, হোয়ার শুড আই স্ট্যার্ট ? ফ্রম চাইল্ডহুড ? আমি হেসে বললাম, হি ইজ পুলিং ইওর লেগ। দেয়ার ইজ নো বুক। জামশেদ বলল, ওহ, ইয়েস দেয়ার ইজ। বি কেয়ারফুল হোয়াট ইউ সে। হি ইজ রাইটিং এভরিথিং। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলে, আই সি নো পেন এ্যান্ড পেপার। জামশেদ বলল, হি ইজ মেন্টালি রাইটিং। ইউ নো দ্যাটস দেয়ার ট্রিক। ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, আর ইউ এ জার্নালিস্ট ? আমি মাথা নেড়ে বলি, না। তুমি খুব নিশ্চিন্তে খাও, কথা বলো। আমি কোনো নোট নিচ্ছি না। কোনো বই লেখার প্ল্যান নেই আমার। জামশেদ জোর দিয়ে বলে, হি হ্যাজ নট কাম ফ্রম বাংলাদেশ টু ইট মাই হাফ ডান হ্যামবার্গার। ইউ নো। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন, দে আর ওয়েলডান। নট হাফ ডান। ততক্ষণে আমার মনের ভেতর একটা বই অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। কি কাণ্ড ! আমি সত্যি সত্যিই মেন্টাল নোট নিচ্ছি। সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছি খুব মনোযোগ দিয়ে। আমার মনের এন্টেনা এখন সচল। জামশেদ কি গোয়েবলসের প্রচার কৌশল জানে ? একটা মিথ্যা বার বার বললে সেটা সত্যি হয়ে যায়, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ? ফোর্থ অব জুলাই এর সন্ধ্যা হতে না হতে আকাশে রঙের ফুলঝুড়ি, হাউই, ফানুস উড়তে থাকল। রাতের আকাশ হয়ে উঠল উজ্জ্বল বর্ণীল। দেখতে দেখতে মনেই হলো নাম মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে ঢাকা ছিলাম। কিছু টের পেলাম হরফের মিছিল শুরু হয়েছে। বই লেখা হচ্ছে।

সব অতিথি চলে গেলে একা যুবক এল। দীর্ঘ দেহ, ফর্সা এবং দেখতে সুন্দর। জামশেদ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, স্যাম। আমার বন্ধুর ছেলে। শুনে মনে হলো এদেশীয় কোনো বন্ধু হবে। জামশেদ বলল, ওর বাবা ঢাকায় বিসিআইসিতে চাকরি করত। বাঙালি ? স্যাম নাম হলো কবে থেকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলো না। কি দরকার ? এদেশে এটাই নিয়ম। রবার্ট হয়ে যায় বব, জনকে ডাকে জ্যাক বলে। ছেলেটির নাম হয়তো সামাদ। সেই থেকে স্যাম। স্যাম থেকে পদোন্নতি পেয়ে হয়ে যাবে স্যামি। জামশেদের কাছে জানা গেল স্যামকে তার বাবা পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষার জন্য। সে জামশেদের বাড়িতে থাকে-খায় আর মুন্নীর মতো একই গ্যাস স্টেশনে পার্ট-টাইম কাজ করে কলেজে যায়। দেখেই মনে হলো স্যাম বেশ সিরিয়াস ছেলে। কাজ করছে, পড়ছে আবার বাড়ির ছোটখাটো কাজ করে দিচ্ছে। গ্যাস স্টেশনে থাকার জন্য সে পার্টিতে আসতে পারে নি। তার কর্তব্যবোধে মুগ্ধ হই। এ ছেলে উন্নতি করবে নির্ঘাৎ। ফজলু আমার সঙ্গে একমত। সে স্যামের বাবাকে চেনে। ঢাকা ক্লাবে যে কোনদিন গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে বলে জানালো সে। কি করে চিনবো তাকে ? ফজলু বলল, সবসময় পান খায়।

অতিথিরা চলে যাবার পর এক গাড়ি ভর্তি মানুষের এক দল এল। ফজলুকে দেখে বলল, আপনাদের খুঁজে হয়রান। বিকাল থেকে খুঁজছি। ফজলু বলল, আপনাদের তো রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে যাবার কথা। তাদের একজন, মোজাম্মেল হক মিন্টু বলল, গিয়েছিলাম। লেট হবার জন্য মিস করেছি। তারপর থেকে খুঁজছি। যাক আপনারা এসে গিয়েছেন দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বলে সে আমার দিকে তাকাল।

ফজলু বলল, আপনারা মানে ? আমি তো সাহিত্যিক হিসেবে আপনাদের ফাংশানে আসি নি ? হাইকে বলুন। সেই তো অতিথি।

জামশেদ বলল, উনি এরই মধ্যে বই লেখার অনেক খোরাক, মানে ম্যাটেরিয়াল পেয়ে গিয়েছেন। আপনাদের ভাবতে হবে না। শুনে আমি জামশেদের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাই। একান্তে পেয়ে ফজলুকে আমি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা জামশেদের মাথায় আমার বই লেখার ব্যাপারটা ঢুকলো কী করে ?

ফজলু অম্লান বদনে বলল, আমি ঢুকিয়েছি।

তুই ? কেন? আমি তো বলি নি বই লিখব। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই।

আরে বুঝলি না, বই লিখছিস শুনলে সবাই এক্সট্রা খাতির করবে। এটা ওটা দেখাবে। কত জায়গায় নিয়ে যাবে। তারপর সে স্বর নামিয়ে বলল, তুই বই লিখিস, না লিখিস, শুনে চুপ করে থাক। হ্যাঁ, না, বলার দরকার কী ? শুনে অবাক হয়ে তাকাই তার দিকে।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ফজলুদের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদের কাছে। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বেশ পরিচিত।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ

করুণাময় গোস্বামী

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ৮৭ বছর বয়সে আমেরিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের একটি অত্যুজ্জ্বল দীপ নির্বাপিত হলো। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর এই প্রয়াণ আকস্মিক না হলেও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভারতবর্ষের সংগীতকলাকে পৃথিবীর জন্য মনোযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে যে-গুটিকয় মানুষ বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তাঁদের অন্যতম। পিতা আচার্য

আলাউদ্দিন খাঁর যোগ্য উত্তরসূরি তিনি। তাঁর মৃত্যুতে আলাউদ্দিন পরম্পরার একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ খসে পড়ল। বাংলাদেশের মানুষের জন্য আলী আকবর খাঁর প্রয়াণ আত্মীয়বিয়োগের মতো। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামের সন্তান।

খুব অল্প বয়স থেকে আলী আকবর খাঁ তাঁর অসামান্য সংগীতপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সংগীতের নানা শাখায় অধিকার থাকলেও সরোদই ছিল তাঁর প্রিয়তম যন্ত্র এবং তাঁর বাদনপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর তিনি সরোদবাদনেই রেখে গেছেন। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ ভারতবর্ষের সংগীতের সমসাময়িক ইতিহাসে এক যুগপ্রবর্তক ব্যক্তি। কণ্ঠসংগীত চিরকালই ভারতবর্ষের সংগীতকে প্রভাবিত করেছে বা বলা যায় কণ্ঠসংগীতের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের সংগীতকলা গড়ে উঠেছে। যন্ত্র প্রাচীনকালেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, বর্তমানকালেও আছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কণ্ঠসংগীত জানতেন, কিন্তু যন্ত্রসংগীতকেই তিনি তাঁর বাদনমাধ্যমের প্রধান সহায় করে তুলেছিলেন এবং আচার্য হিসেবে তাঁর প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধারায় এত উচ্চমানের যন্ত্রীসমাজ গড়ে উঠেছিল যে, গেল শতকের প্রায় মধ্যভাগে এসে যন্ত্রীদের দাপটেই হিন্দুস্তানি সংগীতকে মুখরিত করে তুললেন। যন্ত্রীরাই এ সংগীতধারার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যন্ত্রে বাঙালির এমন কোনো অধিকার নেই। বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতা গড়ে উঠলে এখানে ভারতবর্ষের নানা ঘরানার যন্ত্রীরা আসতে শুরু করলেন। বাঙালিরাও নানা যন্ত্রে তালিম নেন, কিন্তু সর্বভারতীয় মানে তারা পৌছতে পারেন নি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি নিজে যেমন হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদের অনেককেই তিনি যন্ত্রসংগীতের অতি উচ্চ আসনে পৌছতে সাহায্য করেছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ নিজে বাদক হিসেবে যেমন অতুলনীয় খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তেমনি আচার্য হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল সমতুল্য। কেউ কেউ মনে করেন আচার্য হিসেবেই তাঁর দান অধিকতর সম্পন্ন। পিতার এই আচার্যের আসনটি ওস্তাদ আলী আকবরও আঁকড়ে ধরেছিলেন। বহু শিক্ষার্থীকে তিনি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছেন এবং তাঁরা ভারতবর্ষের রাগসংগীতের প্রবক্তা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। ফলে কালের বিবেচনায় ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ একদিকে যেমন একজন মহান বাদক, মহান সরোদ বাদক, তেমনি তিনি একজন মহান আচার্য।

একটি কথা ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সম্পর্কে জোরালভাবে বলা হয় যে, বিশ্বের সংগীত দরবারে হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের পতাকাকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেছিলেন এবং এ ব্যাপারে বিশ্বসংগীত রসিক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, ১৯০১ সালে বিখ্যাত প্যারিস প্রদর্শনীতে আসাদুল্লা খাঁ ও কেরামতউল্লাহ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় সরোদ বাজাতে গিয়েছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হিরকজয়ন্তী উৎসবে আতা হোসেন খাঁ ও আমির খাঁ বাদক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ উদয় শংকরদের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভ্রমণ করে হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের প্রতি পাশ্চাত্যের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিলেন। তবে এই কাজে যুগান্তকারী অবদান রাখেন আলাউদ্দিন খাঁর পুত্র ও শিষ্য আলী আকবর খাঁ ও পুত্রতুল্য শিষ্য রবি শংকর। বেহালা বাদনের কিংবদন্তী পুরুষ ইয়ুদি ম্যানহুন এদের দু'জনের জন্যে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইয়ুদি ম্যানহুন নিজেও এদের সঙ্গে বাদনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে আজকে যখন দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য ভারতবর্ষের সংগীতকলাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে, এমনকি পাশ্চাত্যের সংগীতরচনায় ভারতবর্ষের সংগীত একটি প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তখন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয় যে, এ ব্যাপারে তাঁর একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে যশস্বী সংগীত বিশ্বকোষ হচ্ছে Garland Encyclopedia of World Music। নিউইয়র্ক ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত এই বিশ্বকোষ মোট ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। ২০০০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বকোষ যাঁরা পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা ইউরোপের জন্যে রেখেছেন ১০০০ পৃষ্ঠার এক খণ্ড এবং 'সাউথ এশিয়া দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট' নামে ভারতবর্ষের সংগীতের জন্যে রেখেছেন ১০০০ পৃষ্ঠার এক খণ্ড । সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। ইউরোপের জন্যে এক খণ্ড আবার ভারতবর্ষের জন্যে এক খণ্ড ! যেটা ২০০০ সাল থেকে ৩০/৪০ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। The Oxford Companion to Music গ্রন্থে Oriental Music নামে যে একটি এন্ট্রি আছে তাতে ভারতবর্ষের সংগীত সম্পর্কে হেলাফেলা করে মাত্র কয়েকটি বাক্য আছে। তাতে এ সংগীতকে একটা অপরিণত, অসংগঠিত এবং একসুররেখা কবলিত কোনোরকমের একটা সংগীত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে এই এন্ট্রিতে যেমন বলা হয়েছিল, ১৯৮০ সালে এসেও তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ২০০০ সালে এসেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যায়– ইউরোপকে বিশ্বকোষের এক খণ্ডে স্থান দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষকেও এক খণ্ডে স্থান দেওয়া হয়। গোটা পৃথিবীকে যেখানে ১০ খণ্ডে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে ভারতবর্ষকেই সারা পৃথিবীর ১০ ভাগের ১ ভাগ স্থান করে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের এই যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ, তার পেছনে আলী আকবর খাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ দেশে-বিদেশে নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। অগণিত অনুরাগীর ভালোবাসা পেয়েছেন। গোটা ব্যাপারটির পেছনে কাজ করেছে সংগীত সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, সুকঠোর অনুশীলন এবং অসামান্য

পরিমিতিবোধ। গান-বাজনার ব্যাপারটিকে নানাভাবে বিবেচনা করা চলে। এমন অনেক বাদক আছেন যারা চমৎকার নির্ভুল বাজান। তাঁদের কাজে খুঁত ধরার কোনো অবকাশ থাকে না। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, শিল্পকলায় সত্যের দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে বাস্তবিক সত্য, আরেকটি হচ্ছে সম্ভাব্য সত্য। প্রতিটি রাগ উপস্থাপনেরই একটি বাস্তবিক সত্য আছে অর্থাৎ এই হলে এই হয় এবং এই না হলে এই হয় না। আরেকটি আছে এর সম্ভাব্য সত্য অর্থাৎ বাস্তবিককে সঙ্গী করেও এর সম্ভাব্যতাকে দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছিলেন- 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেনো'। রামায়ণে যে রামকে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবিক রাম নন। বাস্তবিকের সঙ্গে বাল্মিকীর কল্পনাশক্তি মিশে একটি সম্ভাব্য বিষয়কে গড়ে তুলেছে বলেই রামায়ণ ইতিহাস নয়, মহাকাব্য। তেমনি আলী আকবর খাঁ বা তাঁদের গোত্রের মহান বাদকদের বাজনায় এমন একটি জিনিস পাওয়া যায় যেখানে রাগরূপের বাস্তবিক সত্য আছে এবং এই বাস্তবের অন্তর্বর্তী যে সম্ভাব্য সত্য, তার আলোও সেখানে ঠিকরে পড়ছে। এঁদের বাজনার দুটি মাত্রা। একটি মাত্রা থাকে বাজনার উপরিতলে, আরেকটি মাত্রা থাকে বাজনার ভেতরকার তলে। বাহির এবং ভেতরের এই সম্মিলনই এঁদের বাজনাকে স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যায় এবং বারবার নতুন বলে মনে হয়। শুধু যদি অঙ্কের মাপে চলত, শুধুই যদি বাস্তবিককে ধরে রাখত, তাহলে এ বাজনা এতটা উচ্চস্তরে পৌছতে পারত না। এঁদের বাজনায় মহাকাব্যের গুণাবলি পাওয়া যায়। এই বাজনা ইতিহাসকেও স্বীকার করে , আবার কাব্যকেও স্থান দেয়।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর বাজনার আরেকটি বিশেষ দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সে হচ্ছে তাঁর সংগীতের ওজন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে বলেছিলেন যে, বাল্যকালে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে যে ধ্রুপদী সংগীত শুনেছেন তাঁর প্রধান গুণ ছিল ওজন, সংযম ও সুসংগতি। ধ্রুপদ প্রসঙ্গে বললেও এই ওজনের ব্যাপারটা অধ্রুপদ সংগীতের জন্যেও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁর পরম্পরায় ধ্রুপদের প্রভাব গভীরভাবে কাজ করেছে। করাই স্বাভাবিক, কেননা তিনি নিজেও অতি উচ্চমানের ধ্রুপদী সংগীত রচিতে অভ্যস্ত ছিলেন। রাগসংগীতের এই যে বিশেষ গুণ 'ওজন'– ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সেটিকে অতি যত্নের সঙ্গে তাঁর সংগীতে রক্ষা করেছেন। অত্যন্ত ওজনদার তাঁর বাদনশৈলী। একটু মনোযোগ দিয়ে ওস্তাদ আলী আকবরের রেকর্ড শুনলেই আমরা বুঝতে পারব যে, তিনি এই ওজন রক্ষা করার জন্যে লিরিক্যাল ভ্যালুকে বাদ দেন নি। অর্থাৎ এ বাজনা একইসঙ্গে গম্ভীর ও সুরদার। সুরে ও গাম্ভীর্যে তাঁর প্রকাশরীতিকে– যাকে আমরা ক্ল্যাসিক্যাল মহিমা বলি, তার একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। এ কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, শ্রেষ্ঠ বাদকের সব গুণ ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর বাদনে পাওয়া যায়। তবে এই ওজনদারির ব্যাপারটা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এজন্যে যে, এমন ওজনদার বাজনা আমি আর কারও মধ্যে পাই না।

সংগীতের একটি অতিবিপুল শাস্ত্র আছে। যুগে যুগে সেই শাস্ত্রের বিপুলতর টীকাভাষ্য রচিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত টীকাভাষ্যের মূর্ত রূপ আমরা অনুভব করি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বাদনে বা গায়নে। যেমন– এমন যদি হয় এবং হয়েই থাকে যে, অবরোহে 'রে' আন্দোলিত হবে। এখন সেই আন্দোলনটির প্রকৃত স্বরূপ কী? এর প্রকৃত সম্ভাবনাই বা কী? এ ব্যাপারটা একজন শ্রেষ্ঠ মাপের গায়ক বা বাদক না হলে বুঝে উঠতে পারা যায় না। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সেই উচ্চকোটির সংগীতশিল্পীদের একজন যিনি সংগীতশাস্ত্রের কথিত সত্য ও সম্ভাব্য সত্যের রূপটি একইসঙ্গে নির্দেশ করতে জানেন। এই অর্থে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর মতো পারফর্মার সংগীতশাস্ত্রকে নিজ বাদনে প্রতিধ্বনিত করেন।

আমি এই বলে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন করব যে– তিনি আমাদের রাগসংগীতকে বাদক হিসেবে, আচার্য হিসেবে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তার প্রতি সারাবিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আলী আকবর খাঁ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং কনসার্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর মঞ্চে গৌরবের সঙ্গে উপস্থাপনার বিষয় আমাদের যদি কিছু থাকে– সে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির একটি অতি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে আমাদের সংগীত। তিনি এই সংগীতকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত করে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। আপ্তবাক্যে আছে– 'কীর্তি যাঁর তিনিই বাঁচেন'। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি তাঁর কীর্তিতে রয়েছেন এবং থাকবেন অতি দীর্ঘকাল। এরই নাম অমরত্ব। আমরা সেই অমর আলী আকবর খাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।
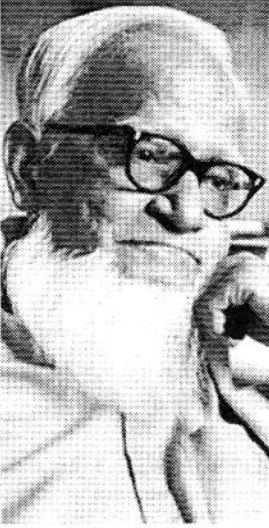
মানবতন্ত্রী আবুল ফজল শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ

ফেরদৌস আরা আলীম

বাঙালি মুসলমানের সার্বিক বিকাশের এক দোদুল্যমান সময়ে আবুল ফজলের জন্ম। বঙ্গভঙ্গের সময়কালে তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার কেঁউচিয়া গ্রামে মা গুলশান আরার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের আনন্দ বা বঙ্গভঙ্গ রদের বেদনা তাঁকে স্পর্শ করে নি, করেছিল তাঁর আলেম পিতা মৌলভি ফজলুর রহমানকে। তরুণ পুত্রের বাংলা ভাষাচর্চা তাঁকে শঙ্কিত করেছিল। পুত্রকে তিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন! যেমন চেয়েছিল তাঁর সময়, সমাজ ও স্বজাতি। কিন্তু আবুল ফজল ছিলেন অদম্য। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই তিনি চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত অনুষ্ঠিত বড় বড় সমাবেশ-সম্মেলনে যোগ দিতে শুরু করেছেন। তিন মাসের অগ্রিম চাঁদা পাঠিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের ধূমকেতু পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন আবুল ফজল। অতঃপর তাঁর শিরায় বহমান শোণিত কোন সুরে কথা বলবে তারই একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা পাব, 'মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ'টিতে। সময় প্রকাশন থেকে পাঁচ সদস্যের একটি বিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিকে একটি ব্যতিক্রমী স্মারকগ্রন্থ বলা চলে।

স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী, লোকবিজ্ঞানী শিল্প-সমালোচক, সাংবাদিক থেকে তরুণতম গবেষক-শিক্ষকও আবুল ফজলের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে ঋদ্ধ আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে। নিজের সৃজনকর্মে তিনি যেমন 'একটি সময়ের ছবি' এঁকেছেন এ গ্রন্থের লেখকবৃন্দও তেমনি 'তিনটি মানচিত্রে'র ছায়ায় দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকা এই মানুষটিকে উপমহাদেশের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ এক জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে রেখে আলোচনা করেছেন।

আবুল ফজল ছিলেন একাধারে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক-সাহিত্যাচার্য। ছিলেন ভাবুক, চিন্তক ও প্রবন্ধকার। গ্রহের ফেরে ৪৭-এর পরে অনেকের মতো তাঁকেও একটা ভুল রাষ্ট্রের বাসিন্দা হতে হয়েছিল। ৭১-এর পরে সঠিক ঠিকানার ভুল বাসিন্দাও তাঁকে হতে হয়েছিল। ফলে তাঁর ভাবনার জগতে বিস্তর তোলপাড় হয়েছে। তিনি ভেবেছেন প্রচুর এবং তাঁর ভাবনার অর্থ ছিল নিরন্তর লেখনী-চালনা। সৃজনশীল লেখক হিসেবে গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা, দিনলিপি, রোজনামচা, রেখাচিত্র– অনেক লিখেছেন তিনি। এ গ্রন্থের প্রথমার্ধের বিশটি প্রবন্ধে তাঁর সময়ের অনুপুঙ্খ চালচিত্রসহ তাঁর সৃজনকর্ম নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনা হয়েছে।

অন্নদাশংকর রায় যখন 'রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজল' লেখেন তখন লেখক হবার, লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার এবং একইসঙ্গে বাংলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ও 'বাকভঙ্গিমা'র রবীন্দ্র-স্বীকৃতি আদায় করে নেবার জন্য মরিয়া আবুল ফজলকে আমরা আবিষ্কার করি। সন্দেহ নেই সমকালে তাঁর লেখা তোলপাড় তুলেছিল। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সাহিত্যিক আবুল ফজলকে 'সমকালের গর্ব' বলেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির মর্মমূলে যাঁর অধিষ্ঠান ছিল কিংবদন্তিতুল্য সেই ওয়াহিদুল হক লিখেছেন, 'তাঁর কিছু কিছু গল্পে এবং কোনো উপন্যাসে কোথাও অসম্ভব আধুনিক উদারতা দেখেছি, দেখেছি বুদ্ধসুলভ করুণা। খুবই বড় মানুষ মনে হয়েছে তাঁকে'। বলেছেন আবুল ফজলের 'মানবতন্ত্র' তাঁর 'বাইবেল ছিল দীর্ঘকাল।' কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে যেভাবে বলেন, '.... শিক্ষাপ্রদ হয়েও উপভোগ্য বা উপভোগ্য হয়েও শিক্ষাপ্রদ'। ঠিক একইভাবে তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীলতা আছে তাঁর প্রবন্ধে, যেমন প্রবন্ধ আছে তাঁর সৃষ্টিশীল লেখাতে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকও এ ধরনের এক মন্তব্যে বলেন, 'তাঁর সব সৃষ্টিই হৃদয়ধর্মী- এমন কি ধর্মতত্ত্বও।' কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর গল্পে পেয়েছেন 'গাল্পিকের সহানুভূতি, বাস্তবতাবোধ, স্বচ্ছচিন্তা এবং সর্বোপরি শিল্পীর হাতের ছোঁয়া।' আবুল ফজলের প্রবন্ধকে তিনি বলেছেন 'সুচিন্তিত রচনা যার মধ্যে সহজ জ্ঞান আর কল্যাণবুদ্ধি

প্রকাশ পেয়েছে।'

আবুল ফজলের সাহিত্যকৃতি নিয়ে তাঁর সমকালে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। আলাউদ্দীন-আল-আজাদ, আনোয়ার পাশা, আবদুল গণি হাজারী প্রমুখ গুণীজনেরা আলোচনা করেছিলেন। তিনি নিজেও নিজের গল্প সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাটির পৃথিবী' সম্পর্কে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রশংসাসূচক আলোচনা হয়েছে। লীলা রায় তাঁর A challenging decade- Bengali literature in the Forties গ্রন্থে আবুল ফজলের প্রথম গল্পগ্রন্থটি নিয়ে কথা বলেছেন। এসব আলোচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নিয়ে সবিস্তারে তাঁর সাহিত্য ও ছোটগল্প নিয়ে লিখেছেন সুব্রত বড়ুয়া ও সুভাষ দে।

মালেকা বেগম ও সারিকা সানোয়ার ডিনা আবুল ফজলের গল্প-উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মালেকা বেগম তাঁর 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাসটিকে নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ প্রদর্শক বলেছেন। সন্তানের সমঅভিভাবকত্বের প্রশ্নে আইনি বাধার যে বরফ আজ গলতে শুরু করেছে মালেকা বেগম আবুল ফজলকে তার 'স্বপ্নদ্রষ্টা' বলেছেন। কারণ তাঁর উপন্যাসে তিনি এ ন্যায্যতা দাবি করেছেন ৫০ বছর আগে। 'সমাজ ও মানুষকে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সংস্কারের গন্ডি থেকে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখানোই সাহিত্যিকের মহৎ ভূমিকা। আবুল ফজলের সাহিত্য সেই মহত্ত্বের পরিচয়বহ'– এ উক্তি মালেকা বেগমের। আবুল ফজলের স্মৃতিকথা 'রেখাচিত্রে'র একটি সুখপাঠ্য ভাষ্য রচনা করেছেন অরুণ সেন। রেখাচিত্রকে তিনি 'স্বদেশের ইতিহাসের যথার্থ একটি আকরগ্রন্থ' বলেছেন। এ গ্রন্থের 'অসামান্য গদ্য' নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

'লেখকের রোজনামচা' নিয়ে লিখেছেন ভূঁইয়া ইকবাল। তিনি বলেন, তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মকে বোঝার জন্য এ রোজনামচা এবং পরিপূরক দুটি গ্রন্থ– 'রেখাচিত্র' ও 'দুর্দিনের দিনলিপি' মূল্যবান সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।' তিনি এও বলেন যে, 'বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে তাঁর রোজনামচাধর্মী রচনাবলি মূল্যবান দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য'।

সাহিত্যিক আবুল ফজলকে নিয়ে বাদানুবাদও কম হয় নি। এ গ্রন্থ থেকে তারও একটি কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র উঠে আসে। আলী আনোয়ার সাহিত্য সৃষ্টির অনন্যতা বা বিচিত্রতার জন্য তাঁকে কোনো কৃতিত্ব দিতে নারাজ কারণ তাঁর মতে, 'সাহিত্য পদবাচ্য রচনা সংখ্যায় খুবই কম এবং নাড়া দেয় এমন উপন্যাস বা গল্প তো তিনি লেখেন নি।' অন্যদিকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি সাহিত্যিক ছিলেন এবং আমাদের সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় এ পরিচয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন।' তবে এঁদের দু'জনের কেউই আবুল ফজলের কৃতিত্ব নির্ণয়ে বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে কার্পণ্য করেন নি। আলী আনোয়ার স্পষ্ট করেই বলেন যে, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের যে-আদর্শ তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে ও রচনায়। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে তাঁর অবিরাম লেখনী-চালনাকে তিনি যেমন অকুণ্ঠ সম্মান জানিয়েছেন তেমনি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও 'একুশ মানে মাথা নত না করা'র লেখককে নিবেদন করেন তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা। আবুল ফজলের সব রচনায় পরিব্যাপ্ত উদার মানবতাবাদ শণাক্ত করেন তিনি এবং আমাদের আশাবাদের স্থপতিদের একজন হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেন।

পেশায় শিক্ষক ছিলেন আবুল ফজল। মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ মিলিয়ে ৩০ বছরের শিক্ষাজীবন শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টাও হয়েছিলেন তিনি। শিক্ষাসম্পর্কিত নানান ভাবনা সংবলিত প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল ফজল। শিক্ষক-ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দিয়েছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার ধরন, শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রের করণীয়, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর ত্রুটি, আনন্দহীন ভুলে ভরা পাঠ্যবই, শিক্ষায় নৈরাজ্য, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষায় দুর্নীতি, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষা প্রশাসনের অক্ষমতা, দুর্বলতা, অকার্যকারিতা, পাঠ্যবই সংকট ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তাঁর রচনার উদ্ধৃতিযোগে তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে লিখেছেন শফিউল আলম। আবুল ফজলকে তিনি 'শিক্ষা-অভিভাবক' প্রমাণ করেছেন। আবুল ফজলের সংস্কৃতি চিন্তা নিয়ে লিখতে গিয়ে, তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে মফিদুল হক বিশ শতকের বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে আধুনিক চিন্তার অভিঘাত নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থটিতে আনিসুজ্জামান, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রাজ্ঞ বিবেচনায় বিশেষ একটি সময়ে এক জাগ্রত বিবেকের প্রতিটি উচ্চারণ আজকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক সংকটে কতটা প্রাসঙ্গিক তা ধরা পড়ে। এ গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মাহবুবুল হক 'দায়বদ্ধ লেখক ও সজাগ বুদ্ধিজীবী' শিরোনামে আবুল ফজলের জীবন বৃত্তান্ত ও সৃজনকর্মের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গ্রন্থশেষে প্রায় ১১ পৃষ্ঠায় আবুল ফজলের 'সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি' ও বিস্তারিত 'রচনাপঞ্জি' গ্রন্থিত হওয়া সত্ত্বেও একাধিক রচনায় তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকর্মের তালিকার পুনরাবৃত্তি অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো। স্মারকগ্রন্থের শেষার্ধে সংকলিত ১৯ টি প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে– যেক্ষেত্রে তাঁর (আবুল ফজলের) আগ্রহ ও অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ চারটি প্রবন্ধ আবুল ফজল স্মারকবক্তৃতা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ'। গ্রন্থের চুম্বক-অংশ অর্থাৎ মুখবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করছি এই বলে যে, এ গ্রন্থের শেষাংশের অধিকাংশ প্রবন্ধ-শিরোনাম ও লেখক তালিকা মননশীল পাঠককে প্রলুব্ধ ও পাঠতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট। লেখক তালিকায় রয়েছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান আজিজুল হক, পবিত্র সরকার, অম্লান দত্ত, অনুপম সেন, যতীন সরকার, জগৎ সাহা ও শামসুজ্জামান খান প্রমুখের মতো স্বনামধন্য লেখকবৃন্দ। এখানে আমরা পাচ্ছি জামাল নজরুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মুতীর মতো বিজ্ঞান-লেখকদ্বয়কে। আবুল ফজলের সৃজনশীল, সংস্কৃতিঋদ্ধ পুত্র-কন্যার হাত পড়েছে এখানে। এই অংশেই আমরা পাব 'বাঙালির শিল্পস্বভাব ও স্বভাবশিল্প' ও 'পোড়ামাটির ফলকে বাংলার লোকায়ত জীবনালেখ্য'র মতো চারু প্রবন্ধ। সব মিলিয়ে স্মারকগ্রন্থটির প্রথম অংশ যদি একটি শান্ত পাখি তো তার শেষ অংশটি সে পাখির দুটি মুক্ত ডানা– শিল্প-সংস্কৃতির মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার।

আবুল মনসুরের প্রচ্ছদে সময় প্রকাশন থেকে জুন ২০০৯ এ প্রকাশিত মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থটির মূল্য ৭৫০.০০ টাকা। সম্পাদনা পরিষদে রয়েছেন আনিসুজামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন।
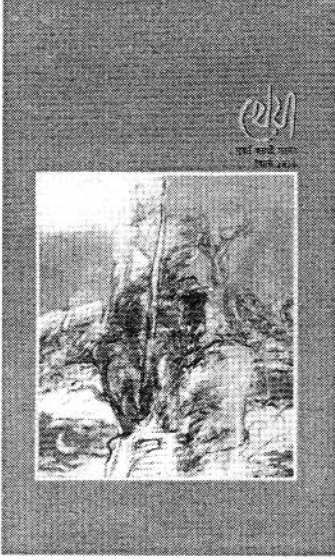
সাহিত্য পত্রিকা 'খেয়া'র সুবর্ণ জয়ন্তী

সাহেদ মন্তাজ

খেয়া॥ সম্পাদক : পুলক হাসান
সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
প্রচ্ছদ : মনসুর-উল-করিম॥ মূল্য : ১০০ টাকা

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'খেয়া' প্রবেশ করেছে ৫০তম সংখ্যায়, সুবর্ণজয়ন্তীতে। দীর্ঘ পথ চলাকেই শক্তি বিবেচনা করেছেন সম্পাদক পুলক হাসান।

সুবর্ণজয়ন্তীর এ সংখ্যায় নবীন-প্রবীণদের সমাবেশ ঘটেছে বিপুল সংখ্যায় ও বিষয়বৈচিত্র্যে। সংযুক্ত হয়েছে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, সাহিত্য-আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ। 'খেয়া'র ইতোপূর্বে প্রকাশিত লেখা থেকে নির্বাচিত লেখার সমাহারে সংযোজিত ক্রোড়পত্র দিয়েছে নতুন ও ভিন্ন মাত্রা। এ সংখ্যার 'প্রজ্ঞাদ্বীপের আলোয়' বিভাগে সেলিম সারোয়ারের "বিন্যাসবাদ: তন্ত্রের সন্ধানে ক'জন তাত্ত্বিক", এবং যতীন সরকারের "কেন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'?" শিরোনামের সুলিখিত বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'স্মৃতি-বইয়ের আধেক পাতা'য় স্মৃতিচারণ করেছেন কৃষ্টি হেফাজ– 'ওয়াহিদ কাকুকে মনে পড়ে'। 'বনে এত ফুল ফুটেছে' বিভাগে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ রফিক, কাশীনাথ রায়, নূরুল হক, সেলিম সারোয়ার, মাহবুব-উল-করিম, গোলাম ফারুক খান ও নাসিরুল ইসলাম কবিতা লিখেছেন।

'জীবন তরঙ্গ দোলে রে' বিভাগে গল্প লিখেছেন জাকির তালুকদার, জাফর তালুকদার, ফজলুল কাশেম ও আনিস রহমান। 'অন্তরে সাজানো মেঘমালা'তে আবারও কবিতা। লিখেছেন শামসেত তাবরেজী, আওলাদ হোসেন, আহমদ আজিজ, আমজাদ হোসেন, হাফিজ রশিদ খান, বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, বুলান্দ জাভীর, পুলক হাসান ও সোহরাব পাশা। 'দিনরাত্রির মশলা'য় আবারও গল্প। লিখেছেন চন্দন চৌধুরী, ফরীদুল আলম, শেখ অর্ণব। 'সত্যায়িত বাতাস' বিভাগে আরও কিছু কবিতা। এখানে মুজিবুল হক কবীর, ইকবাল আজিজ, রেজা ফারুক, শামসুল ফয়েজ, আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, শামীম সিদ্দিকী, মুক্তি মণ্ডল, ওয়াহিদ রেজা, দেলওয়ার বিন রশিদ, গাউসুর রহমান, আশরাফ রোকন, সৈয়দ শিশির, হাবিব

সিদ্দিকী, অনিক ইসলাম প্রমুখের কবিতা স্থান পেয়েছে। 'ওই সুদূরের বাঁশি' শিরোনামের অনুবাদ বিভাগে ভারতের কাঞ্চা ইলাইয়াহ এর ভারতের দলিত বহুজন সমাজের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির যে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক ও জীবনযাত্রাগত দূরত্বের বিশ্লেষণাত্মক ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'কেন আমি হিন্দু নই' – এর প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদকৃত অংশ-বিশেষ মুদ্রিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আবু খইয়াম। ইরানী গল্প লেখক কুদসি কাজি নুর– এর 'গ্রহণ' গল্পটি অনুবাদ করেছেন মাহমুদ আলম সৈকত। রয়েছে চারু হক ও

যতীন সরকারের "কেন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'?" প্রবন্ধটিও কবিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির বিশ্লেষণ। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ফ্রয়েডীয় ঘরানার নির্জ্ঞানবাদ ও আচরণবাদীদের যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীতে পাভলীয় দর্শনই যে কবি-শিল্পীদের মানসবৈশিষ্ট্যকে অনেক পরিমাণে চিহ্নিত করতে পেরেছেন

আয়শা ঝর্ণা অনূদিত আমেরিকান কবি সিলভিয়া প্লাথের ৬ টি কবিতা এবং সাইদুল ইসলাম অনূদিত মিলটোস স্যাচটৌরিস-এর ৫টি কবিতা।

শান্তিময় বিশ্বাস তিনটি সমকালীন কাব্যগ্রন্থের উপর আলোচনা করেছেন 'অন্যের একান্ত এলাকায়'– এ। একুশের মেলায় প্রকাশিত শহীদ কাদরীর 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও', কাশীনাথ রায়ের 'জীবনানন্দ দেখুন', এবং শামীম সিদ্দিকীর 'অচেনা ফুলের লোভে'– এই কাব্য তিনটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে শান্তিময় বিশ্বাস বলেছেন, 'প্রতি বছর এমন দুয়েকটা বই চোখে পড়ে যেগুলোর হিরকদ্যুতি আমাদের চোখকে আকর্ষণ না করে পারে না। আমাদের কাব্যজগৎ সারা বছর এরাই আলোকিত করে রাখে। বিশেষ করে আমাদের প্রকাশনার 'বসন্ত ঋতু' ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে এমন দুয়েকটা বইয়ের দেখা মেলে ফেব্রুয়ারিতেই যাদের 'মেয়াদ উত্তীর্ণ' হয়ে যায় না। এ অংশেই কাশীনাথ রায়ের কবিতার বই 'জীবনানন্দ দেখুন' নিয়ে আলোচনা করেছেন আবুল কাসেম। বেগম আকতার কামাল লিখেছেন 'ইকবাল আজিজের শ্রেষ্ঠ কবিতা: স্মৃতি ও ব্যক্তি মনের লিরিক'। ইকবাল আজিজের কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আকতার কামাল বলেছেন, 'কবি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে নির্মাণের সম্ভাবনা থেকে তিনি খুব বেশি দূরে নন বলেই মনে করি।' এখানে রয়েছে সুগত পার্থের লেখা 'নাচপ্রতিমার লাশ : অফুরন্ত প্রহর'।

'মুগ্ধ প্রাণের পাশে কিছুক্ষণ'– এ 'টুকা কাহিনী' গল্পকার বুলবুল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার প্রকাশ পেয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন পিয়াস মজিদ। 'শোকার্ত স্মরণ'-এ মোজাফফর হোসেন স্মৃতিচারণ করেছেন– 'সৈয়দ আমীরুল ইসলাম : যে দেউটির আলো অনির্বাণ'। সেলিম সারোয়ারের 'বিন্যাসবাদ: তন্ত্রের সন্ধানে ক'জন তাত্ত্বিক' প্রবন্ধটি বেশ দীর্ঘ। সাহিত্যের তাত্ত্বিক পাঠ বিন্যাসবাদ তত্ত্বের বিশ্লেষণে লেখক ফার্দিনান্দ দ্য সস্যু, রলা বার্থ, লেভি স্ট্রাউস, ভ্লাদিমির প্রপ, ক্লদ ব্রেমঁর, তদোরভ প্রমুখের আলোচনা তুলে ধরেছেন। পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিন্যাসবাদী নাটকতত্ত্ব ও কবিতাতত্ত্বকে। বিন্যাসবাদী তত্ত্বের সাহিত্য-সমালোচনাও স্থান পেয়েছে প্রাবন্ধিকের রচনায়।

যতীন সরকারের "কেন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'?" প্রবন্ধটিও কবিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির বিশ্লেষণ। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ফ্রয়েডীয় ঘরানার নির্জ্ঞানবাদ ও আচরণবাদীদের যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীতে পাভলীয় দর্শনই যে কবি-শিল্পীদের মানসবৈশিষ্ট্যকে অনেক পরিমাণে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, কবিদের বৈজ্ঞানিক বৈধতা দান করেছেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করে প্রাবন্ধিক পাভলীয় দর্শনের বিশিষ্টতা অনুধাবনের আহ্বান জানিয়েছেন।

'খেয়া'র সংযোজন 'ক্রোড়পত্র: নির্বাচিত খেয়া' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। খেয়ার ইতোপূর্বে প্রকাশিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা ক্রোড়পত্রে সংযোজিত হয়েছে। রয়েছে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও আল মাহমুদের প্রবন্ধ, সাব্বির আজম গৃহীত আবদুল মান্নান সৈয়দের সাক্ষাৎকার; এছাড়া গোলাম ফারুক খান, নূরউল করিম খসরু, পুলক হাসান, মাহবুব সাদিক, নূরুল হক, শান্তিময় বিশ্বাস, খালেদ মতিন, মুজাহিদ শরীফ, চারু হক, হামিদ কায়সার প্রমুখের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, কবিতা ও গল্প।

'খেয়া'র সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা সদ্য প্রয়াত আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের তিন যশস্বী ব্যক্তিত্ব– কথা সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ, ভাষা সৈনিক গাজীউল হক ও ইতিহাস গবেষক সৈয়দ আমীরুল ইসলাম কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

পা ঠ প্র তি ক্রি য়া
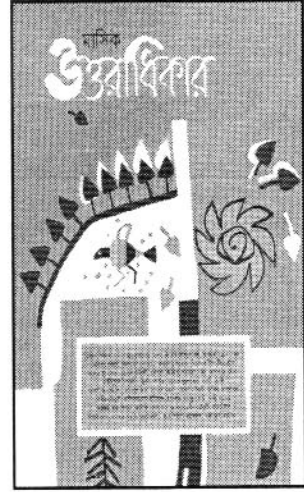
নবআঙ্গিকে উত্তরাধিকার

পাপড়ি রহমান

'এ বছর, ২০০৯-এর ১৮ই এপ্রিল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৮০৯-এর ঐ তারিখে তাঁর জন্ম হয়েছে কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের দোতলা বাড়িতে। সেন্ট জর্নস ওল্ড ক্যাথিড্রালে ঐ বছরের ১২ই আগস্ট তিনি ব্যাপটাইজড হন। ... ১৮৩১-এর ২৬ শে ডিসেম্বর কলেরায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ২২ বছর ৮ মাস ৮ দিন। অকালপ্রয়াত এই ব্যক্তি ভারতবর্ষে তাঁর এমন স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন যে দ্বিশত বর্ষে বিস্মৃত হওয়ার পরিবর্তে তিনি বরং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন'।

বাংলা একাডেমীর ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' জুলাই ২০০৯, শ্রাবণ ১৪১৬ সংখ্যায়। শান্তনু কায়সারের 'দ্বিশত বর্ষের আলোকে নব্য বাংলায় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও' নিয়ে শুরুটা এমন। এ প্রবন্ধে আরও আছে ডিরোজিও নিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দ্বিশত বার্ষিক আলোকপাত করে এ সংখ্যায় আরেকটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের রচয়িতা আবুল কাসেম ফজলুল হক।

'ছাত্রদের অন্তর্গত সুপ্ত মনুষত্বকে জাগিয়ে তুলতে ও বিকশিত করতে তিনি চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের তিনি করে তুলতে চাইতেন জিজ্ঞাসাপরায়ণ, অনুসন্ধিৎসু, সত্যনিষ্ঠ সব রকম সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে একথা রটে গিয়েছিল যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না। ডিরোজিওর ছাত্র হিসাবে রামতনু লাহিড়ী উল্লেখ করেছেন– 'চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে; ডিরোজিও তেমনি আমাদের আকর্ষণ করতেন।'

জানুয়ারি ১৯৭৩ মাসিক পত্রিকা হিসাবে উত্তরাধিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এবং ১৯৮৩ সালে এ পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়। এই ত্রৈমাসিক ক্রমে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে জুলাই ২০০৯ পুনরায় মাসিক উত্তরাধিকার দেখে চমকে উঠতে হলো। ভালো করে পড়ে-দেখে-শুনে বুঝা গেল, এ চমক ক্ষণিকের জন্য নয়– কারণ 'উত্তরাধিকারের' এই মেকওভার সময়কে একেবারে কব্জা করে নেওয়ার মতো।

ভালো কিছুর আকাল আমাদের দেশে নতুন নয়। দুই/ একটা মানসম্পন্ন পত্রিকা কালেভদ্রে যাও হাতে এসেছে তাও গোষ্ঠীবদ্ধতায় আক্রান্ত অথবা ক্ষণস্থায়ী। কিছু কিছু পত্রিকা উজ্জ্বলতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েও কয়েকদিনে এতটাই অনুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে, হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখে ঘরে নিয়ে যেতে মন বেকায়দায় পড়েছে।

নব আঙ্গিকে প্রকাশিত উত্তরাধিকারে কী নেই বলা মুশকিল– কী আছে তা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের জন্য অবধারিত 'রবীন্দ্রনাথ'। আর শ্রাবণ মাস কবিগুরুর প্রয়াণের মাস। উত্তরাধিকারে আছে তাঁকে নিয়ে ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন– আবদুস শাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের স্থপতি কাদম্বরী দেবী।' এবং করুণাময় গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথের গায়ক খ্যাতি'।

আবদুস শাকুরের লেখা নিয়ে নতুন করে বলবার কিছু নেই– বিষয় যতই দুরূহ হোক না কেন– শাকুরের লেখার প্রসাদগুণ এতটাই যে পাথরও অনায়াসে গলে জল হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠান কাদম্বরীকে নিয়ে তথ্য-তত্ত্ব, কাব্য-

ছন্দ, গীত-সংগীত নিয়ে আকর্ষণীয় অথচ বেদনাঘন একটি লেখা উপহার দিয়েছেন তিনি। যা পড়তে পড়তে ভাবাবেগ সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বৌঠান কাদম্বরীর জন্য এক ধরনের বিষাদ আক্রান্ত করে ফেলে। তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও যেন নতুন করে চেনা বা দেখা যায়।

... দুমাসের মধ্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হল রবীন্দ্রনাথকে ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। বিয়ের ভাঁড় খেলতে গিয়ে ভাঁড়গুলোকে ইচ্ছে করে উলটে দিল বর 'এ-কী করছিস রবি!'– ছোটো কাকিমা ত্রিপুরা সুন্দরীর আর্তপ্রশ্নের উত্তরে রবি বললেন– 'সবই তো আজ থেকে ওলোট পালোট হয়ে গেল কাকিমা।' করুণাময় গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথের গায়কখ্যাতি' উপভোগ্য রচনা। শুধু রবীন্দ্র সংগীত নয় রবীন্দ্রভক্তদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক।

'হে আমার আগুন পাখি'– সৈয়দ শামসুল হকের দীর্ঘ কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে এ সংখ্যা।

আমাদের এক নয়, অনেক জীবন/ মাঝে মাঝে মনে হয় সংখ্যা নয়, সংখ্যার বিভ্রম/ তবে একটিই জীবন! বিপরীতে বিরুদ্ধ কি নয় তারা? / ভাস্কর্যের গ্যালারিতে দর্শকের ভিড়/ স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়ে কথা।/ আরে দ্যাখো পাথর জীবন্ত হয়ে উঠেছে কেমন/

কবিতা অংশে নবীন ও প্রবীণের সমন্বয় লক্ষ করার মতো। প্রবীণ কবি দিলওয়ারের পাশাপাশি আছেন একেবারে নবীন কবি আফরোজা সোমা। তেমনি মহাদেব সাহার পাশে আছেন তরুণ তুর্কী আলফ্রেড খোকন। নবীন প্রবীণের এই সম্মিলন সময়ের কোনো সুসময়কেই যেন ইঙ্গিত দেয়!

একেবারে নবীন কিশলয়ের কুশি পাতাটি বলেছেন–

নক্ষত্রফুল ঝরো অন্ধকার / কারণ সকল / ফুলের মাঝে রাত্রিই শাশ্বত। রাত থেকে আমি মুছে গেলে শুধু সমুদ্র থাকে/

[পিয়াস মজিদ]

ওদিকে প্রাচীন বটবৃক্ষটি তাঁর ঘন সবুজ পাতা দৃশ্যমান করে বলে উঠছেন–

আমাদের এই পুরোনো পাঁচিলে বড় বেশি রোদ/ মনকে যে দুদণ্ড জিরোতে দেই তাও প্রায় অসম্ভব / এত বেশি শূন্যগর্ভ অকেজো হাওয়া।

[বেলাল চৌধুরী]

'বৈশ্যানীর বিষ' বুলবুল চৌধুরী, 'লোহার অজগর'– জাকির তালুকদারের গল্প। 'বৈশ্যানীর বিষ' গল্পের বিষয়ে নতুনত্ব নেই। বর্তমান সময়ের নিত্যকার চিত্র তুলে এনেছেন গল্পকার। চারপাশের মানুষের অবক্ষয়, ক্রমান্বয়ে বদলে যাওয়া, অন্ধকার নেশার জগতে টালমাটাল হওয়া ইত্যাদি। তবে গল্প বয়ানের ভঙ্গি এতটাই সাবলীল যে, পাঠক ক্ষণিকের জন্য সব বিস্মৃত হোন। মনে হয়– এই তো যা ঘটছে সবই তো চোখের সামনেই! 'বৈশ্যানীর বিষ' আরেকটু বিস্তৃত হলে ভালো হতো। 'লোহার অজগর'- মেঘ-বাদলার বন্টন ব্যবস্থার ফারাক নিয়ে শুরু হলেও আসলে মানব জন্মরহস্যের ফারাকই এখানে সুস্পষ্ট! এবং গল্পের এক পর্যায়ে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না 'ছাওয়াল' বাদশামিয়ারই ঔরসজাত। এটা আর স্পষ্ট হয় যখন বাদশামিয়া আলেয়ার সঙ্গে ছাওয়ালের বিয়েতে অস্বীকৃত হয়। আর সহমরণ কি ঠেকানো গেল না? স্বেচ্ছামৃত্যু কি কোনোকিছুর সহজ সমাধান? জীবনের পরতে পরতে কিছু রহস্যকথা থেকে গেলে মন্দ কি? 'ছাওয়ালকে' সহমরণে না ঠেলে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেয়া যেত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর 'সরীসৃপ' গল্পে ভুবনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন! এ সংখ্যার অনুবাদ অংশ খুবই ঋদ্ধ। ওরহান পামুক ও স্যার জেমস জর্জ ফেজার অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে কবীর চৌধুরী ও খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। এই লেখকদ্বয় অনুবাদের ক্ষেত্রে বরাবরই লা-জওয়াব! কবি আবুল হোসেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্দুল মান্নান সৈয়দ। চিত্রকলা নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধও বই-পরিচিতি অংশও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। অজয় রায়ের চমৎকার নিবন্ধ 'ড. ওয়াজেদ মিঞা রাজনীতি নিস্পৃহ একটি সুন্দর মনের মানুষ'। রম্য রচনা ধাঁচে মনজুরে মওলার লেখা 'এই বইটি পড়বেন না' এবং হাসনাত আবদুল হাইয়ের 'উত্তর আমেরিকায়' ভ্রমণ কাহিনী এ সংখ্যার তুলনামূলক অনুজ্জ্বল লেখা। আলী যাকেরের আত্মজৈবনিক রচনা 'অরুণোদয় থেকে অস্তাচলের পথে'– আরেকটু ধারাবাহিকতা দাবী করে।

যাহোক, দীর্ঘ সময় ধুলা-মলিন থাকার পর 'উত্তরাধিকারের' এই বৃষ্টিস্নাতরূপে পাঠকমাত্রই মুগ্ধ হবেন। আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'বাঙালির রেনেসাঁসের অগ্রপথিক' থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করে এ লেখার ইতি টানতে চাই–

বাংলাদেশের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নতুন কালের নতুন রেনেসাঁস চাই। আজকের দিনের সকল অন্যায় অবিচার, ভণ্ডামি-প্রতারণা, মিথ্যা– আর নতুন নতুন কুসংস্কারের অবসান চাই। চাই চিন্তার স্বাধীনতা আর সমস্যাবলি থেকে মুক্তি। অতীতমুখী নয়, চাই ভবিষ্যতমুখী নতুন সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা। উত্তরাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন।

....

ঢাকা

গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার

এহসানুল কবির

দীর্ঘদিন অনিয়মিত থাকার পর বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পত্রিকা *উত্তরাধিকার* আবার বেরোল এই জুলাই মাসে– এটা সুখের খবর। এর বর্তমান সম্পাদক শামসুজ্জামান খান এ-সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিকে 'নবপর্যায়ে এবং নতুন আঙ্গিক ও বিন্যাসে' মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– এটা আরও বেশি সুখের খবর। নবপর্যায়ে প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণে বর্তমান সম্পাদক পত্রিকাটির জন্মমুহূর্ত থেকে, কালক্রমে, এর 'আন্ডারগ্রাউন্ড'-যাত্রা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলুপ্তির সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষুব্ধ ইতিহাস জুড়ে দিয়ে বাংলা একাডেমীর প্রথম অঙ্গীকারের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করে নিয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাস্থ্যকর বিকাশ এবং আমাদের চিন্তা-চেতনার বহুমাত্রিকতা ও সংস্কৃতি রুচির ঋদ্ধি, নান্দনিক বোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকতার তীক্ষ্ণতার প্রতিফলনে উত্তরাধিকার সদা সচেষ্ট থাকবে। সেইসঙ্গে যুক্তিবিচার, তর্কতদন্ত এবং তরুণদের উদ্ভাবনাময় দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে। সবকিছুর ওপরে নিয়মিতভাবে এবং উন্নতমানে প্রতিমাসে উত্তরাধিকার প্রকাশ করাই আমাদের অঙ্গীকার।" এ-অঙ্গীকারকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। সেই সঙ্গে সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন নবপর্যায়ের এই *উত্তরাধিকার*-এর জন্য।

মাসদুয়েক আগে একটি অনুবাদ-সম্পাদনার কাজ করার সময় ইংরেজি 'ক্রিটিকাল এনালাইসিস' শব্দটার একটি জুতসই বাংলা শব্দ খুঁজছিলাম; পাচ্ছিলাম না। *উত্তরাধিকার*-এর এ-সংখ্যার 'সম্পাদকের কথা'য় সেটি পেয়ে গেলাম—'তর্কতদন্ত'। এ-কারণে সম্পাদক মহোদয় একটি বাড়তি ধন্যবাদও প্রাপণীয় হলেন।

সৈয়দ শামসুল হকের লেখা 'হে অমর আগুনপাখি' নামের দীর্ঘ কবিতাটি দিয়ে শুরু হয়ে এহসানুল ইয়াছিনের সংগ্রহ করা 'সংস্কৃতি সংবাদ' দিয়ে শেষ হয়েছে এ-সংখ্যা *উত্তরাধিকার*। মাঝে আছে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে দুইটি করে উপলক্ষীয় প্রবন্ধসহ গল্প, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিত্ব-মূল্যায়ন ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি নানা আঙ্গিকের উনিশটি লেখা এবং পনেরটি কবিতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দের নেওয়া কবি আবুল হোসেনের সাক্ষাৎকারটি পড়লাম প্রথমে। কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান টোকা গেঁথে দিয়ে সাক্ষাৎকারটাকে চমৎকার সাজিয়েছেন সাক্ষাৎকারী। পূর্বতন ও সমসাময়িক সাহিত্যজগত সম্পর্কে আবুল হোসেনের মূল্যায়ন-মন্তব্য-স্মৃতিচারণ বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়কে আরও বেশি করে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলোকে এই সময়ের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে আমার কাছে; যেমন: "ভাষা নিয়ে কত রকম কাজ করা যায় সেটা শিখতে হবে মাইকেল থেকে", "আমার চেষ্টা কবিতা কত সহজ ভাষায় লেখা যায় এবং কবিতাকে কত সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়– এই দুই চেষ্টা।"

ডিরোজিও-কে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ দুইটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যমূলক বলে এখানে ডিরোজিওকে ঠিক 'দ্বিশতবার্ষিক আলোকপাতের কেন্দ্রে' পাওয়া যাচ্ছে না। শান্তনু কায়সারের লেখাটি সুগ্রন্থিত হলেও আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখাটি পুনরাবৃত্তিমূলক ও অতিসরলীকৃত মন্তব্যে কণ্টকিত। মনজুরে মওলার 'এই বইটি পড়বেন না' ভিন্নস্বাদের ও ভিন্ন আঙ্গিকের লেখা। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক নানা মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ-মন্তব্যে ঋদ্ধ এ-লেখাটি আশুরুশেষ উপভোগ্য। কোনোরকম ভূমিকা, উৎসনির্দেশ বা টোকা ছাড়াই ছাপানো হয়েছে ওরহান পামুকের একটি লেখা/বক্তৃতার কবীর চৌধুরীকৃত অনুবাদ। প্রয়োজনীয় ভূমিকা জুড়ে দিয়ে স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার-এর *দ্য গোল্ডেন বাউ* গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের চমৎকার অনুবাদ করেছেন খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। অজয় রায়ের স্মৃতিচারণে 'রাজনীতি নিস্পৃহ একটি সুন্দর মনের মানুষ' ড. ওয়াজেদ মিঞা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সুচিন্তিত মন্তব্য পাওয়া গেল। এদেশে ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতির ধ্বজাধারীদেরকে নিয়ে মিথ্যাচারদুষ্ট, উদ্দেশ্যমূলক ও প্রপাগান্ডাবহুল লেখা লিখার লোক প্রচুর, ওয়াজেদ মিঞার মতো বিজ্ঞানীকে নিয়ে লেখার লোক সংখ্যালঘু। অজয় রায়কে তাই সাধুবাদ। ক্ষণজন্মা ও খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর নানা সময়ের লেখার সংকলন *স্যার উইলিয়াম জোনস্ : অ্যা রিডার* বইটির খবর দিয়ে এবং এর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে আবু তাহের মজুমদার আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। *উত্তরাধিকার* এর এ-সংখ্যায় তরুণ কবিদের অংশগ্রহণ ও স্থানপ্রাপ্তি প্রশংসাযোগ্য। তবে, 'তরুণদের উদ্ভাবনাময় দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত' করার ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর আরও সচেতন প্রয়াস, সুপরিকল্পনা ও সতর্ক বিবেচনা প্রত্যাশিত।

সবশেষে একটি কথা না বললেই নয় যে, এ-সংখ্যার ছাপার মান একেবারেই ভালো হয় নি; আর বাঁধাইও তথৈবচ! আশা করি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তরা পরবর্তী সংখ্যা থেকে এ-বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দিবেন। আরেকটি বিষয়েও মনোযোগ দিতে অনুরোধ জানাই। সেটি হলো পত্রিকার বণ্টন। বিশেষ করে, এ-ব্যাপারে বাংলা একাডেমির অনীহা ও অমনোযোগ যখন প্রায় কিংবদন্তিতুল্য!

....

বিশদ বাঙলা, চট্টগ্রাম

বাংলা একাডেমীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

চাঁদা ও গ্রাহক ফরম পাঠানোর ঠিকানা :

উপপরিচালক
বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা
ফোন ৮৬১৯৩৬৪/৮৬১৯৫৮১

(চেক বা নগদ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়)

মাসিক উত্তরাধিকার-এর গ্রাহক হোন
যথাসময়ে পত্রিকাটি
আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে

গ্রাহক ফরম

আমি মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক হতে আগ্রহী। এক বছরের জন্য (১২ সংখ্যা) ডাকমাশুলসহ গ্রাহক চাঁদা ৫০০/পাঁচশত টাকার পে-অর্ডার প্রেরণ করলাম।

পে-অর্ডারের বিবরণ

নম্বর...

টাকার পরিমাণ :..

তারিখ..

ব্যাংকের নাম...

শাখার নাম..

গ্রাহকের নাম

ঠিকানা

ফোন

স্বাক্ষর

তারিখ